ওরঘুরে ও অন্যান্য

সৈয়দ মুজতবা আলী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

সূচীপত্র

শ্রীযুক্তা সরোজিনী হটীসিং-কে
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ

এই লেখকের অন্যান্য বই—

তুলনাহীনা
মুসাফির
কত না অশ্রুজল
শব্‌নম
অবিশ্বাস্য
হিটলার
ধূপছায়া
দ্বন্দ্বমধুর
শহর-ইয়ার
চতুরঙ্গ
জলে ডাঙায়
হাস্যমধুর

খৃষ্ট

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান মেরামতির সময় অন্যতম আইন করলেন, যে-সব শব্দ বাঙলায় অত্যধিক প্রচলিত হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে বদলাবার প্রয়োজন নেই। তবে কি 'খৃষ্ট' এবং 'খৃষ্টাব্দ' যথেষ্ট প্রচলিত ছিল না যে ওগুলোকে খ্রীষ্ট ও খ্রীষ্টাব্দ করা হল? এবং এই নূতন বানন কি খুব শুদ্ধ? প্রথমত, খ্রী-তে দীর্ঘ ঈকার কেন? আমার কান তো বলছে, আমি হ্রস্বই শুনেছি; দ্বিতীয়ত, গ্রীকরা তো 'ষ্ট' বলে না—বলে 'স্ত'। অতএব অতি বিশুদ্ধ যদি লিখতেই হয় তবে লেখা উচিত খ্রিস্ত। 'খৃষ্ট' লেখার সপক্ষে আমার অন্য যুক্তি, কথাটা সংস্কৃত 'ঘৃষ' ধাতু, 'ঘর্ষিত', 'মর্দিত' অর্থেই গ্রীকে ব্যবহৃত হয় (এনয়েনটেড)—অর্থাৎ 'স্নেহাসিক্ত'—'স্নেহঘর্ষিত'। 'ঘৃষ্ট এবং খৃষ্ট তাই হুবহু একই শব্দ (Thou anointest my head with oil; Psalms No. 23, v5—এখনও পূব বাঙলার গ্রামাঞ্চলে বিয়েবাড়িতে নিয়ন্ত্রিত বরাহুত রমনীদের মাথা তৈল 'ঘৃষ্ট' করা হয়; আমি কাষ্ঠ-রসিক নই, হলে পদে তৈলমর্দন করে যে পদোন্নতি হয়, সেদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতুম; মার্কিনী ভাষাও to butter up কথাটা আছে)। 'খ্রী'-এর চেয়ে 'খৃ' লেখাতে ছাপাখানারও বোধহয় সুবিধা বেশী এবং সর্বশেষ যুক্তি, খৃষ্টানরা যেরকম 'এক্স' অক্ষর ও ক্রুশ চিহ্ন প্রভু যীশুর সম্মানার্থে আলাদা করে রেখেছেন, আমরাও না-হয় 'খৃ'-টি তাঁরই জন্য রেখে দিলুম।

* * * *

ধর্মের ইতিহাস পড়ার সময় আমার সব সময়ই আশ্চর্য বোধ হয়েছে যে, বুদ্ধ, খৃষ্ট, মুহম্মদ (দ) যখন যুগ-পরিবর্তক মহান বাণী প্রচার করেছেন, তখন গুণী-জ্ঞানী যত না তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছেন, তার চেয়ে বেশী সমবেত হয়েছে সর্বহারার দল হজরৎ মুহম্মদের প্রথম শিষ্যের বহুসাংশ ক্রীতদাস, দীনহীন; খৃষ্টের শিষ্যগণ

জেলে (এবং জেলে যে চাষার চেয়েও গরীব হয়, সে-ও জানা কথা) এবং তিনি পাপী-তাপী, মদ্যবিক্রেতা এবং পাপিষ্ঠা রমণীকে (মেরি ম্যাগডলীন) সঙ্গ দিতে কুণ্ঠিত হতেন না বলে সে-যুগে নিন্দাভাজন হয়েছেন। এই মহাপুরুষদ্বয়ের বিনাশ কামনা করেছেন সে-যুগের পদস্থ ব্যক্তিরাই। বুদ্ধের শিষ্য মহামগ্‌গলায়ন ও সারিপুত্ত অসংখ্য দীনহীন পথের ভিখারীকে প্রব্রজ্যা দিয়ে যে শিষ্য করেছিলেন, সে-কথা জাতক পড়লেই জানা যায়। বুদ্ধকে রাষ্ট্রের বিপক্ষে দাঁড়াতে হয়নি বলে তিনি রাজসম্মান ও শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডদের অর্থও পেয়েছিলেন, খৃষ্ট কাউকেই পান নি, এবং নবী মুহম্মদ আবু বকর ও ওমরের মত সামান্য দু-একটি আদর্শবাদী শিষ্য পেয়েছিলেন।

মার্ক্‌স্ ঠিক কি ভাষায় বলেছিলেন বলতে পারবো না, কিন্তু তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল যে, অর্থনৈতিক কারণ ভিন্ন কোনো বিরাট আন্দোলন পৃথিবীতে হয় না। বৌদ্ধ, জৈন, জরথুস্ত্রী, খৃষ্ট, ইসলাম—এই পাঁচটি পৃথিবীর বড় বড় আন্দোলন—হিন্দু এবং ইহুদী ধর্ম কোনো ব্যক্তিবিশেষের চতুর্দিকে গড়ে উঠেনি বলে এগুলো উপস্থিত বাদ দেওয়া যেতে পারে—(১)। তাই মনে প্রশ্ন জাগে, এদের পিছনে অর্থনৈতিক কারণ ছিল, কি ছিল না?

মার্ক্‌স এই পাঁচটি আন্দোলনকে তাঁর অর্থনৈতিক ছকে ফেলে বিচার করেছিলেন কি না জানিনে, কিংবা যে-যুগে তিনি তাঁর ছক নির্মাণ করেন, সে-যুগে হয়তো এইসব ধর্মান্দোলনের ইতিহাস ব্যাপকভাবে ইয়োরোপীয় ভাষায় লিখিত তথা অনূদিত হয় নি বলে তাঁকে তার মাল-মশলা জোগাতে পারেনি।

খৃষ্টের সময় অর্থনৈতিক কুব্যবস্থা চরমে পৌঁচেছে। শোষক সম্প্রদায় জেরুজালেমে জিহোভার মন্দির প্রায় ব্যাঙ্কিং হৌসে পরিবর্তিত করে ফেলেছে—যীশু সেখান থেকে তাদের তাড়িয়ে

(১) আমার মনে হয়, শঙ্কর ও চৈতন্যের সময় বড় দুটো আন্দোলন হয়েছিল, কিন্তু এখানে দীর্ঘ আলোচনার স্থানাভাব।

দিচ্ছেন (মার্ক ১১।১৫)—খাজনা-ট্যাক্সে মানুষ জর্জর। যীশু, মুহম্মদ, বুদ্ধ সকলেই আত্মা, অবিনশ্বর জীবন ও নির্বাণের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে বিচার করেছেন, সহজ সরলভাষায় চরম সত্য প্রকাশ করেছেন, রোগশোকমুক্ত অনন্ত জীবনের সন্ধান দিয়েছেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা সকলেই নূতন ধন-বণ্টন-পদ্ধতি প্রচলিত করতে চেয়েছিলেন এবং তারই ফলে অসংখ্য দীনদুঃখী—এবং প্রধানত তারাই—তাঁদের চতুর্দিকে সমবেত হয়েছিল। খৃষ্ট যে কামিজ নিয়ে গেলে জোব্বা দিতে বলেছেন, সে কিছু মুখের কথা নয়। তাঁর মহাপ্রস্থানের পর নবনির্মিত খৃষ্টসমাজের যে বর্ণনা পাই, তার থেকে মনে হয় মার্ক্স্ যে ভাবী আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন, তাই সফল হয়ে গিয়েছে, সবাই 'সব পেয়েছির দেশে'র তুল্যাধিকারী নাগরিক :

And all that belived were together, and had all things common ; and sold their possessions and goods and parted them to all men, as every man had need..... And the multitude of them that believed were of one heart and one soul : neither said any of them that ought of the things which he possessed was his own ; but they had all things common.....Neither was there any among them that lacked : for as many as were possessors of lands or houses sold them, and brought the prices of the things that were sold and laid them down at the apostle's feet ; and distribution was made unto every man according as he had need (Acts : 2 & 4).

হজরত মুহম্মদ মক্কাতে যতদিন একেশ্বরবাদ ও আল্লার মাহাত্ম্য প্রচার করেছিলেন, ততদিন মক্কাবাসী তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিল না,

কিন্তু তিনি যখন নবীন ধন-বণ্টন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে চাইলেন, তখনই মক্কার পদস্থ জনেরা তাঁর প্রাণনাশের সঙ্কল্প করল। পরবর্তী যুগের ইসলামে এই নবীন ধন-বণ্টন-পদ্ধতির প্রাধান্য ঐতিহাসিক মাত্রেরই জানা আছে। ইরানের এক আরব গভর্নর তখন দুঃখ করে বলেছিলেন, এই যে আজ হাজার হাজার ইরানী মুসলমান হচ্ছে, সেটা ইসলামের জন্য নয়, আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে বলে।*

জরথুস্ত্রের আমলে দ্বন্দ্ব বেধেছে—একদিকে কৃষি ও গো-পালন, অন্যদিকে যাযাবর বৃত্তি ও লুণ্ঠন। জরথুস্ত্র দেশের ধনবৃদ্ধির জন্য কৃষি-গো-পালনের রীতি প্রবর্তন করতে চাইলে শত্রুপক্ষের হস্তে প্রাণ হারান। তার 'ধর্ম' কিন্তু জয়লাভ করলো।

বুদ্ধের সময় তপোবন প্রথা প্রায় উঠে গিয়েছে, বন-জঙ্গল সাফ করা হয়ে গিয়েছে—বিস্তর লোক ভিক্ষুকের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওদিকে ছোট ছোট অসংখ্য রাজ্য তাদের অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের চরমে পৌঁছে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখানে রাজ্যে রাজ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতা না করলে আর সমস্ত দেশের শ্রীবৃদ্ধি হয় না; অথচ তাকে দেখতে পাই, কেউ আপন রাষ্ট্রের প্রত্যন্ত প্রদেশ ত্যাগ করে ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করতে গেলেই তাকে মেরে ফেলা হচ্ছে। বুদ্ধ ঐসব নিরন্নদের সঙ্ঘেব অন্নবস্ত্র দিয়ে পাঠালেন ভিন্ন রাজ্যে শান্তির বাণী প্রচার করতে—তাদের বিশেষ বেশ পরানো হল, যাতে করে সবাই তাদের সহজে চিনতে পারে। গোড়ার দিকে নিশ্চয়ই কিছু ভিক্ষু মারা গিয়েছিলেন; পরে এঁরা অক্লেশে রাজ্য থেকে রাজ্যান্তরে গেলেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়লো, ঐক্য সৃষ্টি হল এবং তাই সর্ব-ভারতের মৌর্য রাজ্য সংস্থাপিত হল।

আমি একথা বলছি না যে, দেশের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন ও নবীন ধনবণ্টন পদ্ধতি প্রচলন করাই মহাপুরুষদের একমাত্র উদ্দেশ্য

* তার অর্থ অবশ্য এই নয় যে ইসলামের আদর্শবাদ এদের কেউই বুঝতে পারেনি। বস্তুতঃ ইসলামের সাম্যবাদ, একেশ্বরবাদ, হজরতের সরল জীবনাদর্শ বহু লোককে অভিভূত করে।

ছিল; আমার বক্তব্য তাঁরা এগুলোকে অবহেলা তো করেনইনি, বরঞ্চ অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন বলেই 'হ্যাভনট' 'প্রলেটারিয়া' 'সর্বহারা'রা প্রথম এসে জুটেছিল। কয়েক শতাব্দী পর ফের দেখা দেয়, আবার সেই শোষকের দল, পাদ্রীপুরুৎ-মোল্লারূপে। এঁরা আর ধনবণ্টনের কথা তোলেন না—আচার-অনুষ্ঠান, পূজা-প্রায়শ্চিত্তের কথাই বার বার বড় গলায় গান।

ধর্মের এই অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে এখনো কোনো ভালো চর্চা হয়নি॥

কই সে ?

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাত্মবোধ, গ্যোটের ভূয়োদর্শন, শেক্‌স্‌পীয়রের মানব-চরিত্রজ্ঞতা সামান্য জনও কিছু না কিছু উপলব্ধি করতে পারে। স্বষ্টিকর্তা পৃথিবীকে দিয়েছেন মাত্র একটি হিমালয় ; আমাদের মানস-লোকে এই তিনজনই তিনটি হিমালয়। সাধারণ জন দূরে থেকেও এঁদের গাম্ভীর্য-মাধুর্য দেখে বিস্ময় বোধ করে—চূড়ান্তে অধিরোহণ করেন অল্প মহাত্মাই। আরো হয়তো একাধিক হিমালয় এ-ভূমিতে, অন্যান্য ভূমিতে আছেন—ভাষা ও দূরত্বের কুহেলিকায় আজও তাঁরা লুক্কায়িত।

এছাড়া প্রত্যেক পাঠকেরই আপন-আপন অতি আপন প্রিয় কবি আছেন। তাঁদের কেউ কেউ হয়তো বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি,—হয়তো তাঁদের সে মেধা নেই ; এঁদের স্বীকার করে নিয়েও আমরা এঁদের নাম বিশ্বকবিদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে বলি না।

আমি দুজন কবিকে বড় প্রাণ দিয়ে ভালোবাসি। আমারই সৌভাগ্য, এঁদের একজন বাঙালী—চণ্ডীদাস, অন্য জন জর্মন, নাম হাইনে। প্রশ্ন উঠতে পারে, বড় বড় কবিদের ছেড়ে এঁদের প্রিয় বলে বরণ করেছি কেন ? কারণটা তুলনা দিয়ে বোঝালে সরল হয়। রাজবাড়ির ঐশ্বর্য দেখে বিমোহিত হই, বিনোবাজীর ব্যক্তিত্ব দেখে বাক্যস্ফূর্তি হয় না, কিন্তু রাজবাড়িতে তথা বিনোবাজীর সাহচর্যে থাকবার মত কৌতূহল যদি বা দু'একদিনের জন্য হয়, তাঁদের সঙ্গে অহরহ বাস করতে হলে আমার মত সাধারণ জনের নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসবে।

চণ্ডীদাসকে নিয়ে ষোল, আর হাইনেকে নিয়ে সতের বছর বয়েস থেকে ঘর করছি। একদিনের তরে কোনো প্রকার অস্বস্তি বোধ করিনি। আমি জানি, এ-বিষয়টি আরো সরল করে বুঝিয়ে বলা যায়,

কিন্তু তার প্রয়োজন নেই। কারণ প্রত্যেকেরই আপন-আপন প্রাণ-প্রিয় ঘরোয়া কবি আছেন—শেক্স্পীয়র গোটে নিয়ে ঘর করেন অল্প লোকই—তাঁরা এতক্ষণে আমার বক্তব্যটি পরিষ্কার বুঝে গিয়েছেন। নিজের পিঠ নিজে কখনো দেখিনি, কিন্তু সেটা যে আছে সে-কথা অন্য লোককে যুক্তিতর্ক দিয়ে সপ্রমাণ করতে হয় না।

চণ্ডীদাস ও হাইনের মত সরল ভাষায় হৃদয়ের গভীরতম বেদনা কেউ বলতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ আর গোটেও অতি সরল ভাষায় কথা বলতে জানতেন, কিন্তু তাঁরা সৃষ্টি-রহস্যের এমন সব কঠিন জিনিস নিয়ে আপন আপন কাব্যলোক রচনা করেছেন যে সেখানে তাঁদের ভাষা বিষয়বস্তুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দুর্জ্ঞেয় হতে বাধ্য। চণ্ডীদাস, হাইনে তাঁদের, আমাদের হৃদয় বেদনালোকের বাইরে কখনো যেতে চাননি। তাঁরা গান গেয়েছেন, আমাদের আঙিনায় তেঁতুলের ছায়ায় বসে—তারা-ঝরা-নির্ঝরের ছায়াপথ ধরে ধরে তাঁরা সপ্তর্ষির গগনাঙ্গন পৌঁছে সেখানকার অমর্ত্য গান গাননি।

চণ্ডীদাসকে সব বাঙালীই চেনে, হাইনের পরিচয় দি।

আমাদের পরিচিত জনের মাধ্যমেই আরম্ভ করি।

যাঁরা গত শতাব্দীতে ইয়োরোপে সংস্কৃতচর্চা নিয়ে কিঞ্চিন্মাত্র আলোচনা করেছেন তাঁরাই আউগুস্ট্‌স্ ভিল্‌হেলম্ ফন শ্লেগেলের সঙ্গে পরিচিত।

জর্মনির বন্ বিশ্ববিদ্যালয়েই সর্বপ্রথম সংস্কৃতচর্চার জন্য আসন প্রস্তুত করা হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি আসনে অধ্যাপকরূপে বিরাজ করতেন। এক দিকে তিনি সংস্কৃতের নাট্যকাব্যের সঙ্গে পরিচিত, অন্য দিক দিয়ে তখনকার গৌরবভাস্কর ফরাসী সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য ভোগ করেছিলেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যসম্রাজ্ঞী মাদাম দ্য স্তালের সখা ও উপদেষ্টারূপে। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ছাড়াও পড়াতেন নন্দনশাস্ত্র বা অলঙ্কার। এক বৎসর যেতে না যেতে হাইনে বন্ এলেন আইন পড়তে। শ্লেগেলের বক্তৃতা শুনে

তিনি এমনই অভিভূত হয়ে গেলেন যে আইনকে তিনি নির্বাসনে পাঠালেন।

শ্লেগেল অলঙ্কার পড়াবার সময় নিজেকে গ্রীক লাতিন ফরাসী জর্মনের ভিতর সীমাবদ্ধ করে রাখতেন না। ঘনঘন সংস্কৃত কাব্যোপবনে প্রবেশ করে গুচ্ছগুচ্ছ গীতাঞ্জলির সঞ্চয়িতা তাঁর শিষ্যদের সামনে তুলে ধরতেন। হাইনের বয়স তখন একুশ বাইশ। সেই সর্বজনমান্য প্রবীণ জ্ঞানবৃদ্ধ রসিকজননমস্য শ্লেগেলের কাছে হাইনে একদিন নিয়ে গেলেন তাঁর একগুচ্ছ সরল কবিতা।

'উত্তম, উত্তম কবিতা, কিন্তু তোমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে। বড্ডবেশী পুরনো অলঙ্কারের ছড়াছড়ি, নিজের কথার আড় কবিতাকে কৃত্রিম করে ফেলেছে।' দুরুদুরু বুকে হাইনে মৃদু আপত্তি জানালেন। শ্লেগেল নির্দয় সমালোচক। বললেন, 'বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু তোমার কাব্যরাণী এখনো পরে আছেন জবরজঙ্গ জামাকাপড়, তাঁর মুখে বড্ডবেশী কালো তিল, তার ক্ষীণ কটি আর কত ক্ষীণ করবে, তাঁর খোঁপা যে আকাশে উঠে গেছে। একে ভালোবাসার যুগ তোমার পেরিয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বন্ধু, তোমার ভাস্কর কাব্যলক্ষ্মী ঘুমিয়ে আছেন কে জানে কোন্ ইন্দ্রজালের মোহাচ্ছন্ন মায়ায় উত্তর দেশে। নিভৃতে নির্জনে। প্রেমাতুর, বিরহবেদনায় বিবর্ণকত না তরুণ রাজপুত্র বেরিয়েছেন তাঁর সন্ধানে। হয়তো তুমিই,—তুমিই বন্ধু সেই ভানুমতী মন্ত্র পড়ে তাঁকে দীর্ঘ শর্বরীর দীর্ঘতর নিদ্রা থেকে জাগরিত করবে। ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠবে চতুর্দিকে, বনস্পতি গান গেয়ে উঠবে, প্রকৃতিও জেগে উঠবে আপন জড়নিদ্রা থেকে। জর্মন কাব্যলক্ষ্মীর চতুর্দিকের প্রাকার ধ্বংসাবশেষ রূপান্তরিত হবে স্বর্ণোজ্জ্বল রাজপ্রাসাদে। গ্রীসের সুরপুত্রগণ আবার এসে অবতীর্ণ হবেন তাঁদের চিরনবীন দেবসজ্জার মহিমায়…প্রার্থনা করি আপোল্লো দেব তোমার প্রতি পদক্ষেপের দিকে অবিচল দৃষ্টি রাখুন।'

হাইনের জীবনীকার বলেন, কোনো সুরাই তরুণ হাইনেকে এতখানি উত্তেজিত করতে পারেনি—সে যুগের আলঙ্কারিক-শ্রেষ্ঠের কয়েকটি কথায় তাকে যতখানি সোমাচ্ছন্ন করেছিল। রসরাজ শ্লেগেল স্বহস্তে হাইনের মস্তকে কবির রাজমুকুট পরিয়ে দিয়েছেন!

এর কিছুদিন পরে,—হাইনে তখনো কলেজের ছাত্র,—বেরল তাঁর কবিতার বই, "বুখ ডার লীডার," 'গানের বই,' কিন্তু এর অনুবাদ "গীতাঞ্জলি" করলেই ঠিক হয়। আমরা 'অঞ্জলি' বলতে যা বুঝি সেটা ইয়োরোপেও আছে, কিন্তু ঠিক শব্দটি নেই। গানের বইখানা পড়ার পর স্পষ্ট বোঝা যায়, 'অঞ্জলি' শব্দটি ইয়োরোপে থাকলে হাইনে অতি নিশ্চয় ঐটেই ব্যবহার করতেন—তার অনেকগুলিই তার প্রেমা প্রিয়ার পদপদ্মে অর্পিত প্রেমপুষ্পাঞ্জলি।

সমস্ত জর্মনি সাত দিনের ভিতর এই কলেজের ছোকরার জয়ধ্বনি গেয়ে উঠল। হাইনে জর্মন কাব্যে আনলেন এক নূতন সুর। অথচ সত্য বলতে কি, এ সুরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই, কারণ গীতগুলি সরলতম ভাষায় রচিত। সরল ভাষা ব্যবহার করা তো আর বিশ্ব-সাহিত্যে কিছু নূতন নয়। কিন্তু জর্মন কাব্যে ঐটেই হল এক সম্পূর্ণ নবীন সুর—কারণ জর্মনদের বিশ্বাস তাদের ঐতিহ্য তাদের সংস্কৃতি এমনই এক অবর্ণনীয় কষ্টেনিষ্পাদিত আত্মোপলব্ধি প্রচেষ্টা এবং অর্ধ-সফলতা-অর্ধনৈরাশ্যে আচ্ছাদিত যে সেটা সরল ভাষায় কিছুতেই প্রকাশ করা যায় না। হাইনে দেখিয়ে দিলেন সেটা যায়। যে রকম সবাই যখন বলেছিল, অসম্ভব, তখন মধুসূদন দেখিয়ে দিয়েছিলেন, অমিত্রাক্ষরে বাঙলা কাব্যসৃষ্টি করা যায়।

হাইনের কবিতা সরল। সকলেই জানেন সরল ভাষায় লেখা কঠিন। সেটাও আয়ত্ত করা যায়। আয়ত্ত করা যায় না—সরল কিন্তু অসাধারণ হওয়া। 'সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু অনলে পুড়িয়া গেল'—সরল অথচ বিরল লেখা।

ইংরেজীতে হাউসম্যানের সঙ্গে হাইনের তুলনা করা হয়। শুনতে

পাই, হাউসমানের 'শ্রপ শা ল্যাডের' মত কোনো ইংরেজী কবিতার বই এত বেশী বিক্রয় হয়নি—প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। সাধারণ জন পড়েছে বইখানা সরল বলে, গুণীরা কিনেছেন বিরল বলে। পাঠককে অনুরোধ করি, দুজনারই লেখা তলিয়ে পড়তে। হাইনে অনেক উঁচুতে।[১]

হাইনের কবিতা বাঙলায় অনুবাদ করেছেন প্রধানত সত্যেন্দ্র দত্ত। 'তীর্থ সলিল ও তীর্থ রেণু'তে—এবং হয়তো অন্যান্য পুস্তকেও কিছু কিছু আছে। আর করেছেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী।[২]

এঁর বই জোগাড় করতে পারিনি, আমি, ১৩১৭ সনের প্রবাসীতে পড়েছি। 'ডী রোজে, ডী লীলিয়ে, ডী টাউবে' 'দি রোজ, দি লিলি দি ডাভের' অনুবাদ করেছেন :

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসবে আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে !
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।

(বাগচী, প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৭)

---

[১] Edmund Wilson মার্কিন সমালোচক। আমি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করি তার প্রধান কারণ তিনি এলিয়েটকে অপ্রিয় সত্য বলতে জানেন। হাইনে-হাউসমান সম্বন্ধে তিনি বলেন,

There is immediate emotional experience in Housman of the same kind that there is in Heine, whom he imitated and to whom he has been compared. But Heine, for all his misfortunes, moves at ease in a large world. There is in his work an exhilartion of adventures, in travel, in love etc. Doleful his accents may sometimes be, he always lets in air and light to the mind. But Housman is closed from the beginning. His world has no opening horizons etc. "The Triple Thinkers," p. 71.

[২] পরে জানতে পারি, বাঙলায় সর্বপ্রথম অনুবাদ করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—প্রথম যৌবনে।

এবারে সত্যেন দত্তের একটি :

জাগিনু যখন ঊষা হাসে নাই,
শুধানু "সে আসিবে কি ?"
চলে যায় সাঁঝ আর আশা নাই,
সে ত' আসিল না হায়, সখি ?

' নিশীথে রাতে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে
জাগিয়া লুটাই বিছানায় ;
আপন রচন ব্যর্থ স্বপন
দুখ ভারে মনে ডুবে যায়।

ভারতবর্ষের প্রভাব হাইনের কবিতায় খুব বেশী আছে বলা যায় না। তাঁর পূর্ববর্তী হিমালয় গ্যোটেই যখন হাইনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি—চণ্ডীদাসের উপর কার প্রভাব !—তখন সে আশা দুরাশা। তবু একটি কবিতার উল্লেখ করি—

' গঙ্গার পার—মধুর গন্ধ ত্রিভুবন
আলো ভরা—
কত না বিরাট বনস্পতিরে ধরে
পুরুষ রমণী সুন্দর আর শান্ত প্রকৃতি-ধরা
নতজানু হয়ে শতদলে পূজা করে।

(লেখকের অনুবাদ)

একদিক দিয়ে হাইনে গীতিকাব্য রচয়িতা, অন্যদিক দিয়ে তিনি সমস্ত জীবন লড়েছেন জর্মনির সাধারণ জনের ব্যক্তিস্বাধীনতার জন্য। সেই 'দোষে' তাকে যৌবনেই নির্বাসন বরণ করতে হয়। জীবনের বেশীর ভাগ তিনি কাটান প্যারিসে। সেখানে তিনি কী রাজার সম্মান পেয়েছিলেন, সে কথা লিখেছেন ভিক্টর হ্যুগোর গুরু ফরাসী সাহিত্যের তখনকারদিনের গ্র্যাণ্ড মাস্টার গোতিয়ের। আর হাইনের

সখা ও সহচর ছিলেন সঙ্গীতের গ্র্যাণ্ড মাস্টার রস্‌সীনি। যদিও পরের কথা, তবু এই সুবাদে একটি মধুর গল্প মনে পড়ল।

জীবনের শেষ আট বছর হাইনের কাটে ঐ প্যারিসেই, রোগশয্যায়, অবশ অথর্ব হয়ে—অসহ্য যন্ত্রণায়। কার্লমার্ক্‌স্‌ যখন তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন তখন হাইনের চোখের পাতা আঙুল দিয়ে তুলে ধরতে হয়েছিল—যাতে করে তিনি মার্ক্‌স্‌কে দেখতে পান। এর কিছু দিন পর হাইনের বাড়িতে আগুন লাগে। বিরাট বপু দরওয়ান রোগজীর্ণ হাইনেকে কোলে করে নিয়ে গেল নিরাপদ জায়গায়। আগুন নেভানোর পর যখন তাকে দরওয়ান আবার কোলে তুলে নিয়ে এল তখন হাইনে মৃদুহাসি হেসে তাঁর এক সখাকে বললেন, 'হামবুর্গে মাকে লিখে দাও, প্যারিসের লোক আমাকে এত ভালোবাসে যে কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।'

সেই সরল দরওয়ান কথাটির গভীর অর্থ বুঝেছিল কি না জানিনে। শুনতে পেয়ে সে বলেছিল, 'হ্যাঁ, মসিয়ো, তাই লিখে দিন।'

ঘটনাটির ভিতর অনেকখানি বেদনা লুকনো আছে। নির্বাসিত হাইনে যতদিন পারেন মায়ের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলেন যে তিনি আর নড়া-চড়া করতে পারেন না।

পাশ্চাত্ত্য কবিরা মায়ের উদ্দেশে বা স্মরণে বড় একটা কবিতা লেখেন না। ইহুদি হাইনের গায়ে প্রাচ্য দেশীয় রক্ত ছিল বলে তিনি ব্যত্যয়। অল্প লোকই হাইনের মত মাকে ভালোবেসেছে। প্যারিসে থাকাকালীন মাত্র দু'বার তিনি গোপনে জর্মনি যান। দু'বারই মাকে দেখবার জন্য। আমার নিজের মনে সন্দেহ আছে, পুলিশ জানতে পেরেও বোধহয় সাধারণের কবি হাইনেকে ধরিয়ে দেয়নি। পুলিশ কবিতা না লিখতে পারে, কিন্তু পুলিশেরও তো মা থাকে।

মাতার উদ্দেশে লেখা হাইনের কবিতা অদ্বিতীয় বলার সাহস আমি না পেলেও বলবো অতুলনীয়। এবং আশ্চর্য, কবিতাটি করুণ এবং মধুর সুরে রচা নয়। ভাষা অবশ্য অত্যন্ত সরল, কিন্তু মূল সুরে

আছে দার্ঢ্য এবং দম্ভ। কাইজারের সঙ্গে প্রজা-মিত্র হাইনের ছিল কলহ—আমার মনে প্রশ্ন জাগে হাইনের সখা রজকিনী-সাধক চণ্ডীদাসকে কি মুকুটহীন কাইজার ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়নি—এবং তাই তিনি কবিতা আরম্ভ করেছেন,

'উচ্চশির উচ্চে রাখা অভ্যাস আমার
আমার প্রকৃতি জেনো অতীব কঠোর
রাজারো অবজ্ঞা দৃষ্টি পাবে না তো মোর
দৃষ্টি কভু নত করে। কিন্তু মাগো—

আর তার পর কী আকুলি-বিকুলি! তোমার সামনে মা, আপনার থেকে মাথা নিচু হয়ে আসে। স্মরণে আসে, কত না অপরাধ করেছি, কত কিছু না করে তোমার পুণ্য হৃদয়কে বেদনা দিয়েছি বার বার। তার স্মৃতি আমাকে যে কী পীড়া দেয়, জানো মা?

সত্যেন দত্তের অনুবাদ তুলে দিতে ইচ্ছে করছে না,—প্রত্যেক অনুতপ্ত জনের মত আমারও মন আঁকুবাঁকু করে, হাইনের মাতৃমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমিও আমার মাতৃমন্ত্র উচ্চারণ করে যাই।

কবিতাটির দ্বিতীয় ভাগে অন্য সুর।

তোমাকে ছেড়ে মা, মূর্খের মত আমি গিয়েছি পৃথিবীর অন্য প্রান্তে—ভালোবাসার সন্ধানে। দোরে দোরে ভিখিরির মত ভালোবাসার জন্য করেছি করাঘাত। আর পেয়েছি শুধু নিদারুণ ঘৃণা। তারপর যখন ক্ষত-বিক্ষত শ্লথ চরণে বাড়ি ফিরেছি তখন দোরের সামনে তুমি মা এগিয়ে এসেত আমার দিকে—

হার মানলুম। সত্যেন দত্তের অনুবাদটিই পড়ুন।

আশ্চর্য লাগে, এই হাইনে লোকটি সরল ভাষায় কি করে রুদ্র করুণ উভয় রসই তৈরী করতে জানতেন। আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে তার হাসি-কান্নায় মেলানো লেখাগুলো। তারই হ্রস্ব একটি শোনাবার জন্য দীর্ঘ এই ভূমিকা। আমি নিরুপায়। হায়, আমার তো সে শক্তি নেই যার কৃপায় লেখক মহাত্মজনকেও স্বল্পে প্রকাশ করতে পারে।

সম্রাট ম্যাক্‌সিমীলীয়নের কাহিনী বলতে গিয়ে হাইনে অনুতাপ করছেন, যে কাহিনীটি তাঁর ভালো করে মনে নেই—অনেককালের কথা কি না। আপসোস করে বলছেন, এ সব জিনিস মানুষ সহজেই ভুলে যায়,—বিশেষ করে যখন তাঁকে প্রতি মাসে প্রফেসরের রোকা মাইনে দেওয়া হয় না, আপন ক্লাশ-লেকচারের নোটবই থেকে মাঝে-মধ্যে পড়ে নিয়ে স্মৃতিটা ঝালিয়ে নেবার জন্য।

ম্যাক্‌সিমীলীয়ন পাষাণ প্রাচীরের কঠিন কারাগারে। তাঁর আমীর-ওমরাহ্, উজীর-নাজীর সবাই তাঁকে বর্জন করেছে। কেউ সামান্যতম চেষ্টা করছে না, তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনা করার। কী খেয়ায়ই না ম্যাকসিমীলীয়ন তাঁর গৌরবদিনের সেই পা-চাটা দলের কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করেছিলেন।

এমন সময় সর্বাঙ্গ কম্বলে ঢেকে এসে ঢুকলো কারাগারের নির্জন কক্ষে একটা লোক। কে এ? এক ঝটকায় কম্বল ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সম্রাট দেখেন, এ যে রাজসভার ভাঁড়, সং, বিশ্বাসী কুন্‌ৎস্ ফন্ ড্যার রোজেন। আশার বাণী, আত্মবিশ্বাসের মন্ত্র নিয়ে এল শেষটায় রাজসভার মূর্খ—সং কুন্‌ৎস্!

'ওঠো, মহারাজ, তোমার শৃঙ্খল ভাঙবার দিন এল। কারামুক্তির সময় এসেছে। নব-জীবন আরম্ভ হল। অমানিশি অতীত—ঐ হেরো, বাইরে প্রথম উষার উদয়।'

'ওরে মূর্খ, ওরে আমার হাবা কুন্‌ৎস্। ভুল করেছিস, রে ভুল করেছিস। উজ্জ্বল খড়্গ দেখে তুই ভেবেছিস সূর্য, আর যেটাকে তুই উষার লালিমা মনে করেছিস সে রক্ত।'

'না, মহারাজ, ওটা সূর্যই বটে, যদিও অসম্ভব সম্ভব হয়েছে—ওটা উদয় হচ্ছে পশ্চিমাকাশে—ছ'হাজার বছর ধরে মানুষ ওটাকে পূব দিকেই উঠতে দেখেছে—এখনো কি ওর সময় হয়নি যে একবার রাস্তা বদলে পশ্চিম দিকে উঠে দেখে কি রকম লাগে!'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন্‌, বল দেখি তো হাবা আমার, তোর টুপিতে যে ছোট ছোট ঘুঙুর বাঁধা থাকতো সেগুলো গেল কোথায়?'

'দুঃখের কথা তোলেন কেন, মহারাজ! আপনার দুর্দিনের কথা ভেবে ভেবে মাথা নাড়াতে নাড়াতে ঘুঙুরগুলো খসে গেল; কিন্তু তাতে টুপির কোনো ক্ষতি হয়নি।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, ওরে মূর্খ, বলতো, রে, বাইরে ও কিসের শব্দ?'

'আজ্ঞে, মহারাজ। কামার কারাগারের দরজা ভাঙছে। শীঘ্রই আপনি আবার মুক্ত স্বাধীন হবেন—সম্রাট।'

'আমি কি সত্যই সম্রাট? হায়, শুধু রাজসভার মূর্খেরই মুখেই আমি এ-কথা শুনলুম।'

'ও রকম করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন না প্রভু! কারাগারের বিষের হাওয়া আপনাকে নির্জীব করে ফেলেছে। আপনি যখন আবার সম্রাট হবেন তখন ধমনীতে ধমনীতে অনুভব করবেন সেই বীর রাজ-রক্ত, আপনি আবার হবেন গর্বিত সম্রাট, দম্ভী সম্রাট। আবার হবেন দাক্ষিণ্যময় এবং আবার করবেন অন্যায় অবিচার, হাসিমুখে, এবং আবার হবেন নেমকহারাম—রাজাবাদশাদের যা স্বভাব।'

'কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন, বল্‌তো হাবা, আমি যখন আবার স্বাধীন হব, তখন তুই কি করবি?'

'আমি আমার টুপিতে ফের ঘুঙুর সেলাই করবো।'

'আর তোর বিশ্বস্ততা প্রভুভক্তির বদলে তোকে কি প্রতিদান, কি পুরস্কার দেব?'

'আঃ। আমার দিলের বাদশাকে কি বলবো! দয়া করে আমার ফাঁসির হুকুমটা দেবেন না।'

এইখানে হাইনে তাঁর গল্পটি শেষ করেছেন।

আমরা বলি 'হা হতোস্মি, হা হতোস্মি! রাজসভার ভাঁড়ই হোক, আর সঙই হোক, সভা-মূর্খ হোক আর পুণ্যশ্লোক গর্দভই

হোক, কুন্‌ৎস্‌ বিলক্ষণ জানতো, রাজারাজড়ার কৃতজ্ঞতাবোধ কতখানি!'

কিন্তু কাহিনীটির তাৎপর্য কি?

হাইনে সেটি গল্পের মাঝখানেই বুনে দিয়েছেন। সে যুগের গল্পে দুটো ক্লাইমেক্‌স্‌ চলতো না বলে আমি সেটি শেষের-কবিতা রূপে রেখে দিয়েছি।

'হে পিতৃভূমি জর্মনি! হে আমার প্রিয় জর্মন জনগণ! আমি তোমাদের কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ রোজেন। তার একমাত্র ধর্ম ছিল আনন্দ, যার কর্ম ছিল তোমাদের মঙ্গলদিনে তোমাদের আনন্দবর্ধন করা, তোমাদের দুর্দিনে কারা-প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে তোমাদের জন্য অভয়বাণী নিয়ে আসা। এই দেখো, আমার দীর্ঘ আচ্ছাদনের ভিতর লুকিয়ে এনেছি তোমার সুদৃঢ় রাজদণ্ড, তোমার সুন্দর রাজমুকুট—আমাকে স্মরণ করতে পারছো না, তুমি মহারাজ? আমি যদি তোমাকে মুক্ত নাও করতে পারি, সান্ত্বনা তো অন্তত দিতে পারব। অন্তত তো তোমার কাছে এমন একজন আপন-জন রইল যে তোমার সঙ্গে তোমার দুঃখ-বেদনার কথা কইবে; তোমাকে আশার বাণী শোনাবে; যে তোমাকে ভালোবাসে; যার সর্বশেষ রসের কথা সর্বশেষ রক্তবিন্দু তোমারই সেবার জন্য। হে, আমার দেশবাসিগণ, তোমরাই তো প্রকৃত সম্রাট, তোমরাই তো দেশের প্রকৃত প্রভু। তোমাদের ইচ্ছা, এমন কি তোমাদের খেয়াল-খুশীই তো দেশের প্রকৃত শক্তি—এ শক্তি 'বিধি-দত্ত' 'রাজদণ্ড'কে অনায়াসে পদদলিত করে! হতে পারে আজ তোমরা পদশৃঙ্খলিত, কারাগারে নিক্ষিপ্ত—কিন্তু আর কত দিন? ঐ হেরো, মুক্তির নব অরুণোদয়!'

* *

হে বাঙালী, আজ তুমি দুর্দশার চরমে পৌঁচেছো।

কোথায় তোমার কুন্‌ৎস্‌ ফন্‌ ড্যার রোজেন? যে তোমাকে আশার বাণী শোনাবে? ॥

যখন তখন লোকে বলে, 'গল্প বলো।'

এ বাবদে স্বর্গত ক্ষিতিমোহন সেনের একাধিক রসাল উত্তর আছে। তিনি বাঙাল উচ্চারণে তখন বলতেন, 'ঘর লেপ্যা মুছ্যা, আতুড়ঘর বানাইয়া, মা ষষ্ঠীর গেছে ব্যাচ্যা চাইলেই তো আর বাচ্যা পয়দা হয় না। নয় মাস দশ দিন সময় লাগে।' অর্থাৎ গল্পের সময় এলে তবে গল্প বেরবে।

ইহুদিদের গল্প এর চেয়ে একটু ভালো। কেন, সে-কথা পরে বলছি।

এক ভালো কথক রাব্বী (ইহুদিদের পণ্ডিত পুরুত) অনেকখানি হাঁটার পর অতিথি হয়ে উঠেছেন এক পরিচিত চাষার বাড়িতে। চাষা-বৌ জানতো, রাব্বী গল্প বলাতে ভারী ওস্তাদ। পাদ্য-অর্ঘ্য না দিয়েই আরম্ভ করেছে, 'গল্প বলুন, গল্প বলুন।' ইতিমধ্যে চাষা ভিন গাঁয়ের মেলা থেকে ফিরেছে একটা ছাগী কিনে। চাষা-বৌ সঙ্গে সঙ্গেই গল্পের বায়না বন্ধ করে দুইতে গেছে ছাগীকে—ইহুদি তো। এক ফোঁটা দুধ বেরল না দেখে চাষা-বৌ বেজার মুখে স্বামীকে শুধালো, 'এ কি ছাগী আনলে গো?' বিচক্ষণ চাষা হেসে বললে, 'ওটা হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গিয়েছে। দানাপানি দাও—দুধ ঠিকই দেবে।' রাব্বী সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'সেই কথাই তো হচ্ছে। দানা-পানি না পেলে আমিই বা গল্প বলি কি করে?'

ক্ষিতিমোহনবাবু ইহুদি ছিলেন না বলে, নিজের সুবিধেটা উত্তরের মারফতে গুছিয়ে নিতে পারেন নি—ইহুদি পারে।

এ গল্পটা মনে রাখবেন। কাজে লাগবে। অন্তত চা-টা পাঁপর-ভাজাটা আসবে নিশ্চয়ই।

সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি, স্কটম্যান সাইক্‌ল্ চালাতে আরম্ভ করে দেবেন। সে আবার কি? 'এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, অর্থাৎ

'এক চিন্তার খেই ধরে অন্য চিন্তা, সেটা থেকে আবার অন্য চিন্তা, এইরকম করে করে মোকামে পৌঁছে যাবেন। এখনো বুঝতে পারলেন না? তবে একটা গল্প দিয়েই বোঝাই।

'সেই যে বাঁদর ছেলে কিছুতেই শটকে শিখবে না, এ ছেলে তেমনি পেটুক—যা-কিছু শিখতে দেওয়া হয়, পৌঁছে যাবেই যাবে মিষ্টি-সন্দেশে। তাকে একং দশং শিখতে দেওয়া হয়েছে। বলছে,

'একং, দশং, শতং, সহস্র, অযুত, লক্ষ্মী, সরস্বতী—'

(মন্তব্য: 'লক্ষ' না বলে বলে ফেলেছে 'লক্ষ্মী' এবং তিনি যখন দেবী তখন তাঁর এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে চলে গেছে আরেক দেবী সরস্বতীতে; তার পর বলছে,)

'লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক, অগ্রহায়ণ—'

(মন্তব্য: 'কার্তিক' মাসও বটে, তাই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে চলে গেল অগ্রহায়ণ পৌষে)

'অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাগ ছেলে-পিলে'

(মন্তব্য: 'মাঘ'কে আমরা 'মাগ'ই উচ্চারণ করে থাকি। তার থেকে 'ছেলে পিলে')

'পিলে, জ্বর, সর্দি, কাশী—'

(মন্তব্য: তার থেকে যাবতীয় তীর্থ।—')

'কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন, গয়া পুরী—

'পুরী, সন্দেশ, রসগোল্লা, মিহিদানা, বোঁদে, খাজা, লেডিকিনি—'

ব্যাস। পুরী তো খাদ্য, এবং ভালো খাদ্য। অতএব তার এসোসিয়েশনে বাদ বাকি উত্তম উত্তম আহারাদি! পৌঁছে গেল মোকামে!

এই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ থেকে গল্পের খেই ধরে নেওয়া যায়। ইহুদির কথা যখন উঠেছে তখন ইহুদির কঞ্জুসী, স্কটম্যানের কঞ্জুসী তাবৎ কঞ্জুসীর গল্প আরম্ভ করে দিতে পারেন।

এগুলোকে আবার সাইক্লও বলা হয়। এটা হল কঞ্জুসীর সাইক্ল

—অর্থাৎ দুনিয়ার যত রকম হাড়কিপটেমির গল্প এই সাইক্লে ঢুকে যাবে। ঠিক সেই রকম আরো গণ্ডায় গণ্ডায় সাইক্ল আছে। স্ত্রী কর্তৃক স্বামীর উপর অত্যাচার, স্ত্রীকে লুকিয়ে পরস্ত্রীর সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি, ট্রেন লেটের সাইক্ল, ডেলি পেসেঞ্জারের সাইক্ল, চালাকির সাইক্ল—

চালাকির সাইক্ল এ দেশে গোপাল ভাঁড় সাইক্লই বলা হয়। অর্থাৎ চালাকির যে কোনো গল্প আপনি গোপালের নামে চালিয়ে যেতে পারেন, কেউ কিছু বলবে না। ইংরিজিতে এটাকে 'ব্ল্যাঙ্কেট' 'অমনিবাস' গল্পগুষ্টিও বলা চলে।

গোপালের অপজিট নাম্বার- অর্থাৎ তাঁরই মত চালাক ছোকরা প্রায় সব দেশেই আছে। প্রাচীন অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির রাজদরবারে ছিলেন মিকশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অধিকাংশ গল্পই সমাজে কল্কে পায় না, ভিয়েনার ভাষায় গেজেলশাফ্ট্ফেইষ নয় (সমাজে অচল)। সেদিক দিয়েও গোপালের সঙ্গে তাঁর গলাগলি।

কিন্তু এ সংসারে বুদ্ধিমানের চেয়ে আহাম্মুখের সংখ্যাই বেশী, তাই আহাম্মুখীর সাইক্লই পাবেন দুনিয়ার সর্বত্র। অধুনা কেন্দ্রের এক প্রাক্তন মন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট সাইক্ল তৈরি হয়েছে এবং হচ্ছে। এঁর জুড়ি ভিয়েনাতে গ্রাফ ফন্ ববে, পশ্চিম ভারতে শেখ চিল্লি (আমার ঠিক মনে নেই, তবে বোধকরি শ্রীযুক্তা সীতা শান্তার হিন্দুস্থানী উপকথাতে এঁর গল্প আছে), এবং সুইটজারল্যাণ্ডে পল্ডি।

পল্ডির গল্প অফুরন্ত। আমি গত দশ বছর ধরে একখানা সুইস্ পত্রিকার গ্রাহক। প্রতি সপ্তাহে পল্ডি নিয়ে একটি ব্যঙ্গচিত্র থাকে। চলেছে তো চলেছে। এখনো তার শেষ নেই। কখনো যে হবে মনে হয় না।

কিছুমাত্র না ভেবে গোটা কয়েক বলি :—

বন্ধু : জানো পল্ডি অক্সিজেন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। ১৭৭০-এ ওটা আবিষ্কৃত হয়।

পল্‌ডি : তার আগে মানুষ বাঁচতো কি করে?

কিংবা

পল্‌ডি : (আমেরিকান টুরিস্টকে এক কাস্‌ল দেখিয়ে) ঐ ওখানে আমার জন্ম হয়। আপনার জন্ম হয় কোন্‌খানে?

টুরিস্ট : হাসপাতালে।

পল্‌ডি : সর্বনাশ! কি হয়েছিল আপনার?

কিংবা

বাড়িউলী : সে কি মিঃ পল্‌ডি? দশটাকার মনিঅর্ডার, আর আপনি দিলেন পাঁচ টাকা বক্‌শিশ!

পল্‌ডি : হেঁ, হেঁ, ঐ তো বোঝো না আর কিপ্টেমি করো। ঘন ঘন আসবে যে!

কিংবা

পল্‌ডি ঘোড়ার রেসে গিয়ে শুধোচ্ছেন : ঘোড়াগুলো এরকম পাগল-পারা ছুটছে কেন?

বন্ধু : কি আশ্চর্য, পল্‌ডি, তাও জানো না! যেটা ফার্স্ট হবে সেটা প্রাইজ পাবে যে।

পল্‌ডি : তা হলে অন্যগুলো ছুটছে কেন?

এর থেকে আপনি রেসের গল্পের মাধ্যমে কুট্টি সাইক্লে অনায়াসে চলে যেতে পারেন। যেমন,

কুট্টি রেসে গিয়ে বেট্ করেছে এক অতি নিকৃষ্ট ঘোড়া। এসেছে সর্বশেষে। তার এক বন্ধু—আরেক কুট্টি—ঠাট্টা করে বললে, 'কি ঘোড়া (উচ্চারণ অবশ্য 'গোরা'—আমি বোঝার সুবিধের জন্য সেগুলো বাদ দিয়েই লিখছি) লাগাইলায় মিয়া! আইলো সকলের পিছনে?'

কুট্টি দমবার পাত্র নয়। বললে, 'কন্ কি কত্তা! দ্যাখলেন না, যেন বাঘের বাচ্চা—বেবাকগুলিরে খ্যাদাইয়া লইয়া গেল!'

কুট্টি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পুব-পশ্চিম উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীই

একদা সুপরিচিত ছিলেন। নবীনদের জানাই, এরা ঢাকা শহরের খানদানী গাড়োয়ান গোষ্ঠী। মোগল সৈন্যবাহিনীর শেষ ঘোড়সওয়ার বা ক্যাভালরি। রিক্‌শার অভিসম্পাতে এরা অধুনা লুপ্তপ্রায়। বহু দেশ ভ্রমণ করার পর আমি নির্ভয়ে বলতে পারি, অশিক্ষিত জনের ভিতর এদের মত witty (হাজির-জবাব এবং সুরসিক বাক্‌-চতুর নাগরিক আমি হিল্লী-দিল্লী কলোন-বুলোন কোথাও দেখিনি।

এই নিন একটি ছোট ঘটনা। প্রথম পশ্চিম বাঙলার 'সংস্করণ'টি দিচ্ছি। এক পয়সার তেল কিনে ঘরে এনে বুড়ি দেখে তাতে একটা মরা মাছি। দোকানীকে গিয়ে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক পয়সার তেলে কি তুমি মরা হাতি আশা করেছিলে!' এর রাশান সংস্করণটি আরো একটু কাঁচা। এক কপেকের (প্রায় এক পয়সা) রুটি কিনে এনে ছিঁড়ে দেখে এক বুড়ি তাতে এক টুকরো ন্যাকড়া। দোকানীকে অনুযোগ করাতে সে বললে, 'এক কপেকের রুটির ভিতর কি তুমি আস্ত একখানা হীরের টুকরো আশা করেছিলে?' এর ইংরিজি 'সংস্করণে' আছে, এক ইংরেজ রমণী এক শিলিঙে এক জোড়া মোজা কিনে এনে বাড়িতে দেখেন তাতে একটি ল্যাডার (অর্থাৎ মই— মোজার একটি টানা সুতো ছিঁড়ে গেলে পড়েনের সুতো একটার পর একটা যেন মইয়ের এক একটা ধাপ-কাঠির মত দেখায় বলে ওর নাম ল্যাডার)। দোকানীকে অনুযোগ জানাতে সে বললে, 'এক শিলিঙের মোজাতে কি আপনি, ম্যাডাম, একখানা রাজকীয় মার্বেল স্টেয়ার-কেস্ আশা করেছিলেন!'

এবারে সর্বশেষ শুনুন কুট্টি সংস্করণ। সে একখানা ঝরঝরে বাড়ি ভাড়া দিয়েছে পুলিসের এসাইকে। বর্ষাকালে কুট্টিকে ডেকে নিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, এখানে জল ঝরছে, ওখানে জল পড়ছে,—জল জল সর্বত্র জল পড়ছে। পুলিসের লোক বলে কুট্টি সাহস করে কোনো মন্তব্য বা টিপ্পনী কাটতে পারছে না—যদিও প্রতি মুহূর্তেই মাথায় খেলছে বিস্তর। শেষটায় না থাকতে পেরে বেরবার সময় বললে,

'ভাড়া তো ছান্ কুল্লে পাঁচটি টাকা। পানি পড়বে না, তো কি শরবত পড়বে?'

কুট্টি সম্বন্ধে আমি দীর্ঘতর আলোচনা অন্যত্র করেছি—পাঠক সেটি পড়ে দেখতে পারেন। আমার শোক-পরিতাপের অন্ত নেই যে, এ সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হতে চললো। আমি জানি এদের উইট্, এদের রিপার্টি লেখাতে ও ছাপাতে সঠিক প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ-সম্প্রদায় সম্পূর্ণ লোপ পাওয়ার পূর্বে পুব বাঙলার কোনো দরদীজন যদি এদের গল্পগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, তবে তিনি উভয় বাঙলার রসিকমণ্ডলীর ধন্যবাদার্হ হবেন।

* * *

পাঠক ভাববেন না, আমি মিষ্ট মিষ্ট গল্প বলার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা করেছি। আদপেই না। তাহলে আমি অনেক উত্তম উত্তম গল্প পেশ করতুম। এখানে গল্পের সাইক্ল্ ও এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজ, কিংবা বলতে পারেন এসোসিয়েশন অব স্টরিজ বোঝাবার জন্য যে সব গল্পের প্রয়োজন আমি তারই কাঁচা পাকা সব কিছু মিশিয়ে কয়েকটি গল্প নিবেদন করেছি মাত্র। (এবং সত্য বলতে কি, আসলে কোনো গল্পই কাঁচা কিংবা পাকা, নিরেস কিংবা সরেস নয়। মোকা-মাফিক জুতসই করে যদি তাগ-মাফিক গল্প বলতে পারেন, তবে অত্যন্ত কাঁচা গল্পও শ্রোতৃমণ্ডলীর চিত্তহরণ করতে সমর্থ হবে, পক্ষান্তরে তথাকথিত শ্রেষ্ঠ গল্পও যদি হঠাৎ বেমক্কা বলে বসেন, তবে রসিকমণ্ডলী বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকাবেন।)

গল্প বলার আর্ট, গল্প লেখার আর্টেরই মত বিধিদত্ত প্রতিভা ও সাধনা সহযোগে শিখতে হয়—এবং দুই আর্টই ভিন্ন। অতি সামান্য সাধারণ গল্পও পূজনীয় স্বর্গত ক্ষিতিমোহন অতি সুন্দর রূপ দিয়ে প্রকাশ করতে পারতেন—অথচ তাঁর লেখা রচনায় সে-জিনিসের কোনো আভাসই পাবেন না; পক্ষান্তরে শ্রদ্ধেয় স্বর্গত রাজশেখরবাবু লিখে গিয়েছেন বিশ্বসাহিত্যের কয়েকটি শ্রেষ্ঠ হাসির গল্প, অথচ তিনি

বৈঠক-মজলিসে ছিলেন রাসভারী প্রকৃতির। গল্প-বলার সময় কেউ কেউ অভিনয়ও যোগ করে থাকেন। সুলেখক অবধূত এ বাবদে একটি পয়লা নম্বরী ওস্তাদ। যদি কখনো তাঁর সঙ্গে আপনার দেখা হয় তবে চন্দননগর চুঁচড়ো অঞ্চলের বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক কি ভাবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করেন তার বর্ণনা দিতে বলবেন। কিন্তু এ প্রবন্ধের গোড়াতে যে সাবধান বাণী দিয়ে আরম্ভ করেছি, সেটি ভুলবেন না। বেমক্কা যখন তখন অনুরোধ করেছেন, কি মরেছেন। অবধূত তেড়ে আসবে। অবধূত কেন রসিকজন মাত্রই তেড়ে আসে। এই তো সেদিন অবধূত বলছিল, 'জানেন, মাস কয়েক পূর্বে ১১০ ডিগ্রীর গরমে যখন ঘণ্টাতিনেক আইঢাই করার পর সবে চোখে অল্প একটু তন্দ্রা লেগে আসছে এমন সময় পাড়া সচকিত করে টেলিগ্রাফ পিয়ন ঢঙের সজোরে কড়া নাড়া। দরজা খুলতে দেখি দুই অচেনা ভদ্র-লোক। কড়া-রোদ্দুর, রাস্তার ধুলোমুলোয় জড়িয়ে চেহারা পর্যন্ত ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। কি ব্যাপার? 'আজ্ঞে, আদালতে শুনতে পেলুম, আমাদের মোকদ্দমা উঠতে এখনও ঘণ্টা-দুয়েক বাকি, তাই আপনার সঙ্গে দুদণ্ড রসালাপ করতে এলুম।' আমি অবধূতকে শুধোলুম, 'আপনি কি করলেন?' অবধূত উদাস নয়নে ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। আমি আর বেশি ঘ্যাঁটালুম না। কারণ মনে পড়ে গেল, মোটামুটি ঐ সময়ে চুঁচড়োর জোড়া-ঘাটের কাছে, সদর রাস্তার উপর দুটো লাশ পাওয়া যায়। খুনী ফেরার। এখনো ব্যাপারটার হিল্লে হয়নি।

'ভালো করে গল্প বলতে হলে আরো মেলা জিনিস শিখতে হয়—' এবং সেগুলো শেখানো যায় না। আমি স্বয়ং তো আদৌ কোনো প্রকারের গল্প বলতে পারিনে। প্লট ভুলে যাই, কি দিয়ে আরম্ভ করেছিলুম, কি দিয়ে শেষ করবো তার খেই হারিয়ে ফেলি, গল্প আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেই খিলখিল করে হাসতে আরম্ভ করি, 'ঐষ্‌যা, কি বলছিলুম' প্রতি দু' সেকেণ্ড অন্তর অন্তর আসে, ইতি-

মধ্যে কেউ হাই তুললে তাকে তেড়ে যাই, শেষটায় সভাস্থ কেউ দয়াপরবশ হয়ে গল্পটা শেষ করে দেন—কারণ যে গল্পটি আমি আরম্ভ করেছিলুম সেটি মজলিসে ইতিপূর্বে, আমারই মুখে, ছেঁড়া-ছেঁড়া-ভাবে অন্তত পঞ্চাশ-বার শুনে, জোড়া-তাড়া দিয়ে খাড়া করতে পেরেছে। তদুপরি আমার জিভে ক্রনিক বাত, আমি তোৎলা এবং সামনের দুপাটিতে আটটি দাঁত নেই।

তাহলে শুধোবেন, তবে তুমি এ প্রবন্ধ লিখছ কেন? উত্তর অতি সরল। ফেল করা স্টুডেন্ট ভালো প্রেইভেট ট্যুটর হয়! আমি গল্প বলার আর্টটা শেখার বিস্তর কস্ত করে ফেল মেরেছি বলে এখন এর ট্যুটরি লাইনে আমিই সম্রাট।

*　　　　*　　　　*

কিন্তু এ আর্ট এখন মৃতপ্রায়; কারণটা বুঝিয়ে বলি।

পূর্বেই নিবেদন করেছি, গল্পের কাঁচা পাকা কিছুই নেই, মোকা-মাফিক বলতে পারা, এবং বলার ধরনের উপর ঐ জিনিস সম্পূর্ণ নির্ভর করে।

এ তত্ত্বটি সব চেয়ে ভালো করে জানেন, বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায় (ওয়ার্ল্ড স্টরি-টেলারস্ ফেডারেশন)। মার্কিন মুল্লুকে প্রতি বৎসর এঁদের অধিবেশন হয় এবং পৃথিবীর সর্বকোণ থেকে ডাঙর ডাঙর সদস্যরা সেখানে জমায়েত হন। এঁরা বিলক্ষণ জানেন, গল্প মোকা-মাফিক এবং কায়দা-মাফিক বলতে হয়। চীনের ম্যাণ্ডারিন সদস্য যে গল্পটি বলতে যাচ্ছেন সেটি হয়তো সবচেয়ে ভালো বলতে পারেন বঙ্গো-ইন-কঙ্গোর সদস্য লুসাবুবু। ওদিকে পৃথিবীর তাবৎ সরেস গল্পই এঁরা জানেন। কি হবে, চীনার কাঁচা ভাষায় পাকা দাড়িওয়ালা ঐ গল্প তিন শ তেষট্টি বারের মত শুনে। অতএব এঁরা একজোটে বসে পৃথিবীর সব কটি সুন্দর সুন্দর গল্প জড়ো করে তাতে নম্বর বসিয়ে দিয়েছেন। যেমন মনে করুন, কুট্টির সেই পানি পড়ার বদলে শরবত পড়ার গল্পটার নম্বর ১৯৮।

এখন সে অধিবেশনে গল্প বলার পরিস্থিতিটা কি রূপ ?

যেমন মনে করুন, কথার কথা বলছি, সদস্যরা অধিবেশনের গুরু গুরু কর্মভার সমাধান, করে ব্যানকুয়েট খেতে বসেছেন। 'ব্যানকুয়েট' বললুম বটে, আসলে অতি সস্তা লাঞ্চ—'লাঞ্ছনা'ও বলতে পারেন, একদম দা' ঠাকুরের পাইস হোটেল মেসের। এক মেম্বর ডালে পেলেন মরা মাছি। অমনি তাঁর মনে পড়ে গেল, সেই বুড়ির এক পয়সার তেলে মরা মাছি, কিংবা 'পানি না পড়ে শরবত পড়বে নাকি' গল্প। তিনি তখন গল্পটি না বলে শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বললেন '১৯৮'।

সঙ্গে সঙ্গেই হোহো অট্টহাস্য। একজন হাসতে হাসতে কাং হয়ে পাশের জনের পাঁজরে খোঁচা দিয়ে বার বার বলছেন, 'শুনলে ? শুনলে ? কি রকম একখানা খাস গল্প ছাড়লে !' আরেকজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছে—তাকে মাসাজ করতে শুরু করেছেন আরেক সদস্য।

* * *

অতএব নিবেদন, এ সব গল্প শিখে আর লাভ কি ? এদেশেও কালে বিশ্ব-গল্পকথক-সম্প্রদায়ের ব্রাঞ্চ-আপিস বসবে, সব গল্পের কপালে কপালে নম্বর পড়বে, আপনি আমি কোনো-কিছু বলার পূর্বেই কেউ না কেউ নম্বর হেঁকে যাবে। তারপর নীলাম। ১৯৮ নম্বর বলতে না বলতেই এসোসিয়েশন অব আইডিয়াজে কারো মনে পড়ে যাবে অন্য গল্প—তিনি হাঁকবেন ২৭২। তারপর ৩১৮—আর সঙ্গে সঙ্গে হাসির হররা, রগড়ের গড়িয়াহাট—আপনি আমি তখন কোথায় ?

হ্যাঁ, অবশ্য, যতদিন না ব্রাঞ্চ-আপিস কায়েম হয় ততদিন অবশ্য এইসব টুটা-ফুটা গল্প দিয়ে থ্রি-লেগেড রেস রান করতে পারেন। কিংবা দুষ্ট ছেলেকে শাসন করার জন্য গুরুমশাই যে রকম বলতেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

বাই দি উয়ে—এ গল্পটাও কাজে লাগে। নেমন্তন্ন-বাড়িতে চপ কাটলেট না আসা পর্যন্ত লুচি দিয়ে ছোলার ডাল খেতে খেতে বলতে পারেন, 'যতক্ষণ বেত না আসে ততক্ষণ কানমলা চলুক।'

শের্শে লা ফাম্

(Cherchez la femme)

খুন, রাহাজানি, চুরি ডাকাতি যাই হোক না কেন, এক ফরাসী হাকিম বিচারের সময় অসহিষ্ণু হয়ে বার বার শুধোতেন, 'মেয়েটা কোথায় ? শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো !' তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, দুনিয়ার কুল্লে খুন-খারাবীর পিছনে কোনো না কোনো রমণী ঘাপটি মেরে বসে আছে। আসামী, ফরিয়াদী, সাক্ষী, কোনো না কোনোরূপে তাকে আদালতে সশরীরে উপস্থিত (হাবেয়াস্ কর্পুস) না করা পর্যন্ত মোকদ্দমার কোনো সুরাহা হবে না। অতএব শের্শে লা ফাম্—মেয়েটাকে খোঁজো ! একবার ইনশিওরেন্স মোকদ্দমা ছিল কোনো চিমনি-পরিদর্শককে নিয়ে। একশ ফুট উঁচু থেকে সে পড়ে যায়। তার খেসারতি মঞ্জুর হয়ে গেলে উকিল শুধোলেন, 'কই, হুজুর এ মোকদ্দমায় আপনার শের্শে লা ফাম্ তো খাটলো না ?' হুজুর দমবার পাত্র নয়। সোল্লাসে বললেন, 'খোঁজো, খোঁজো, পাবে।' হবি তো হ—তাই ! তাল্লাশীতে বেরল, সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় সে হঠাৎ নিচের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল এক সুন্দরী রমণীর দিকে—পড়ে মরল পা হড়কে !

*　　　*　　　*

আকাশবাণী সম্বন্ধে নানাপ্রকারের ফরিয়াদ প্রায়ই শোনা যায়। আল্লার দুনিয়া সম্বন্ধেই যখন হামেহাল নালিশ লেগেই আছে তখন এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গুণীজ্ঞানীরা বলেন, প্রাচ্যের মানুষ অন্তর্মুখী—প্রতীচ্যের বহির্মুখী। এতবড় তত্ত্বকথার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো কথা বলার হক্ক আমার নেই। তবে একটা জিনিস আমি স্বচক্ষে লক্ষ্য করেছি—

গরমের দেশের লোক বারান্দা রক তেঁতুলতলায় দিন কাটায় আর পশ্চিমের লোক বাড়ির ভিতর।

আমরা আপিস-আদালত কলেজ-কারখানা থেকে বেরিয়েই একটুখানি হাওয়া খেয়ে গা-টা জুড়িয়ে নিতে চাই। 'ঈভনিং ওয়ক' 'মর্নিং ওয়ক' সমাসগুলো ইংরিজি ভাষাতে সত্যই চালু আছে কিনা, কিংবা ইংরেজ এদেশে এসে নির্মাণ করেছে, জানিনে, কিন্তু ও দুটোর রেওয়াজ শীতের দেশে যে বেশী নেই সে-কথা বিলক্ষণ জানি। আমরা তাই ময়দানে, গঙ্গার পারে হাওয়া-টাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরি। নিতান্ত শীতকালের কয়েকটি দিন ছাড়া কখনো ঘরের ভিতর ঢুকতে চাইনে। রকে বসে রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা দেখি। পক্ষান্তরে শীতের দেশের লোক ছুটি পাওয়া মাত্রই ছুট দেয় বাড়ির দিকে। আপিসে-দপ্তরে আগুনের ব্যবস্থা উত্তম নয়—ওদিকে গৃহিণী বসবার ঘরে গন্‌গনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছেন। পড়িমরি হয়ে বাড়ি পৌঁছেই সে পা দুটি আগুনের দিকে বাড়িয়ে বসে যায় আরাম-চেয়ারে, খুলে দেয় রেডিয়ো। আমাদের রকে রেডিয়ো থাকে না, বৈঠকখানাতেও কমই —কারণ বাড়ির মেয়ে-ছেলেরা ওটা নিয়ে হরবকতই নাড়াচাড়া করে। তাই ওটা থাকে অন্দরমহলেই।

আমাদের যাত্রাগান, কবির লড়াই সবই খোলামেলায়। এ যুগের প্রধান আমোদ ফুটবল ও ক্রিকেট খেলাতে। নিতান্ত সিনেমাটা ঘরের ভিতর। কিন্তু সিনেমাও চেষ্টা করে সেটা ভুলিয়ে দিতে। ঘড়ি ঘড়ি মাঠ-ময়দান, নদীপুকুর, পাহাড়-সমুদ্র দেখায় বলে খানিকক্ষণ পরেই ভুলে যাই যে, ঘরের ভিতর বন্ধ রয়েছি। তবু পাছে অন্য কোনো খোলামেলার আমোদের সন্ধান পেয়ে আমরা পালিয়ে যাই তাই সিনেমাওলারা ওটাকে অ্যারকণ্ডিশন করে মাঠ-রক-বৈঠকখানার চেয়েও আরামদায়ক করে রাখে। কারণ ইয়োরোপে যে মুহূর্তে ঘরে বসে টেলিভিশনের সাহায্যে সিনেমার আনন্দ পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে গাহকের অভাবে আট থেকে দশ আনা পরিমাণ সিনেমা উঠে গেল।

আমাদের দেশের মেয়েরা হুট্ করে রাস্তায় বেরতে পারে না, সিনেমা চায়ের দোকানে যেতে পারে না, তাই রেডিয়োটা ওদের কাছে এক বিধিদত্ত সওগাত। কর্তা-বাচ্চারা আপিস ইস্কুল চলে যাওয়ার পর তাঁরা নেয়ে খেয়ে চুল ঝুলিয়ে দিয়ে মুচড়ে দেন রেডিয়োর কানটা (পাশের বাড়ির রেডিয়োটা যে গাঁক্‌গাঁক্ করে আপনার বিরক্তির উৎপাদন করে তার প্রধান কারণ ও-বাড়ির বৌমা এ-ঘর ও-ঘরে যেখানেই কাজ করুন না কেন সেটা যাতে করে সর্বত্রই শুনতে পান তার জন্য ওটাকে চড়া সুরে বেঁধে রেখেছেন),—মহিলা-মহল তো আছেই, তারপর সিংহল বেতারের বিস্তর ফিল্‌মী-গানা যেগুলো বউমা, দিদিমণি সিনেমাতে একবার শুনেছিলেন, এখন বার বার শুনে শুনে কণ্ঠস্থ করতে চান।

পুরুষরা এদেশে যদিওবা বেতার শোনে তবে সেটা খেয়ে দেয়ে খবরটা শোনার জন্যে। এবং তার পরই আকাশবাণী আরম্ভ করে দেয় উচ্চাঙ্গ শাস্ত্রীয় কালোয়াতী সঙ্গীত। ওসবে কার, মশাই, ইনট্রেস্ট? কিংবা হয়তো তখন ইংরিজিতে টক. শুনলেন, মন্ত্রীমশাই বক্তৃতা দিচ্ছেন, জাপানের ড্রাই-ফার্মিং কিংবা জান্‌জিবারের কোপারেটিভ সিস্‌টেম সম্বন্ধে।

মেয়েরাই যে আকাশবাণী—অন্তত কলকাতা কেন্দ্রের—মালিক সে কথা যদি বিশ্বাস করতে রাজী না হন তবে আমি আর একটি মোক্ষম প্রমাণ কাগজে কলমে পেশ করতে পারি।

'বেতার-জগৎ' পাক্ষিক পত্রিকাখানির বিজ্ঞাপনগুলো মন দিয়ে পড়লে দেখতে পাবেন তাতে আছে, গয়না, প্রসাধনদ্রব্য, ভেজিটেবল ওয়েল, শাড়ি, কাপড় কাচা সাবান। টাইয়ের বিজ্ঞাপন একটি আছে—সেখানে এক তরুণী টাইটি পরিয়ে দিচ্ছেন তাঁর প্রিয়জনকে, অর্থাৎ বিজ্ঞাপনটি মেয়েদের জন্যই। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক কথা—বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রায় নেই। এবং 'দেশ' পত্রিকাতে সেই জিনিসেরই ছয়লাপ। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 'বেতার জগৎ' মেয়েদের কাগজ, আর 'দেশ' প্রধানত পুরুষের কাগজ।

ইয়োরোপের উচ্চতম শিক্ষিত লোকেরা বেতার শোনেন এবং তাঁদেরই চাপে বিবিসিকে একটি 'হাইব্রাও'—উন্নাসিক—থার্ড প্রোগ্রাম আরম্ভ করতে হল। কলকাতা আকাশবাণীর সবচেয়ে পপুলার প্রোগ্রাম—ড্রামা। সে সময় বেতারযন্ত্রের চতুর্দিকে কারা ভিড় জমায় পাঠক সেটি লক্ষ্য করে দেখবেন। আমার নিজের ব্যক্তিগত দৃঢ় বিশ্বাস 'আকাশবাণী কলকাতা' যদি প্রতিদিন এক ঘণ্টা-ব্যাপী ড্রামা চালায় (এবং তাতে যথা পরিমিত রোদন, আক্রোশ, হুঙ্কার এবং ন্যাকামি থাকে) তবে লাইসেন্সের সংখ্যা আরো বেড়ে যাবে।

এটা আমি কিছু মস্করা করে বলেছিনে। আমার মূল বক্তব্য এই, যখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মেয়েরা কলকাতার রেডিয়ো-কেন্দ্র দখল করে নিয়েছেন (এবং তাঁরা মোটামুটি সন্তুষ্টই আছেন, কারণ খবরের কাগজে কোনো নিন্দাসূচক চিঠি তাঁদের তরফ থেকে আমি বড় একটা দেখিনি) আর পুরুষরা ঐ জিনিসটে অবহেলা করে যাচ্ছেন (যাঁরা ওস্তাদী গাওনা গান তাঁদের চেলাচামুণ্ডা এবং শ্রোতৃসংখ্যা এতই কম যে 'অনুরোধের আসরে' ওস্তাদী গান গাইবার অনুরোধ আসে অতিশয়, সাতিশয় কালে-কস্মিনে) তখন কেন বৃথা হাবি-জাবি নানা প্রোগ্রাম দিয়ে 'রুচি মার্জিত করা,' অর্ধলুপ্ত ধামার ধ্রুপদ পুনর্জীবিত করার চেষ্টা, স্বরাজ লাভের পর জেলে কত গ্রেন কুইনিন দেওয়ার ফলে কত পার্সেন্ট ম্যালেরিয়া রুগী কমলো সেইটি সাড়ম্বরে শোনানো, ফাইভ-ইয়ার প্ল্যান—কমুনিটিপ্রজেক্ট ড্রাইফার্মিং-ইন্ জান্‌জিবার (কিংবা জাপানও হতে পারে, আমার মনে নেই) শোনানো ?

তাই বলে কি কলকাতা বেতারকেন্দ্র শুধু রান্নার রেসিপি আর স্যাঁতসেঁতে নাটক শোনাবে ? আদপেই না। এবং সেইটে নিবেদন করার জন্যই আমি এতক্ষণ অবতরণিকা করছিলুম।

এদেশের মেয়েরা শিক্ষায় পুরুষদের বেমানানসই পিছনে।

সাহিত্য সঙ্গীত নাট্যে তাঁদের রুচি সম্বন্ধে অনেকেই অনেক রকম অপ্রিয় মন্তব্য করে থাকেন—এমন কি মেয়েরাও। কিন্তু একটা কথা আমি কিছুতেই বিশ্বাস করবো না—মেয়েরা আত্মোন্নতি চায় না।

তাই আমার বক্তব্য, ঐ 'মহিলা-মহল' ব্যাপারটি ব্যাপকতর করুন। বেলাদি ইন্দিরাদি উত্তম ব্রডকাস্টার, কিন্তু প্ল্যান করুন কি করে দেশের সব চেয়ে গুণী-জ্ঞানীকে—স্ত্রী এবং পুরুষ দুই-ই—এ কাজে লাগানো যায়। অবকাশরঞ্জন আনন্দদানকে আস্তে আস্তে উচ্চতর পর্যায়ে তোলা, শিক্ষার প্রসার, সামাজিক কুসংস্কার দূরীকরণ, বৃহত্তর জগতের সঙ্গে পরিচয় দান—ইত্যাদি তাবৎ ব্যাপার, অনেকখানি—সময় নিয়ে—এমন কি বেতারের বারো আনা সময় নিয়ে—ধীরে ধীরে উচ্চতর পর্যায়ে তুলুন, এবং সর্বক্ষণ ঐ মেয়েদের চোখের সামনে রেখে। পাঠক এবং শ্রোতা যোগাড় করা বড় কঠিন। এস্থলে যখন পেয়ে গেছেন তখন এই বেতারের মাধ্যমে দিন না একটা আপ্রাণ চেষ্টা এঁদের আরো আনন্দ দিতে—এঁদের নারীত্ব মনুষ্যত্ব সফলতর পূর্ণতম করতে। জাপানী চাষ শুনিয়ে পুরুষকে তো পাচ্ছেনই না, শেষটায় মেয়েদের হারাবেন। ইতো ভ্রষ্ট ততো নষ্ট।

পুরুষদের জন্য অন্য একটা চ্যানেল (ওয়েভ লেন্থ) নিয়ে নূতন একটা চেষ্টা দিতে পারেন। ফল অবশ্য কিছু হবে না। কারণটা গোড়াতেই নিবেদন করেছি॥

নিমিত্ত মাত্র। আসলে প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে, সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলে কি কোনো পার্থক্য নেই ? যদি থাকে তবে তার বিভাগ করবো কোন্ সংজ্ঞা দিয়ে ? আর যদি করা যায় তবে পুলিসের সাহায্য নিয়ে অশ্লীল জিনিস বন্ধ করবো, না অন্য কোনো পন্থা আছে ?

এ প্রশ্ন আজ এই প্রথম ওঠেনি সে কথা সবাই জানেন, এবং একথাও নিশ্চয়ই জানি যে, এ প্রশ্নের চূড়ান্ত সমাধান কোনো দিনই হবে না—যতদিন মানুষ গল্প লিখবে, ছবি আঁকবে, একে অন্যের সঙ্গে কথা কইবে, এমন কি, অঙ্গভঙ্গী করবে (অধুনা কলকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে কোনো নর্তকীর নৃত্য দেখে পুলিস বলে, এগুলো অশ্লীল, নর্তকী ও ম্যানেজার বলেন, ওগুলো উচ্চাঙ্গের নৃত্য-কলা, আদালত বলেন, মহিলাটির নৃত্যের পিছনে বহু বৎসরের একনিষ্ঠ কঠোর সাধনা রয়েছে এবং সে নৃত্য কলাসৃষ্টি)।

লেডি চ্যাটারলি খালাস পেলে পর বিলেতে এ নিয়ে প্রচুর তোলপাড় হয়—অবশ্য স্মরণ রাখা ভালো যে, মার্কিন আদালতে লেডি চ্যাটারলির লয়ার ('লাভার' না লিখে আমেরিকা 'লয়ার'—'উকিল' লিখেছিল) পূর্বেই জিতে গিয়েছিলেন, এবং গত ত্রিশ বৎসর বইখানা কন্টিনেন্টের সর্বত্রই ইংরিজিতেও অনুবাদে পাওয়া যেত। আরো মনে রাখা ভালো যে, এসব বাবদে ইংরেজ সবচেয়ে পর্দা পিসি মার্কা, অর্থাৎ গোঁড়া। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হবে। লেঁও ব্লুম্ যখন ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী তখন তিনি একখানা বই বের করেন, নাম 'মারিয়াজ'—বিবাহ। ভূদেববাবুর 'পারিবারিক প্রবন্ধ' গোছের বই—যদিও ব্লুমের মূল বক্তব্য ভূদেববাবুর ঠিক উল্টো। নানা কথার ভিতর তাঁর অন্যতম মূল বক্তব্য ছিল, যুবক-যুবতীরা বিয়ের পূর্বে পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতা করে নিয়ে বিয়ে করলেই

ভালো—তা হলে একে অন্যকে বোঝার সুবিধে হয়, বিবাহবিচ্ছেদের আশঙ্কা কমে যায় (!)। ইংরেজ সমালোচক তখন বলেছিলেন যে, ইংলণ্ডের কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি আপন নামে এরকম একখানা বই প্রকাশ করতেন তবে পরের দিনই তাঁকে মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিতে হত।

তাই চ্যাটারলি জিতে যাওয়ার পর একাধিক প্রাচীনপন্থী বললেন,

(১) এ বইয়ে যে 'নৈতিক আদর্শ' প্রচারিত হয়েছে সেটা ইংরেজের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈতিক ঐতিহ্যকে চ্যালেঞ্জ করেছে ও লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ নরনারী এতে করে মর্মাহত হবেন।

(২) এ বইয়ের অনুকরণে যদি বিলাতের যুবক-যুবতীরা তাদের যৌন আদর্শ নির্মাণ করে তবে দেশের সর্বনাশ হবে।

(৩) এ বই আইনে জিতে যাওয়ায় এর অনুকরণে—লাই পেয়ে—অশ্লীলতর ও জঘন্যতর বই বাজার ছেয়ে ফেলবে।

(৪) এ বই জিতে যাওয়ায় সাহিত্যিক তথা সাধারণ নাগরিক আইন-রাজ্যে অনেকখানি এগিয়ে গেল বটে, কিন্তু নীতির রাজ্যে সে পিছিয়ে গেল। দা-কাটা বাঙলায় ;—আইনের জয়, ধর্মের পরাজয়।

নবীনরা বললেন,

(১) স্ত্রী-পুরুষের যে সম্পর্ক গোঁড়া ইংলণ্ড বড় জোর বরদাস্ত করে নিত, লরেন্স যার সত্য মূল্য দেখিয়ে (কোনো কোনো সমালোচক 'স্পিরিচুয়াল' পর্যন্ত বলেছেন) সমাজের অশেষ কল্যাণ করেছেন তারই জয় হয়েছে।

(২) বাজারে যখন ভূরি ভূরি অশ্লীল, পাপ, পৈশাচিক উত্তেজনা-দায়ক বই অবাধে বিক্রি হচ্ছে তখন লরেন্সের এই উত্তম সাহিত্য নির্বাসিত করা শুধু যে আহাম্মুকী তা নয়, অন্যায়ও বটে।

(৩) শক্তিশালী সত্যোন্মচনকারী লেখকদের এখন আর পুলিসের ভয়ে বিশেষ বিশেষ বিষয় বর্জন করতে হবে না।

(৪) অশ্লীল কদর্য পুস্তক কামকে কর্দমের স্তরে টেনে নামিয়ে আনে। লরেন্সের বই তাকে সম্মানের উচ্চাসনে বসিয়েছে।

সংস্কৃত অলঙ্কারে শ্লীল অশ্লীল নিয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। কিন্তু আইন করে কোনো বই বন্ধ করে দেবার প্রস্তাব কেউ করেছেন বলে শুনিনি। হয়তো তার প্রধান কারণ এই যে, বুদ্ধের আমলেই সংস্কৃত সাধারণ জনের পক্ষে কঠিন ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; সে ভাষা আয়ত্ত করতে করতে মানুষের এতখানি বয়েস হয়ে যেত যে, তখন কি পড়ছে না পড়ছে তার দায়িত্ব তারই হাতে ছেড়ে দেওয়া যেত।

কিন্তু আরবীতে লেখা আরব্যোপন্যাস ? সে তো অল্প আরবী শেখার পরেই পড়া যায়। বাজারে যে আরব্যরজনী ইংরিজি বা বাঙলাতে পাওয়া যায় সেগুলোর কথা হচ্ছে না ; তথাকথিত 'আপত্তিজনক' অংশগুলো সেগুলোতে নির্মমভাবে কেটে দেওয়া হয়। বারো না আট ভলুমে বার্টনের যে ইংরিজি অনুবাদ আছে তাতেও তিনি হিমসিম খেয়ে 'আনট্রেন্‌স্‌লেটেবল' বলে বেশ কিছু বাদ দিয়েছেন। এমন কি বাইরুতে ক্যাথলিক পাদ্রীদের দ্বারা প্রকাশিত আরবী আরব্যরজনীতেও বিস্তর জিনিস বাদ পড়েছে। এবং আরব-ভূমিতে ছেলেবুড়ো সবাই পড়ে সেই সম্পূর্ণ সংস্করণ—কেউ কিছু বলে না।

ফার্সীতে লেখা জালালউদ্দীন রূমীর মস্‌নবী গ্রন্থের উল্লেখ করতে পেলে আমি বড় আনন্দ বোধ করি। এ বই ইরানের গীতা এবং এতে হেন পাপাচার নেই যার বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়নি। ইংরিজিতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদক সে-সব অংশ লাতিনে অনুবাদ করেছেন। (সংস্কৃত শিখতে শিখতে মানুষ যে রকম বয়স্ক হয়ে যায় এবং ধরে নেওয়া হয় তার শাস্ত্রাধিকার হয়েছে—লাতিনের বেলাও তাই।) অথচ ইরানভূমিতে আট বছরের ছেলেও যদি মসনবী নিয়ে বসে, পিতা এবং গুরু তাতে আনন্দিত হন।

বাংলা গদ্য আরম্ভ হয়, 'পরিষ্কার হাত' নিয়ে এবং উনিশ শতকের শেষের দিকে দেখতে পাই, ভারতচন্দ্র অশ্লীল ব্যাখ্যা পাচ্ছেন। ভিক্টোরিয়া যুগের ছুঁৎবাই তখন আমাদের পেয়ে বসেছে। এরই

মাঝখানে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ 'চৌর-পঞ্চাশিকা' গীতিকাব্যের উদ্দেশে গেয়ে উঠলেন,

'ওগো সুন্দর চোর
বিদ্যা তোমার কোন্ সন্ধ্যার
কনক-চাঁপার ডোর।'

(১৩০৪ সন) কল্পনা।

ভারতচন্দ্র 'বিদ্যাসুন্দর' রচেছেন এই চৌরপঞ্চাশিকার প্লট নিয়েই এবং এ কাব্যের বাংলা অনুবাদও করেছেন। এরকম অনবদ্য খণ্ডকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল।

শ্লীল অশ্লীলে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। সৎসঙ্গ অসৎসঙ্গে নিশ্চয়ই পার্থক্য আছে। এমন কি কাব্য অশ্লীল না হয়েও অনুচিত হতে পারে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং কালিদাস এ পার্থক্য জানতেন না। কুমারসম্ভবের অষ্টম সর্গ সম্বন্ধে কবিরাজ রাজেন্দ্রভূষণ বলেছেন, 'জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট ব্যাপার হইলেও পড়িতে লজ্জা জন্মে। তাই আলঙ্কারিকগণ, এই অষ্টম সর্গের উপর "অত্যন্তমনুচিতম্" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমকাইলে, মহামায়ার "বিপরীতরতাতুরাম্" এই ধ্যানাংশেরও পরিহার করিতে হয় এবং আদিকবি বাল্মীকি-কৃত গঙ্গাস্তবের "তুঙ্গস্তনাস্ফালিতম্" প্রভৃতি অংশ বাদ দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের উহা না পড়াই ভালো।'*

কালিদাসের তুলনায় বামন লরেন্স্ নাকি কামকে স্বর্গীয় (স্পিরিচুয়াল) স্তরে তুলতে চেয়েছিলেন! তা তিনি চেয়েছিলেন কি না, পেরেছিলেন কিনা সে কথা আমি জানি না,—তবে আমার

* পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কালিদাসের গ্রন্থাবলী ২য় ভাগ, বসুমতী, পৃঃ ১৫৫ পাদটীকা।

মনে দৃঢ় বিশ্বাস, কালিদাস চেয়েছিলেন এবং তাই জগন্মাতা ও জগৎ-পিতার দাম্পত্যপ্রেম বর্ণনা করেছিলেন। কারণ কামকে যদি সত্যই পূতপবিত্র করতে হয়, তবে সর্ব দেশকালপাত্রে পূজ্য পিতা মাতা এবং তাঁদেরও পূজ্য জগন্মাতা ও জগৎপিতার দাম্পত্য প্রেমের চেয়েও উচ্চতর লোক তো আর কোথাও নেই।

স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কোনো কোনো আলঙ্কারিকের মতে তিনি সক্ষম হননি, কারণ তাঁরা বলেছেন, কালিদাস 'অত্যন্ত অনুচিত' কর্ম করেছেন। পড়ার সময় 'লজ্জাবোধ' সত্ত্বেও বিদ্যাভূষণ কিন্তু তাঁর নিন্দা করেননি। পড়ার সময় আমার সঙ্কোচ বোধ হয়নি, কারণ প্রতি ছত্রে আমি প্রতীক্ষায় ছিলাম, কালিদাস আমাকে তাঁর অতুলনীয় কাব্যসৃষ্টি প্রসাদাৎ সর্বশেষে আমাকে এমন দ্যোলোকে উড্ডীয়মান করে দেবেন যেখানে কামের পার্থিব মলিনতার কথা আমার স্মরণেই থাকবে না। হয়তো আমি অক্ষম, কিংবা কালিদাসের সে শক্তি ছিল না। ব্যাসের যে সে শক্তি ছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কাম সম্বন্ধে ব্যাসের মনে কোনো দ্বন্দ্ব ছিল না বলে তিনি নির্লিপ্ত ভাবে তার বর্ণনা দিয়েছেন।

রচনা দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। সংক্ষেপে নিবেদন,

ইয়োরোপের অনুকরণে যদি আমরা অত্যধিক শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে কামকে সাহিত্য থেকে তাড়িয়ে দিই তবে নিছক নির্জলা অশ্লীল রচনা উত্তরোত্তর বেড়েই যাবে। আর্টের কাজ তাকে আর পাঁচটা বিষয়-বস্তুর মত আপন কাব্যলোকে রসস্বরূপে প্রকাশ করা। কালিদাস করেছেন, চূড় কবি করেছেন, বিদ্যাপতি ভারতচন্দ্র করেছেন।

অশ্লীল সাহিত্য তাড়াবার জন্য পুলিস সেন্সর বোর্ড বিশেষ কিছু করতে পারবে না। মার্কিন মুল্লুকে তারা আপন হার মেনে নিয়েছে। বিশেষত সাহিত্যিকরাই যখন শ্লীল অশ্লীলে ঠিক কোথায় পার্থক্য সে জিনিসটা সংজ্ঞা এবং বর্ণনা দিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেননি।

সংস্কৃত আরবী ফার্সীতে নিছক অশ্লীল রচনা অতি অল্প। তার কারণ গুণীজ্ঞানীর রুচিবোধ ও সাধারণ জনের শুভবুদ্ধি ও কাণ্ডজ্ঞান-বোধ (কমন সেন্‌স)। নির্ভর করতে হবে প্রধানত এই দুটি জিনিসের উপর।

পাঠক হয়তো শুধোবেন, চ্যাটারলি বইখানা আমি পড়েছি কিনা? পড়েছি। যৌবনে প্যারিসের কাফেতে বসে পড়েছি। ভালো লাগেনি। লরেন্‌স্ যা প্রমাণ করতে চেয়েছেন সে অতি সাধারণ জিনিস। এবং ঐ অতি সাধারণ স্বতঃসিদ্ধ জিনিস প্রমাণ করতে গিয়ে তিনি দেগেছেন বিরাট বিরাট কামান। এবং কামানগুলো পরিষ্কার নয়।

আমরা মফস্বলের লোক। কলকাতা শহরে কি হয়, না হয়, আমাদের পক্ষে খবর রাখা সম্ভবপর নয়। বয়েসও হয়েছে ; ছেলে-ছোকরাদের মতিগতি, কর্ম-কারবারের সঠিক খবরও কানে এসে পৌঁছোয় না।

মাস কয়েক পূর্বে পূর্ব-পাকিস্তানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। সেখানকার এক কাগজে পড়লুম ইউয়েনেস্কো নাকি কিছু দিন পূর্বে পৃথিবীর বড় বড় শহরে মদ্যপান কোন্ বছরে বাড়ছে, তার একটা জরিপ নেন এবং ফলে একটি মারাত্মক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। সেটি এই :—পৃথিবীর বড় বড় শহরের যে কটাতে মদ্যপান ভয়ঙ্কররূপে (ইন্ অ্যান এলার্মিং ডিগ্রী) বেড়ে যাচ্ছে, কলকাতা তার মধ্যে প্রধান স্থান ধরেন।

বাঙালী সব দিক দিয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু অন্তত একটা দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুনে আমার উল্লাসবোধ করা উচিত ছিল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পারলুম না। ঢাকার এক আমওয়ালাকে যখন বলেছিলুম যে, তার আম বড় 'ছোডো ছোডো' তখন সে এক গাল হেসে দেমাক করে বলেছিল, 'কিন্তু, কত্তা, আডি (আঁঠি) গুলাইন্ বরো আছে!'[১] সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে যাবার আম ছোট, আর মদ্যপানের 'আডিডা' 'মোডা' এ-চিন্তাটা রসাল নয়—কোনো অর্থেই।

---

১ এর একটি ইংরিজি পাঠান্তর আছে। বিখ্যাত 'রম্য-রচনা' (বেল্-লেৎর্) লেখক চার্লস ল্যাম্ (এদের প্রধানত 'শেক্সপিয়ারের গল্প' প্রণেতা রূপে পরিচিত) প্রায়ই দফতরে দেরিতে পৌঁছতেন। একদা বড়বাবু তাঁকে হাতে-নাতে ধরে ফেলে বললেন, 'মিঃ ল্যাম্, আমার কাছে খবর পৌঁচেছে, আপনি আপিসে দেরিতে আসেন।' ল্যাম্ নাকি ঢাকার আমওলার মতই এক গাল হেসে বলেছিলেন, 'কিন্তু এ খবর কি পৌঁচেছে যে, আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাই?'

ফেরার মুখে কলকাতাতে ডেকে পাঠালুম দ্বিজেনকে। কলেজের ছোকরা—অর্থাৎ কলেজ যাওয়ার নাম করে কফি হৌস যায়—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ; শুনেছি এদের মাথায় পেরেক পুঁতলে ইস্ক্রু হয়ে বেরোয়—মগজে এ্যাসন প্যাঁচ! তদুপরি আমার শাগরেদ্!

তাকে আমার অধুনালব্ধ মাদকীয় জ্ঞানটুকু জানিয়ে বললুম, 'আমি তো জানতুম, ইণ্ডিয়া শনৈঃ শনৈঃ ড্রাই হয়ে যাচ্ছে—এ আবার কি নূতন কথা শুনি?'

গুরুকে জ্ঞানদান করতে পারলে শিষ্যমাত্রই পুলকানুভব করে—কাবেল, নাবালক যাই হোক না কেন। ক্ষণান্তরেও চিন্তা না করে বললে, 'মদ্যপান কলকাতাতে কারা বাড়াচ্ছে জানিনে, তবে একটা কথা ঠিক ঠিক বলতে পারি, কলেজের ছোকরাদের ভিতর ও জিনিসটা ভয়ঙ্কর বেড়ে যাচ্ছে; সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। 'ভয়ঙ্কর' 'ভীষণ' 'দারুণ' কথাগুলো আমরা না ভেবেই বলে থাকি, কিন্তু ইউয়েনেস্কো যখন 'এলার্মিং' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তখন সঠিক 'ভয়ঙ্করই' বলতে চেয়েছেন। দ্বিজেন সেটা কনফার্ম করলে। (কলেজের ছোকরারা আমার উপর সদয় থাকুন; এটা আমার মত নয়, দ্বিজেনের।')[২]

বললে, 'এবারে যে মধুপুরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি, তার কারণ আমি আপদেই মধুপুর যাইনি—যখন শুনলুম, ইয়াররা যাচ্ছেন বিয়ার পার্টি করতে সেখানে। ওদের চাপ ঠেকানো আমার পক্ষে অসম্ভব হত—এদিকে মায়ের পা ছুঁয়ে কিরে কেটেছি 'মদ খাব না।'

শ্রাদ্ধ তাহলে অনেকখানি গড়িয়েছে।

সে সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে দেখি, মেলাই কলেজের ছেলেমেয়ে এসেছে। আমার ভাতিজীর ইয়ারী-বক্সিনী, বন্ধুবান্ধব। মাঝে মধ্যে ওদের সঙ্গে বসলে ওরা খুশীই হয়।

২ বিখ্যাত সাহিত্যিক গজেন্দ্র মিত্রও এই মত পোষণ করেন কথাসাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭ পৃঃ ২৭৯, পশ্য।

ইচ্ছে করেই ফুর্তি-ফার্তির দিকে কথার নল চালালুম। চোর ধরা পড়লো। অর্থাৎ মদ্যপানের কথা উঠল।

সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছিল। একের অজ্ঞতা যে অন্যের জ্ঞান সঞ্চয়ের হেতু হতে পারে, সে-কথা এতদিন জানতুম না।

এক 'গুণী' হঠাৎ বলে উঠলো, 'বিয়ারে আবার নেশা হয়!'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বলিস্ কিরে? ইয়োরোপের শতকরা ৮৫ জন লোক যখন নেশা করতে চায়, তখন তো বিয়ারই খায়। ওয়াইন খায় কটা লোক, স্পিরিট—'

বাধা দিয়ে বললে, 'বিয়ারও তো ওয়াইন।'

আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'তওবা, তওবা! শুনলে গুনাহ হয়। ওয়াইনে কত পার্সেন্টেজ এলকহল, আর বিয়ারে কত পার্সেন্ট, স্পিরিটে—'

'এলকহল?'

'বাই উয়েইট অথবা ভল্যুম। দিশীটা—মানে ভদ্‌কার খুড়তুতো ভাই—তার হিসেব আণ্ডার প্রুফ, অভার প্রুফে। লিক্যোর—'

'মানে লিকার?'

আমি প্রায় বাক্যহারা। 'লিক্যোর তো আবিষ্কার করেছে প্রধানত ক্যাথলিক সাধুসন্ন্যাসীরা (মঙ্ক)। বেনিডিক্‌টিন—'

'সাধুসন্তরা আবিষ্কার করলেন মদ!'

*　　　　*

পূর্বেই বলেছি, সেদিন আমার বিস্তর জ্ঞানার্জন হয়েছিল। ওদের অজ্ঞতা থেকে।

তারো পূর্বে বলা উচিত ছিল যে, আমি মদ্যপানবিরোধী। তবে সরকার যে পদ্ধতিতে এগোচ্ছেন, তার সঙ্গে আমার মতের মিল হয় না। সে কথা আরেকদিন হবে।

ঔষধার্থে ডাক্তাররা কখনো কখনো মদ দিয়ে থাকেন। ব্র্যাণ্ডির চেয়েও শ্যাম্পেন গিলিয়ে দিলে ভিরমি কাটে তাড়াতাড়ি। কিন্তু

ব্র্যাণ্ডির চেয়ে শ্যাম্পেনে খরচ বেশী পড়ে বলে কন্টিনেন্টের ভালো ভালো নার্সিং হোম ছাড়া অন্য কোথাও বড় একটা ব্যবহার করা হয় না। কৃত্রিম ক্ষুধা উদ্রেকের জন্যও শেরি বা পোর্ট ব্যবহৃত হয়। এ সব ব্যাপার সম্বন্ধে আমার হাঁ, না, কিছু বলার নেই। তবে শীতের দেশে ব্র্যাণ্ডি না খেয়ে গুড়ের সঙ্গে কালো কফি খেলেও শরীর গরম হয়—এবং প্রতিক্রিয়াও কম। বহু ধর্মপ্রাণ হিন্দু এবং মুসলমান কবরেজ-হেকিমের আদেশ সত্ত্বেও সুরাপান করেননি—ভয়ঙ্কর একটা-কিছু ক্ষতি হতেও শুনিনি।

মোদ্দা কথায় ফেরা যাক্।

বিয়ারে নেশা হয় না, এর মত মারাত্মক ভুল আর কিছুই নেই। পূর্বেই বলেছি, ইয়োরোপে শতকরা ৮৫ জন লোক বিয়ার খেয়েই নেশা করে, মাতলামো করে।

'ওয়াইন' বলতে যদিও সাধারণত মাদক দ্রব্য বোঝায়, তবু এর আসল অর্থ, আঙুর পচিয়ে যে সুরা প্রস্তুত হয়, তারই নাম ওয়াইন। 'দ্রাক্ষাসব'-এর শব্দে শব্দে অনুবাদ (অবশ্য বাজারে যে-সব তথাকথিত 'দ্রাক্ষাসব' আছে, তার ভিতর কি বস্তু আছে আমার জানা নেই)।

বিয়ারে ৪ থেকে ৬ পারসেন্ট এলকহল থাকে—বাদবাকি প্রায় সবটাই জল। নেশা হয় এই এলকহলেই। ওয়াইনের পার্সেন্টেজ দশ থেকে পনেরো। তবু বিয়ার খেয়েই নেশা করে বেশী লোক। ওয়াইন খান গুণীরা—এবং ওয়াইন মানুষকে চিন্তাশীল ও অপেক্ষাকৃত বিমর্ষ করে তোলে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে ভালো ওয়াইন হয় ফ্রান্সে। বোর্দো (Bordeaux) অঞ্চলে তৈরি হাল্কা লাল রঙের এই ওয়াইনকে ইংরিজিতে বলা হয় ক্ল্যারেট। তাছাড়া আছে বার্গেণ্ডি, এবং শ্যাম্পেন অঞ্চলের বিখ্যাত ওয়াইন। এসব ওয়াইন আঙুর পচিয়ে ফার্মেন্ট করার সময় যদি কার্বন ডায়োক্সাইড বেরিয়ে না যেতে দেওয়া হয়, তবে সেটাকে 'সফেন' ওয়াইন (এফারভেসেন্ট) বলা হয়। বোর্দো

বার্গেণ্ডি বুজবুজ করে না—শ্যাম্পেন করে। শ্যাম্পেন খোলা মাত্রই তাই তার কর্ক লাফ দিয়ে ছাতে ওঠে, এবং তার বুদ্বুদ পেটের ইনটেসটিনাল ওয়ালে খোঁচা মারে বলে নেশা হয় তাড়াতাড়ি (ভিরমি কাটে ভড়িঘড়ি) এবং স্টিল (অর্থাৎ 'ফেনাহীন' ওয়াইনের মত কিছুটা বিমর্ষ বিমর্ষ সে তো করেই না, উল্টে চিত্তাকাশে উড়ুক্কু উড়ুক্কু ভাবটা হয় তাড়াতাড়ি।

জর্মনির বিখ্যাত ওয়াইন রাইন (ইংরিজিতে হক্) ও মোজেল। রাইন ওয়াইনের শ্যাম্পেনও হয় তবে তাকে বলা হয় জেক্ট্। শ্যাম্পেনের তুলনায় জেক্ট্ নিকৃষ্ট। অথচ এই জেক্ট্ ফ্রান্সে বেচে হের ফন্ রিবেনট্রপ প্রচুর পয়সা কামান। হিটলার নিজে মদ খেতেন না, কিন্তু যখন শুনলেন রিবেনট্রপ শ্যাম্পেনের দেশে ওচা জেক্ট্ বিক্রি করতে পেরেছেন, তখন বিমোহিত হয়ে বললেন, 'যে ব্যক্তি জেক্টের মত বদ্দি মাল ফ্রান্সে বেচতে পারে, সে পয়লা নম্বরী সেল্সম্যান। একে আমার চাই—এ আমার আইডিয়াজ ইংলণ্ডে বেচতে পারবে।' সবাই জানেন, ইনি পরে হিটলারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হয়েছিলেন ও সর্বশেষে ন্যুরনবের্গে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছিলেন।

হাঙ্গেরির বিখ্যাত ওয়াইন টকাই ও ইতালির কিয়ান্তি।

কাশ্মীরের আঙুর দিয়ে ভালো ওয়াইন হওয়ার কথা। তাই তৈরি করে চীন, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকায় চালান দেওয়ার আমি পক্ষপাতী। অবশ্য ওরা যদি কখনো ড্রাই হতে চায়, তবে অন্য কথা।

আপেল ফার্মেণ্ট করে হয় সাইডার, মধু ফার্মেণ্ট করে হয় মীড (সংস্কৃত 'মধু' থেকে মধ্বী, গ্রীকে মেথু মানে মদ, জর্মনে মেট্—সব শব্দই সংস্কৃত মধু থেকে)। আমের রস ফার্মেণ্ট করে মদ খেতেন বিখ্যাত কবি গালিব। আনারস ও কালোজাম পচিয়েও নাকি ভালো ওয়াইন হয়। সাঁওতাল, আদিবাসী ও বিস্তর পার্বত্য জাতি ভাত পচিয়ে বিয়ার বানিয়ে খায়; কিন্তু ফার্মেণ্ট করার ভালো কায়দা জানে

না বলে তিন সাড়ে তিনের চেয়ে বেশী এলকহল পচাইয়ে তুলতে পারে না। এদের সর্বস্ব, এদের জরু-গোরু এমন কি এদের সরল আত্মার পর্যন্ত সর্বনাশ করেছে ইংরেজ—চোলাই (ডেসটিল্ড্) 'ধান্যেশ্বরী' কালীমার্কা এদের মধ্যে চালু করে। এই 'ধান্যেশ্বরী' একেবারে সম্পূর্ণ বন্ধ না করা পর্যন্ত এদের উদ্ধার নেই। আমার কথা বিশ্বাস না হলে উড়িষ্যার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নবকৃষ্ণ চৌধুরীকে শুধোবেন। ইনি আদিবাসীদের জন্য বহু আত্মত্যাগ করেছেন এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত অনুগুল আশ্রমে আদিবাসীরাও শিক্ষালাভ করে। ইনিও আদিবাসীদের ড্রাই করতে চান; কিন্তু সরকার যেভাবে এগোচ্ছেন তার সঙ্গে তাঁর সঙ্গে একদম মতের মিল হয় না।

জাপানীদের সাকে মদ ভাতেরই পচাই, চীনাদের পচাই 'চু'-য়ে কিঞ্চিৎ ভুট্টা মেশানো থাকে।

ভারতবর্ষের তাড়ি (ফার্মেণ্টেড খেজুর কিংবা তালের রস) বস্তুটিকে ওয়াইন পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ মাদক দ্রব্যের ভিতর এই বস্তুটিই অনিষ্ট করে সব চেয়ে কম। একমাত্র এই জিনিসটাই সম্পূর্ণ বন্ধ করা উচিত কি না সে বিষয়ে আমার মনে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। তবে খাঁটি তাড়ি সচরাচর পাওয়া যায় না; লোভী শুঁড়িরা তাড়ির সঙ্গে দিশী চোলাই মদ (ধান্যেশ্বরী) মিশিয়ে তার এলকহল বাড়িয়ে বিক্রি করে। মাতালরাও সচরাচর নির্বোধ হয়।

* * *

এতক্ষণ পচাই অর্থাৎ ফার্মেণ্টেড বস্তু সম্বন্ধে বর্ণনা হচ্ছিল। এবারে ডেসটিল্ড বা চোলাই। চোলাই বস্তুর নাম স্পিরিট্স—যদিও শব্দটি সর্বপ্রকার মাদক দ্রব্যের জন্যও ব্যবহার হয়।

আঙুর পচিয়ে ওয়াইন বানিয়ে সেটাকে বকযন্ত্র দিয়ে চোলাই করলে হয় ব্র্যাণ্ডি—অর্থাৎ ব্র্যাণ্ড করা বা পোড়ানো হয়েছে। একমাত্র ফরাসী দেশের ব্র্যাণ্ডিকেই (তাও সব ব্র্যাণ্ডি নয়) বলা হয় কন্যাক্ (Cognac)। মল্ট-বার্লিকে পচিয়ে হয় বিয়ার; সেটাকে

চোলাই করলে হয় হুইস্কি। তাড়ি চোলাই করলে হয় এরেক (শব্দটা আসলে 'আরক' কিন্তু আরক অন্য অর্থেও ব্যবহৃত হয় বলেই এস্থলে 'এরেক' প্রয়োগ করা হল)। সেটাকে দুবার চোলাই করে খেতেন বদ্ধ মাতাল বাদশা জাহাঙ্গীর। এরেকে ষাট পার্সেণ্ট এলকহল হয়— ডবল ডেসটিল করলে আশী পর্যন্ত ওঠার কথা। সেইটে খেতেন নির্জলা! আখের রস ফার্মেণ্ট করার পর চোলাই করলে হয় 'রাম্'। সংস্কৃতে 'গৌড়ী'—গুড় থেকে হয় বলে। জামেকার রাম্ বিশ্ববিখ্যাত। কিন্তু ভারতীয় রাম্ যদি সযত্নে তৈরি করে চালান দেওয়া হয়, তবে জামেকাকে ঘায়েল করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। আমি ফরেন একসচেঞ্জ বাড়ানোর স্বপ্ন দেখি বলেই এই প্রস্তাবটি পাড়লুম। রামে এত লাভ যে তারই ফলে চিনির কারবারীরা চিনি সস্তা দরে দিতে পারে। জাভার চিনি একদা এই কারণেই সস্তা ছিল। জিন তৈরি হয় শস্য দিয়ে এবং পরে জেনিপার জামের সঙ্গে মেশানো হয়। খুশ-বাইটা ঐ জেনিপার থেকে আসে।

এসব চোলাই করা স্পিরিটসে ৩৫ থেকে আরম্ভ করে ৮০ ভাগ এলকহল থাকে। হুইস্কি ব্র্যাণ্ডির চেয়ে রামে এলকহল বেশী, তার চেয়ে বেশী ডবল-চোলাই এরেকে এবং সবচেয়ে বেশী আব্স্যাঁতে। তাই ওটাকে 'সবুজ শয়তান' বলা হয়। শুনেছি, ও জিনিস বছর তিনেক নিয়মিতভাবে খেলে মানুষ হয় পাগল হয়ে যায়, না হয় আত্মহত্যা করে, কিংবা ডেলিরিয়াম ট্রেমেনসে মারা যায়। ইয়োরোপের একাধিক দেশে এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে।[৩]

সচরাচর মানুষ এসব স্পিরিট্স নির্জলা খায় না। হুইস্কিতে যে পরিমাণ সোডা বা জল মেশানো হয় তাতে করে তার এলকহল ডাইলুটেড হয়ে শক্তি কমে যায়। ফলে এক গেলাস হুইস্কি-সোডাতে

---

৩ আব্স্যাঁতের শোচনীয় পরিণাম সম্বন্ধে একটি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর; নাম 'সবুজ শয়তান'। বসুমতী গ্রন্থাবলী।

যতখানি নেশা হয়, দু গেলাস বিয়ারে তাই হয়। অবশ্য নির্জলা হুইস্কি যতখানি খেয়ে স্বাস্থ্যের সর্বনাশ করা যায়, বিয়ারে প্রচুর জল আছে বলে ততখানি পেটে ধরে না বলে খাওয়া যায় না। তবে অবশ্য কেউ যদি অতি ধীরে ধীরে হুইস্কি খায় এবং অন্যজন সাত তাড়াতাড়ি বিয়ার খায় তবে দ্বিতীয় জনেরই নেশা হবে আগে।

অতএব বিয়ারে নেশা হয় না, এ বড় মারাত্মক ভুল ধারণা। ভুবন-বিখ্যাত ম্যুনিক-বিয়ারে তো আছে কুল্লে তিন, সাড়ে তিন পারসেণ্ট এলকহল। যারা রাস্তায় মাতলামো করে, তারা তো ঐ খেয়েই করে।[৪]

এদেশে আরেকটা বিপদ আছে। আঙুর সহজে পাওয়া যায় না বলে এদেশের অনেক ব্র্যাণ্ডিতেই আছে ডাইলুটেড এলকহল এবং তার সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে ব্র্যাণ্ডির সিনথেটিক সেণ্ট—অর্থাৎ আঙুরের রস এতে নেই। অনেক সরল লোক ফ্লু-সর্দি সারাবার জন্যে কিংবা দুর্বল রোগীর ক্ষুধা বাড়াবার জন্য এই 'ব্র্যাণ্ডি' খাইয়ে রোগীর ইষ্টের পরিবর্তে অনিষ্ট ডেকে আনেন। এ-বিষয়ে সকলেরই সাবধান হওয়া উচিত—বিশেষ করে যে সব লোক নিজে নিজের বা আত্মীয়-স্বজনের ডাক্তারী করেন।

ফ্রান্সে অত্যধিক মদ্যপান এমনি সমস্যাতে এসে দাঁড়িয়েছে যে, তার একটা প্রতিবিধান করা বড়ই প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। কিন্তু কেউই সাহস করে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারছেন না। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মাঁদেজ-ফ্রাঁস চেষ্টা করেছিলেন; অনেকে বলেন প্রধান-মন্ত্রিত্ব হারান তিনি প্রধানত এবং গুহ্যত এই কারণে। আমেরিকা ও নরওয়েও চেষ্টা করেছিল, সফল হয়নি। রাজা যদিও আইনের বাইরে তবু নরওয়ের রাজা একদিন দুঃখ করে বলেছিলেন, 'দেখা

৪ আশ্চর্যের বিষয়, ইয়োরোপের সব শহরের মধ্যে ম্যুনিকই সবচেয়ে বেশী দুধ খায়। আমাদের গড়াভড়ের মত।

যাচ্ছে, মদ না-খাওয়ার আইন একমাত্র আমিই মানি—আর সবাই তো শুনি বে-আইনী খেয়ে যাচ্ছে।

বৈদিক, বৌদ্ধ ও গুপ্তযুগে মাদক দ্রব্য সেবন করা হত ও জুয়াখেলার রেওয়াজ ছিল। আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস শঙ্করাচার্য যে নব-হিন্দু ধর্ম প্রচার করলেন সেই সময় থেকেই জনসাধারণে মদ্যপান ও জুয়াখেলা প্রায় বন্ধ হয়ে যায় (অবশ্য মুনিঋষিরা মাদক দ্রব্য ও ব্যসন বারণ করেছিলেন খৃষ্টের পূর্বেই) এবং পাঠান-মোগল যুগে রাজা-রাজড়া এবং উজীর-বাদশারাই প্রধানত মাদক দ্রব্য সেবন করেছেন। 'চরমে চরম মিশে' বলেই বোধ হয় অনুন্নত সম্প্রদায় ও আদিবাসীরাও খেয়েছে। ভারতবর্ষ কোন্ অবিশ্বাস্য অলৌকিক পদ্ধতিতে এদেশে একদা মদ জুয়া প্রায় নির্মূল করতে সক্ষম হয়েছিল সেটা আমি আবিষ্কার করতে পারিনি। পারলে আজ কাজে লাগানো যেত। ইংরেজ আমলে মদ্যপানের কিছুটা প্রচার হয়—মাইকেল ও শিশির ভাদুড়ী নীলকণ্ঠ হতে পারলে ভালো হত। ঐ সময় ব্রাহ্মসমাজ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গাঁধী যে জীবন ও আদর্শ সামনে ধরেন তার ফলে মদ্যপান প্রসার লাভ করতে পারেনি। শুনলুম, এখন নাকি কোনো কোনো তরুণ 'র‍্যাঁরো-র‍্যাঁবো ভেবেরেন' ভেরেরেন' করে এবং ওদের মত উত্তম (?) কবিতা না লিখে অন্য জিনিসটার সাধনায় সুখ পায় বেশী। ইতিমধ্যে কলকারখানা হওয়ার দরুন চা-বাগানে জুট মিলে মদ ভয়ঙ্কর মূর্তিতে দেখা দিল। মাঝিমাল্লারা অর্থাৎ সেলাররা মাতলামোর জন্য বিখ্যাত—কিন্তু আশ্চর্য, ভারতীয় ও পাকিস্তানী খালাসীরা মদ খায় না। আমাদের সৈন্যবাহিনীতে যেটুকু মদ্যপান হয় তাও তুচ্ছ। কলকাতার শিখেদের দেখে কেউ যেন না ভাবেন যে, দিল্লী-অমৃতসরের সম্ভ্রান্ত শিখরা মদ খান। ধর্মপ্রাণ শিখ মদ্যপানকে মুসলমানের চেয়েও বেশী ঘৃণা করেন ও বলেন, ইংরেজ শিখকে পল্টনে ঢুকিয়ে মদ খেতে শেখায়।

হিন্দু বৌদ্ধ জৈন ধর্ম ও ইসলামে মদ্যপান নিন্দিত—ইহুদী খৃস্টান

ও জরথুস্ত্রী ধর্মে পরিমিত মদ্যপানকে বরদাস্ত করা হয়েছে। এবং ঐ সব ধর্মের বহু প্রগতিশীল গুণী-জ্ঞানীরা অধুনা মদ্যপানবিরোধী।

মদ্যপান এখনো এদেশে কালমূর্তিতে দেখা দেয়নি, কিন্তু আগের থেকে সাবধান হওয়া ভালো। কিন্তু—পূর্বেই বলেছি—সরকার যে-ভাবে এগোচ্ছেন তার সঙ্গে আমার মত মেলে না। একটা উদাহরণ দি। কয়েক বৎসর পূর্বে দিল্লী শহরে পাব্লিক ড্রিংকিং, অর্থাৎ বার রেস্তোরাঁতে মদ খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হল। হুকুম হল, যারা খাবে তারা মদের দোকান থেকে পুরো বোতল কিনে নিয়ে অন্যত্র খাবে। অন্যত্র মানে কোথায়? স্পষ্টত বোঝা গেল বাড়িতে। কারণ পার্কে বা গাছতলায় বসে খাওয়াও বারণ। আমার প্রশ্ন, এটা কি ভালো হল? একদম বন্ধ করে দাও, সে কথা বুঝি; কিন্তু যে দেশে মদ খাওয়াটা নিন্দনীয় বলে ধরা হয়—বিশেষত মা-বোনেরা এর পাপ-স্পর্শের চিন্তাতেও শিউরে ওঠেন—সেখানে ঐ জিনিস বাড়ির ভিতর প্রবর্তন কি উত্তম প্রস্তাব? শুনেছি, দিল্লীতে একাধিক পরিবারে এই নিয়ে দাম্পত্য কলহ হয়েছে। খুবই স্বাভাবিক। এতদিন স্বামী বাইরে বাইরে খেয়ে বাড়ি ফিরতেন। ছেলেমেয়েরা অধিকাংশ স্থলেই কিছু জানতো না। এখন দাঁড়ালো অন্য পরিস্থিতি। ওদিকে ব্যাচেলারদের বৈঠকখানাতে যে হট্টগোল আরম্ভ হল তার প্রতিবাদ করতে প্রতিবাসীরা সাহস পেলেন অল্পই—মাতালকে ঘ্যাঁটোনো চাট্টিখানি কথা নয়।

দ্বিতীয়ত, যে ব্যক্তি বারে ঢুকে সামান্য একটু খেয়ে ক্লান্তি দূর করে বাড়িতে এসে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়তো, তাকে এখন কিনতে হল পুরো বোতল। প্রলোভনে পড়ে তার মাত্রা বেড়ে গিয়ে শেষটায় তার পক্ষে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাওয়াটা অসম্ভব নয়।

তৃতীয়ত—এবং এইটেই সবচেয়ে মারাত্মক—বাড়িতে বাপের মদ্যপান ছেলেমেয়েরা দেখবেই। অনুকরণটাও অস্বাভাবিক নয়। অর্থাৎ নূতন কনভার্ট করবার ব্যবস্থা করলুম।

শুনলুম, হালে নাকি কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের উপর চাপ দিয়েছেন যে পাবলিক ড্রিংকিং বন্ধ করো। উত্তরে নাকি পশ্চিমবঙ্গ সরকার উপরের কয়েকটি যুক্তি ব্যবহার করে আপত্তি জানিয়েছেন। ফল হবে বলে মনে হয় না, কারণ পূর্বেই বলেছি, কেন্দ্রীয় সরকারকে একাধিক বার এ-সব যুক্তি শোনানো হয়েছে।

* * *

মোদ্দা কথা এই :—

যে দেশে মদ্যপান নিন্দনীয়, যে দেশে মদ্যপান জনসাধারণে ব্যাপকভাবে প্রচলিত নয়, সেখানে মদ্যপান একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে, যদি—

যদি নূতন কনভার্ট না হয়, অর্থাৎ তরুণদের যদি মদ্যপানের কোনো সুযোগ, কুযোগ কোনো যোগাযোগ না দেওয়া হয়।

আমাদের সর্বপ্রচেষ্টা ঐ দিকে নিয়োজিত করা উচিত॥

পৌষ মেলা

হয়তো মেলাতে বসেই আপনি এ-লেখাটি পড়ছেন। না-হলে মেলাতে আসার সময় এখনো আছে। মোটরে আসতে পারেন, অবশ্য যদি পণ্ডিতজী দুর্গাপুর থেকে শান্তিনিকেতন মোটরে এসে থাকেন। তাঁর আসার সঙ্গে আপনার মোটরে আসার একটা অদৃশ্য সূক্ষ্ম কার্যকারণ সম্পর্ক আছে। তিনি মোটরে এলে অজয় নদের উপরে কজওয়েটি তৈরি হবে, বিকল্পে তিনি যদি হেলিকপ্টারে আসেন —এখানকার ফার্পো কালোর দোকানে সেই গুজোরব—তবে উড়িষ্যা ভাষায় 'আপনারো কপালো ভাঙিলো।' সাধে কি আর মাইকেল গেয়েছেন, 'রাজেন্দ্রসঙ্গমে দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে'—সে ব্যবস্থার পরিবর্তন এখনো হয়নি।

এসে কিন্তু কোনো লাভ নেই। কারণ 'জেলা বীরভূমের অন্তঃপাতী ডিস্ট্রিক্ট রেজেস্টারী বীরভূম সবরেজেস্টারী বোলপুর পরগণে সেনভূম তালুক সুপুরের অন্তর্গত হুদা বোলপুরে পত্তনীর ডৌল খারিজান মৌজে ভুবননগর' ইস্তেক—ভাববেন না, আমি সুকুমার রায়ের 'কাকালত নামা' থেকে চুরি করছি, ইটি পাবেন শান্তিনিকেতন ট্রেস্টডীডের পয়লা পাতায়, সেকথা পরে হবে—সিকিটি ফেলবার জায়গা নেই। কারো না কারো মাথায় আটকে যাবে, কিংবা স্ত্রীপুরুষের পদতাড়নে যে পুঞ্জীভূত ধূলিস্তর আকাশে-বাতাসে জমে উঠেছে, তারই একটিতে। অন্য মেলার তুলনায় এখানে মেয়েদের সংখ্যা কিছু নগণ্য নয়, অথচ ভাবতে অবাক লাগে, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে আশ্রমের মাস্টারদের গৃহিণী-কন্যারা যখন মেলা দেখার প্রথম অনুমতি পেলেন—শ্রীসদনের কল্পনাও তখন কেউ করতে পারেননি—তখন তাঁদের আনা হয়েছিল গোরুর গাড়িতে করে এবং তাঁরা মেলার প্রত্যন্ত প্রদেশ থেকে, গাড়িতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মেলা দেখেছিলেন।

এই মেলাটি বিশ্বভারতীর চেয়ে বয়েসে বড়। একথা বলতে হল বিশেষ করে, তার কারণ, যে-বেদীর উপর বসে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করতেন, সে-বেদীর পাশ দিয়ে যাবার সময় গেল মেলার সময় শুনি, এক গুণী আরেক গুণীকে বুঝিয়ে বলছেন, এই বেদীর নিচে রবীন্দ্রনাথের পূত-অস্থি প্রোথিত আছে! আশ্চর্যচিহ্ন দিলুম এহেন তত্ত্ব নিতান্তই আমার কল্পনার বাইরে বলে, কিন্তু আসলে আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়। আমাদের কেন্দ্রের এক মন্ত্রী বোম্বাই না কোথায় যেন রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রথম ইংরিজিতে রচনা লিখে বুঝতে পারলেন, মাতৃভাষা বাংলাতেই ফিরে যাওয়া উচিত।' গীতাঞ্জলি অনুবাদ করার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ইংরাজীতে বিশেষ কিছু লিখেছেন বলে জানতুম না; পরে চিন্তা করে বুঝলুম মন্ত্রীবর মাইকেল এবং রবীন্দ্রনাথে গুবলেট করে ফেলেছেন! (এবারে আশ্চর্যচিহ্ন যে তাগ-মাফিক লেগেছে সে-কথা হর ব্যাকরণবাগীশই কবুল করবেন।) 'শতবার্ষিকী' 'শত বার সিকি' ভেবে এঁরা যদি এখন পঁচিশ টাকা খর্চা করেন তবে আমি আর বিস্মিত হব না। 'পান্'টা আমার নয় —এটা স্বয়ং কবিগুরু করে গেছেন।

তা সে-কথা এখন থাক। যে গুণী শান্তিনিকেতন ছাতিম তলার অভিনব ব্যাখ্যা দিচ্ছিল তাকে শুধু মনে মনে বলেছিলুম, 'সাবধানে থাকিস, বাপ্। তোকে না শেষটায় কেন্দ্রের মন্ত্রী বানিয়ে দেয়।'

অতএব অতি সংক্ষেপে মেলাটির ইতিহাস বলি। এতে কোনো গবেষণা নেই।

১২৬৮ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী-যুগের বিখ্যাত লর্ড সিন্‌হা অব্ রায়পুর পরিবারে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন। রাইপুর জায়গাটি বোলপুর স্টেশনের কাছেই। মহর্ষিদেব একাধিকবার এই রাইপুরে আসা-যাওয়া করেন এবং গমনাগমনের সময় এ অঞ্চলের

উঁচু-নিচু খোয়াই-ডাঙার দিগন্ত-বিস্তৃত অর্ধ-মরুভূমিসদৃশ নির্জন ভূমির গাম্ভীর্য তাঁকে আকৃষ্ট করে। আশ্রম স্থাপনার আদিযুগের ঐতিহাসিক ও প্রথম 'আশ্রমধারী' স্বর্গত অঘোর চট্টোপাধ্যায় বলেন,

'রায়পুর যাতায়াত করিবার সময় এই দিগন্ত প্রসারিত প্রান্তরের অপূর্ব গাম্ভীর্যে মহর্ষির চিত্ত আকৃষ্ট হয়। এই বিশাল প্রান্তরে দৃষ্টি অবারিত, অনন্ত আকাশ ব্যতীত দিগ্বলয়ে আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। অনন্তস্বরূপের এই উদাত্ত সৌন্দর্যে তাঁহার হৃদয়মন প্লাবিত হইল, উন্মুক্ত আকাশতলে এই নির্জন প্রান্তর তপস্যার একান্ত অনুকূল বলিয়া তাঁহার ধারণা হইল।' (শান্তিনিকেতন আশ্রম, ১৩৩৫-১৩৩৬, পৃ: ১১)

চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমি যখন এখানে আসি তখনও ঐ দৃশ্য ছিল। এখন এত বেশী গাছপালা বাড়িঘর বাঁধ-বন লাগানো হয়েছে যে সে-দৃশ্যের কল্পনা করা কঠিন। তবে 'হে ভৈরব হে রুদ্র বৈশাখ' ইত্যাদি কবিতায় ও গ্রীষ্ম-বর্ষার বহুশত গানে রবীন্দ্রনাথ সে যুগের শান্তিনিকেতনের বর্ণনা রেখে গেছেন। আর প্রাচীনতম যুগের বর্ণনা আছে 'জীবনস্মৃতি'তে।

১৮ই ফাল্গুন, ১২৬৯ সনে মহর্ষি বর্তমানে যেখানে লাইব্রেরি, 'শান্তিনিকেতন বাড়ি', মন্দির (গ্রাম্য লোকের কাছে এখনও এ-জায়গা 'কাঁচ বাংলা' নামে পরিচিত) এই জায়গাটি, মোট কুড়ি বিঘা জমি বার্ষিক পাঁচ টাকা খাজনায় (!) মৌরসী পাট্টা নেন। ধ্যান-ধারণার জন্য মহর্ষি সর্বপ্রথম এখানে যে বাড়িটি তৈরি করেন সেটি মন্দিরের মুখোমুখি এবং 'শান্তিনিকেতন বাড়ি' নামে পরিচিত।

১২৯০ সনের পর মহর্ষিদেব আর কখনও শান্তিনিকেতন আসেননি।

২৬শে ফাল্গুন, ১২৯৪, সনে মহর্ষি শান্তিনিকেতনের বাড়ি-বাগান জমিজমা ধর্মচর্চা, বিদ্যালয় স্থাপন ও বাৎসরিক মেলা প্রবর্তনের জন্য ট্রাস্টডীড করে সর্ব-সাধারণের উদ্দেশে উৎসর্গ করেন।

৪ঠা কার্তিক, শুক্রবার, ১২৯৫, অপরাহ্ণে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্ব সমাধান হয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও স্বর্গত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় আচার্যের কর্ম করেন।

৯ই কার্তিক ১২৯৫ বুধবারে এখনও প্রচলিত প্রতি বুধবারের প্রথম উপাসনা করেন প্রথম আশ্রমধারী অঘোর চট্টোপাধ্যায়।

২২শে অগ্রহায়ণ ১২৯৭ সনে 'মন্দিরের ভিত্তিস্থাপনা করেন মহর্ষি-দেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র দার্শনিকপ্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়। উপাসনা করেছিলেন তিনি, তাঁর মধ্যম ভ্রাতা সতেন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেন এবং সঙ্গীত করেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ। একটি তাম্রফলকে তারিখ প্রভৃতি খোদিত ছিল। সেই ফলক, সেইদিনের 'স্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা, সেই মাসের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা,' পঞ্চরত্ন ও প্রচলিত মুদ্রা ভিত্তিমূলে প্রোথিত হয়। তাম্রফলকে ছিল,

"ও তৎসৎ। ঠক্কুর বংশাবতংসেন পরমহর্ষিণা শ্রীমতা দেবেন্দ্রনাথ শর্মণা ধর্মোপচয়ার্থং শান্তিনিকেতনে প্রতিষ্ঠার্পিতমিদং ব্রহ্ম মন্দিরং। শুভমস্তু ১৮১২ শক, ১৯৪৮ সম্বৎ, ৪৯৯১ কলাব্দ অগ্রহায়ণ ২২, রবিবাসর।' (পূর্বোল্লিখিত পুস্তকে জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃ.৯০)

৭ই পৌষ ১২৯৮ তারিখে দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠাপত্র পাঠ করে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

তৃতীয় বার্ষিক উৎসবে দরিদ্রদের অন্নদান।

চতুর্থ বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম আতশবাজি পোড়ান হয়।

পঞ্চম বার্ষিক উৎসবে সর্বপ্রথম মেলা ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা হয়।

অতএব ১৩০৩ সালে পৌষ-মেলার আরম্ভ।

১৩০৯ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা স্কুল স্থাপনা। ১৩২৫ সালে কলেজ বা বিশ্বভারতীর পত্তন। ১৩২৬ সালে গ্রীষ্মাবকাশের পর অধ্যাপনা আরম্ভ হয়। ১৩২৮/১৯২১-এ বিশ্বভারতীর (য়ুনিভার্সিটিরূপে) উদ্বোধন।

পূর্বে মহর্ষিদেবের যে ট্রাস্টডীডের উল্লেখ করেছি তাতে আছে :—

'ধর্মভাব উদ্দীপনের জন্য ট্রষ্টীগণ বর্ষে বর্ষে একটি মেলা বসাইবার উদ্যোগ করিবেন। এই মেলাতে সকল ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুপুরুষেরা আসিয়া ধর্মবিচার ও ধর্মালাপ করিতে পারিবেন। এই মেলার উৎসবে কোন প্রকার পৌত্তলিক আরাধনা হইবে না ও কুৎসিত আমোদ-উল্লাস হইতে পারিবে না, মদ্য মাংস ব্যতীত এই মেলায় সর্বপ্রকার দ্রব্যাদি খরিদ-বিক্রয় হইতে পারিবে।"

আমার মনে হয় এই মেলার সময় যদি বেশ-বিদেশের সর্ব ধর্মের গুণী-জ্ঞানী সাধক-পণ্ডিত সম্প্রদায়কে আমন্ত্রণ করে তিনদিনব্যাপী ধর্মালোচনা ধর্মসভার পত্তন (কংগ্রেস অব অল ফেৎস) হয়, তবে আমরা যুগধর্ম অনুসরণ করে মহর্ষিদেবের শুভেচ্ছা সফলতর করতে পারব ॥

মাভৈঃ !

বাঙালী সব দিক দিয়েই পিছিয়ে যাচ্ছে, এ রকম একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। কথাটা ঠিক কিনা, হলপ খেয়ে বলা কঠিন, কারণ দেশ-বিভাগের ফলে তার যে খানিকটে শক্তিক্ষয় হয়েছে সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না। পার্লামেণ্টে যদি আপনার সদস্য সংখ্যা কমে যায় তবে সব-কিছুই কাটতে হয় ধার দিয়ে—ভার দিয়ে কাটার সুযোগ আর মোটেই জোটে না।

দিল্লীতে থাকাকালীন আমি একটি বিষয় নিয়ে কিঞ্চিৎ চিন্তা করেছিলুম। কেন্দ্রে অর্থাৎ ইউ পি এস সি-তে বাঙালী যথেষ্ট চাকরি পাচ্ছে কি না ? ঐ অনুষ্ঠানের সদস্য না হয়েও যাঁরা এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাঁদের বিশ্বাস, বাঙালীর এতে যতখানি কৃতকার্য হওয়া উচিত ততখানি সে হচ্ছে না। একদা বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকে সেখানে ডাকা হয়েছিল ; আমি তখন চোখকান খোলা এবং খাড়া রেখে ব্যাপারটা বুঝতে চেষ্টা করেছিলুম।

দিল্লীতে এখন যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা বিলিতি কিংবা বিলিতি ঘঁ্যাসা পোশাক পরেন, ছুরিকাঁটা দিয়ে খাওয়া প্রচুর বাড়িতে চালু হয়েছে, ইংরিজি আদব-কায়দা, বিশেষ করে ইংরিজি এটিকেট এঁদের কাছে আর সম্পূর্ণ অজানা নয়।

ইউ পি এস সি-র তাবৎ মেম্বারই সায়েবীয়ানা পছন্দ করেন, এ-কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু যেখানে সে-আবহাওয়া বিদ্যমান, মানুষ ইচ্ছা-অনিচ্ছায় তার থেকেই প্রাণবায়ু গ্রহণ করে। তাই যদি বাঙালী ছেলের পোশাক ছিমছাম না হয়, চেয়ার টেনে বসার সময় সে যদি শব্দ করে, মোকামাফিক পার্ডন, থ্যাঙ্ক্যু না বলতে পারে এবং

সর্বক্ষণ ঘন ঘন পা দোলায় তবে সদস্যরা আপন অজান্তেই যে তার প্রতি কিঞ্চিৎ বিমুখ হয়ে ওঠেন সেটা কিছু আশ্চর্যজনক বস্তু নয়।

কিন্তু আসল বিপদ অন্যত্র। বাঙালী উমেদার ইংরিজিতে ভাব প্রকাশ করতে পারে না। পাঞ্জাবী, হিন্দী ভাষী কিংবা মারাঠী যে ইংরিজি বলে সেটা কিছু 'আমরি' 'আমরি' করবার মত নয়,—বিশেষত পাঞ্জাবী, হিন্দীভাষী ও সিন্ধীদের ইংরিজিজ্ঞান 'শিলিং-শকার' ও পেনি-হরার' থেকেই আহরিত। তা হোক, কিন্তু ঐসব বুঝে-না-বুঝেই যারা বেশী পড়ে তাদের কথাবলার অভ্যাস হয়ে যায় বেশী, অন্তত 'থ্যাঙ্ক্যু' 'পার্ডন', 'আই এম এফ্রেড' তারা ভাগমাফিক লাগিয়ে দিতে কসুর করে না।

এ স্থলে ইতিহাসের দিকে এক নজর তাকাতে হয়।

মুসলমান আগমনের পর থেকে ১৮৪০।৪২ পর্যন্ত বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণ তথা বৈদ্য সম্প্রদায়ের বিস্তর লোক সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা করেন, এবং মুসলমান ও কায়স্থরা ফার্সী (এবং কিঞ্চিৎ আরবীর) চর্চা করেন। এদেশের বড় বড় সরকারী চাকরি, যেমন সরকার (চীফ সেক্রেটারী) কানুনগো (লিগেল রিমেম্‌ব্রেন্‌সার) বখ্‌শী (একাউন্টেন্ট জেনারেল—পে মাস্টার) অর্থাৎ এডমিনস্ট্রেটিভ তাবং ডাঙর ডাঙর নোকরিই করেন কায়েস্থরা ; ইংরেজের আদেশে এঁরাই কলকাতাতে প্রথম ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন—বস্তুত ফার্সী তাঁদের মাতৃভাষা ছিল না বলে তাঁরা সেটা অনায়াসে ত্যাগ করে ইংরিজি আরম্ভ করে দিয়েছিলেন—এবং ফলে হাইকোর্টটি তাঁদের হাতে চলে যায়। ব্রাহ্মণরা আসেন পরে ; তাই তাঁরা পেলেন বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমান আসেন সর্বশেষে, তাঁর কপালে কিছুই জোটেনি।

তা সে যাই হোক্, আমরা বাঙালী প্রথমেই সাততাড়ি ইংরিজি শিখেছিলুম বলে বেহার উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এস্তক সিন্ধুদেশ পর্যন্ত আমরা ছড়িয়ে পড়ি।

এরপর অন্যান্য প্রদেশেও বিস্তর লোক ইংরিজি শিখতে আরম্ভ করেন। ক্রমেক্রমে আমাদের চাহিদা ও কদর কমতে লাগল, এসব কথা সকলেই জানেন, কিন্তু এর সঙ্গে আরেকটি তত্ত্ব বিশেষভাবে বিজড়িত এবং সেই তত্ত্বটির প্রতি আমি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

যে দুটি জাতীয় সঙ্গীত ভারতের সর্বত্র সম্মানিত সে দুটিই বাঙলা দেশেই রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রাম সর্বপ্রথম আরম্ভ হয় বাঙলা-দেশেই। এটা কিছু আকস্মিক যোগাযোগ নয়। এর কারণ বাঙালী আপন দেশ ভালোবাসে এবং সে বিদ্রোহী[১]। দেশকে ভালোবাসলে মানুষ তার ভাষাকেও ভালোবাসতে শেখে।

আশ্চর্য, ইংরিজি ভালো করে আসন জমাবার পূর্বেই বাঙলা দেশে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। (ঠিক সেই রকম ফার্সী যখন একদা আসন জমাতে যায়, তখন কবি সৈয়দ সুলতান আপত্তি জানিয়ে বলেছিলেন,

> 'আল্লায় বলিছে "মুই যে দেশে যে-ভাষ,
> সে-দেশে সে-ভাষে করলুম রসুল প্রকাশ।"
> যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
> ' সেই ভাষা তাহার অমূল্য সেই ধন॥')

এবং আরো আশ্চর্যের বিষয়, সে বিদ্রোহীদের কাণ্ডারী ছিলেন সে-যুগের সব-চেয়ে বড় ইংরিজি (ফরাসী, লাতিন, গ্রীক) ভাষার

১ 'বিদ্রোহী' আমি কথার কথারূপে বলছি না। বস্তুত বাঙালী যে বিদ্রোহী তার ইতিহাস এখনো লেখা হয়নি। (ক) দোয়ারের ব্রহ্মণ্যধর্ম তাকে অভিভূত করতে পারেনি, ফলে সে সংস্কৃত উচ্চারণ গ্রহণ করেনি; (খ) বৌদ্ধ জৈনের নিরামিষ সে গ্রহণ করেনি; (গ) মুসলমান আমলে বাঙলাদেশই সব চেয়ে বেশী লড়াই দিয়েছে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে ইত্যাদি বিস্তর বিষয়-বস্তু নিয়ে সে ইতিহাস লিখতে হবে।

সুপণ্ডিত ´মাইকেল। কাজেই যদিও সে উইলসেন, কেশবসেন ও ইষ্টিসেন এই তিন সেনের কাছে জাত দিয়ে ছুরি কাঁটা ধরতে শিখল (আজ যা দিল্লীতে বড়ই কদর পাচ্ছে) তবু সঙ্গে সঙ্গে ওর বিনাশের চাবাকে জল দিয়ে বাঁচাতে আরম্ভ করলো। এটাকে বাঙালীর স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। এ সময় সে গাছেরও খেয়েছে, তলারও কুড়িয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ই চোখে পড়ল, বাঙালী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরিজি বইয়ের আমদানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যে বকম কাতর হয়ে পড়েছিল এবারে সে সে-রকম হাঁসফাঁস করলো না। স্বরাজ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল. বাঙালী ইংরিজি ভাষা, আচার-ব্যবহার কায়দা-কেদা থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছে এবং ফলে দিল্লীতে আর কল্কে, সরি, সের্ভিয়েট—পায় না।

তর্ক করে, দলীল-দস্তাবেজ দিয়ে সপ্রমাণ করতে হলে ভূরি ভূরি লিখতে হবে। তা না হয় লিখলুম, কিন্তু পড়বে কে ? তাই সংক্ষেপে বলি,

পৃথিবীর সভ্যাসভ্য কোনো দেশই বিদেশী ভাষা দিয়ে বেশী দিন কা'রবার চালায় না। আজকের দিনে তো নয়ই। ´ফার্সী এদেশে ´ছ'শ বছর ধবে বাষ্ট্রভাষা ছিল—আমরা একে চিরন্তনী ভাষা বলে গ্রহণ করিনি।

তাই হিন্দী, গুজরাতী মারাঠীওলারাও একদিন ইংরেজি বর্জন করে আপন আপন মাতৃভাষায় কাজকারবার করতে গিয়ে দেখবেন, আমরা বাঙালীরা অনেক দূরে এগিয়ে গিয়েছি, মেঘে মেঘে বেলা হয়ে গিয়েছে—কারণ আমরা অনেক পূর্বে আরম্ভ করেছিলুম। তখন যখন কেন্দ্রে আপন আপন মাতৃভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে তখন আবার আমরা সেই যুগে ফিরে যাব, যখন একমাত্র বাঙালীই ইংরিজি জানত। হিন্দী কখনো ব্যাপকভাবে বাধ্যতামূলক হবে না, আর হলেও বাঙালীকে যেমন মাতৃভাষার উপর হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে

হবে, হিন্দীওলাকে হিন্দী ভিন্ন অন্য একটি ভাষায় পরীক্ষা দিতে হবে। অমাতৃভাষা অমাতৃভাষায় কাটাকুটি গিয়ে রইবে বাঙলা বনাম হিন্দী। তাই অবস্থা একই দাঁড়াবে—আমরা এগিয়ে যাব।

তাই মা ভৈঃ॥

দেহি দেহি

কিছুদিন পূর্বে আমার এক আত্মজন এসে আমাকে শুধাল, 'আপনার কি অত্যন্ত অর্থাভাব হয়েছে?'

আমি ইহুদীদের মত পাল্টা প্রশ্ন শুধালুম, 'কেন, তোমার কি অর্থ প্রাচুর্য হয়েছে? ধার দেবে?' সে ধনী, আমি জানি।

বললে, 'সিনেমার কাগজে যে লিখেছেন!'

আমি বললুম, 'আমার যতদূর জানা আছে, একমাত্র এই বাঙলা-দেশেই বহু সিনেমার কাগজ সাহিত্যিকদের কাছে লেখা চায়, এবং এমন কোনো শর্তও করে না যে সিনেমা সম্বন্ধেই লিখতে হবে। অন্যান্য দেশে সিনেমার কাগজ সাহিত্যের তোয়াক্কা তো করেই না, উল্টে ভালো ভালো সাহিত্যের কাগজ সিনেমা সম্বন্ধে লেখে। এ সম্মানটা আমাদের যতদিন দেখাচ্ছে ততদিন সেটা নেব না কেন?

দ্বিতীয়তঃ এই ধরো তোমার মনিহারী দোকানে আমরা পাঁচজন যাই, দর কষাকষি করিনে। ঐ সময়ে গাঁয়ের খদ্দেরও ভয়ে বেশী দরদস্তুর করে না। ফলে তোমার দোকানের টোন্ অন্য দোকানের চেয়ে ভালো হয়নি—বুকে হাত দিয়ে কও! অন্য দোকানে এখনো মেছো হাটার দরাদরি—ভুল বললুম—মেছো হাটেও এখন দর কষা-কষি বিস্তর কমে গেছে, যবে থেকে মধ্যবিত্তশ্রেণী চাকর না পাঠিয়ে নিজেরা বাজার যেতে আরম্ভ করেছে। ভালো সাহিত্যিকরা—আমার কথা বাদ দাও—যতদিন 'জলসা'তে লিখবে ততদিন তো সে কুরুচির প্রশ্রয় দিতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'কুন্তলীন' তেলের পুরস্কার পাবার জন্য

সেখানে কম্পীট করেছিলেন। তেলের ব্যবসার দোকান ও ফিল্মের কাগজে তফাতটা কি ?'

বাকিটা বলার পূর্বেই বাবাজী শুধালেন, 'আপনি কি রবীন্দ্রনাথ ?'

আমি তৈরি ছিলুম। 'বললুম, এর উত্তর আমি জানি, বাঙলা-দেশ জানে—তুমি বুঝি জানো না—?

সেই যে গল্প আছে ;—দুই বন্ধু রাস্তা দিয়ে যাবার সময় কুকুরের ঘেউঘেউ শুনে একজন ভয় পাওয়াতে অন্য জন সাহস দিয়ে বললে, 'ইংরিজি প্রবাদ জানিস,—"বার্কিং ডগ ডাজ নট বাইট"—যে কুকুর ঘেউঘেউ করে সে কামড়ায় না।' দ্বিতীয় জন বললে 'প্রবাদটা তুই জানিস, আমিও জানি। কিন্তু কুকুরটা কি জানে ?' আমি রবীন্দ্রনাথ নই সে কথা আমি জানি, আমার পাঠক সম্প্রদায়ও জানে—এখন প্রশ্ন তুমি জানো কি না ?'

বাধা দিয়ে বললে, 'কিন্তু—?'

আমি বললুম, 'মেলা ঘেউঘেউ ক'রো না। শোনো।

চতুর্থতঃ তুমি ফিলিম দেখতে যাও, আর আমি ফিলিমের কাগজে লিখতে পারবো না ?

পঞ্চমতঃ তুমি জানলে কি করে আমি 'জলসা'য় লিখেছি ? লোকমুখে ?'

ছেলেটি সত্যবাদী। বললে, 'না, নিজে পড়েছি।'

আমি বললুম, 'লাও ! তুমি যে কাগজ পড় আমি সেটাতে লিখব না ? তবে কি তুমি 'জলসা'তে অশ্লীল লেখার সন্ধানে গিয়ে আমার লেখা পড়ে হতাশ হয়েছ ? তবে কি ফিল্মের কাগজে শ্লীল লেখা, তথাকথিত উচ্চাঙ্গ গবেষণামূলক (কিংবা মডার্ন কবিতার উন্নাসিক) পত্রিকায় অশ্লীল লেখার চেয়ে ভালো ?'

'আপনি তো প্যারাডক্সে ফেললেন। সেই যে সোক্রাতিসের গল্প—'

আমি বললুম, 'কোন্‌টা ?'

এক গাল হেসে বললে, 'কেন ? আপনারই কাছ থেকে শোনা। নিরপরাধ সোক্রাতিসকে যখন বিষ খাইয়ে মারার সরকারী হুকুম হল তখন তার স্ত্রী ক্ষান্তিপে কেঁদে বলেছিলেন 'তুমি কোনো অপরাধ করোনি আর তোমার হল প্রাণদণ্ড।' সোক্রাতিস বললেন, 'তবে কি আমি অপরাধ করে মৃত্যুদণ্ড পেলে এর চেয়ে ভালো হত ?'

(পাঠক সম্প্রদায় আমার সূক্ষ্ম হাত-সাফাইটি লক্ষ্য করলেন কি ? ইদানীং আমার বদনাম হয়েছে যে, আমি একই কথা বার বার বলি। সেইটে পরের মুখে বলিয়ে অথচ নিজে শাবাশীটি কি কায়দায় নিলুম !)

তারপর বললুম, 'ষষ্ঠতঃ—থাক্‌গে। প্রথম কারণটাই যথেষ্ট। ন্যায়শাস্ত্রও তাই বলে, 'প্রথম কারণ যথেষ্ট হলে অন্য কারণে যাবে না।' সেই ইরানী গল্পটি শোনো নি ?

অনেক কালের কথা। ইরানে তখন ইংরেজের এমনই আধিপত্য যে, হুকুম ছিল ইরানের বৃহত্তম বন্দরেও যদি ইংরেজের ক্ষুদ্রতম মাল জাহাজ পৌঁছয় তবে তার সম্মানে কামান দাগতে হবে। এখন হয়েছে কি, ঘটনাক্রমে একটি ইরানী ছোকরা ফরাসী দেশে লেখা-পড়া সেরে এসে আপন দেশে ছোট্ট একটি বন্দরে প্রধান আপিসারের কর্ম পেয়েছে। ফরাসী দেশে সে আবার শিখে ফেলেছে মেলা বড় বড় কথা, 'সাম্য' 'মৈত্রী' স্বাধীনতা,' আরো বিস্তর যা তা। মাথা গরম।

প্রথম দিনেই সেই বন্দরে এসেছে এক বিরাট মানওয়ারী জাহাজ —ব্যাটল শিপ না কি যেন কয় ! ছোকরা কামান দাগলে না, পাড়ে গিয়ে জাহাজের অভ্যর্থনা জানালে না।

আধঘণ্টা যেতে না যেতেই তার দফতরে হুম্‌ হুম্‌ করে ঢুকলেন জাহাজের অ্যাডমিরাল না কি যেন চাঁই আপিসার। মুখ লাল, গোঁফ লাল, দাঁত পর্যন্ত লাল।

ইরানী ইয়াংম্যান্‌। অতএব অতিশয় ভদ্র। দাঁড়িয়ে উঠে

বিস্তর 'বঁ জুর,' ইত্যাদি জানালে। ইংরেজ শুধু চেঁচাচ্ছে "কামান দাগলে না কেন, ইউ, ইউ—ইত্যাদি।"

ছোকরা বললে, স্যার, "ইয়োর অনার, একসেলেন্সি, শান্ত হয়ে বসুন। কামান না দাগার বাইশটি কারণ ছিল। না বসলে বলি কি করে?"

ইংরেজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজেই কামান দাগার মত চেঁচিয়ে বল্লে, "বলে যাও বাইশটা কারণ।"

ছোকরা বললে, "প্রথম কারণ : বারুদ ছিল না।"

ইংরেজ ঝুপ করে চেয়ারে বসে পড়ে বললে, "ব্যস্! আর একুশটা কারণ বলতে হবে না। একটাই যথেষ্ট। বারুদ ছিল না, কামান দাগবে কি করে!"

তারপর বললুম, 'গল্পটা মনে রেখো। কাজে লাগবে। বিশেষ করে যখন তোমার হাতে থাকবে মাত্র একটি কারণ—বাইশটে নেই। সদম্ভে গল্পটি বলে এমনভাবে তাকাবে যেন তোমার হাতে আরো পঞ্চশত তর্কবাণ ছিল।'

বাবাজী গলায় এক ঢোক চা ফেলে এমনভাবে কোঁৎ করে গিললে যে, মনে হল আমার উপদেশটি ট্যাবলেটের মত সঙ্গে সঙ্গে পেট-তল করলে। তারপর শুধালে, 'আপনি ফিলমী কাগজে লেখেন অথচ ফিল্ম্ দেখতে যান না, তার কারণটা কি?'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে ভাবলুম। এ বিষয় নিয়ে এই যে আমি প্রথম ভাবলুম তা নয়। এবং এটা শুদ্ধমাত্র একলা আমারই ভাবনা, তাও নয়।

বাবাজী ফের বললে, 'দিশী ফিলমের স্ট্যাণ্ডার্ড বিদেশীর মত নয় বলে?'

এটার উত্তর আমি জানি। বললুম, 'কে বললে তোমায় বিদেশী ছবির মান উঁচু? বিদেশী ছবির ভালোগুলো আসে এ দেশে। ওদেশের নিজের কনজম্পশনের ছবি তো তুমি দেখনি। সেগুলো যে

কী রদ্দি তা তো তুমি জানো না। আর ওরা ভাবে আমাদের সব ছবিই সত্যজিৎ রায়ের তৈরি।'

'তা হলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, এ এক বিরাট সমস্যা। তার পুরো ধাক্কা এদেশে এখনো এসে লাগেনি। ইয়োরোপ আমেরিকার গুণীজ্ঞানীরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, পঁচিশ বৎসর পরের ঐতিহাসিকরা কি শেষটায় বলবে, সভ্য মানুষের পতন আরম্ভ হয়েছিল বিংশ শতাব্দীতে? এ যুগের সিনেমা, ট্র্যাশ নভেল, অশ্লীল সাহিত্য, বাচ্চাদের জন্য রগরগে খুন-ডাকাতির ছবির বই তো ছিলই —এখন এসে জুটেছে টেলিভিশন।'

'আইন করে বন্ধ করে দেয় না কেন?'

'আমেরিকাতে 'এমেরিকান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়ন' নামক একটি নাগরিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠান আছে। যখনই কোনো অশ্লীল পুস্তক বা ঐ জাতীয় কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে পুলিস মোকদ্দমা করে তখন ঐ প্রতিষ্ঠান এসে পুলিসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বলে 'পুলিস সাহিত্যিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে।' সরকার পক্ষের উকিল যখন পেত্যুত্তরে বলেন, 'এসব রাবিশ সাহিত্য নামের উপযুক্ত নয়', তখন অন্যপক্ষ বলে, 'সে হচ্ছে নিছক রুচির কথা।' বিপদ আরো এক জায়গায় রয়েছে। পুলিসপক্ষ এখনো এমন একটা সংজ্ঞা বের করতে পারেনি যা দিয়ে শ্লীল অশ্লীলের পরিষ্কার পার্থক্য করা যায়। এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে! সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রেও এ নিয়ে বিস্তর আলোচনার পর গুণীরা এক মত হয়ে বলতে পারেননি শ্লীল অশ্লীলে পার্থক্য করা যায় কি প্রকারে—বলেছেন আমাদের বাঘা পণ্ডিত গোঁসাইজী। ইয়োরোপ আমেরিকায় আবার আরেক বিপদ। যাঁরা ডাহা অশ্লীল জিনিসের সামান্যতম প্রতিবাদ জানান তাঁদের বিরুদ্ধে অমনি 'মার মার কাট কাট' অট্টরব জেগে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা গুটিকয়েক চোখাচোখা বাক্যবাণ শুনতে পান—'এরা প্রগতির শত্রু,

এরা আর্টের শত্রু, স্বাধীনতার শত্রু।' এ পক্ষে যে সবাই স্বার্থপর নীচ লোক রয়েছে তা নয়। ভালো ভালো ডাক্তারেরা বলেছেন, 'অশ্লীল সাহিত্য, খুনোখুনির ছবি ঐসব জিনিস তৃষ্ণার্ত জনের নৈতিক স্বাস্থ্য উন্নতি হয় তো নাও করতে পারে কিন্তু ঐ সব দেখেশুনে তাদের নৈতিক ব্যালান্‌স অনেকটা রক্ষা পায়।' তখন প্রশ্ন উঠবে, 'কিন্তু যারা ওসব জিনিস সম্বন্ধে তৃষ্ণার্ত নয় তাদের হাতে পড়লে?' উত্তরে এঁরা বলেন, 'তাদের যে কোনো ক্ষতি হয় সেটা তো কোনো সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কোনো কমিশন, কোনো তদন্ত করে সপ্রমাণ করতে পারেন নি।'

ফলে দাঁড়িয়েছে এই যে, আজ আমেরিকাতে অশ্লীল সাহিত্য বা ছবির বিরুদ্ধে কার্যত কোনো আইনই নেই। তাই সেদিন আমেরিকার এক বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন কয়েকটি অতি-আধুনিক ছাত্র (এদের বলা হয় 'পোস্‌ট-হাইব্রাও') একখানি অশ্লীল মাসিক বের করলে—অবশ্য তাদের মতে নয়, ভাইস চেন্সেলারের মতে—তখন কিছু না করতে পেরে ডাক বিভাগের শরণাপন্ন হলেন; তাদের পুরোনো ঝাঁপিতে একটি অতিপ্রাচীন রক্ষাকবচ আছে—'ডাক বিভাগ যদি মনে করেন কোনো চিঠি বা প্যাকেটে অশ্লীল বস্তু আছে তবে তাঁরা সেটি গ্রহণ করবেন না।' এই করে অন্তত কাগজটার প্রসার ঠেকানো গেল, প্রচার বন্ধ হল না।

'সর্বনাশ! তা হলে উপায়? এদেশেও তাই হবে নাকি?'

'তুমি ভবিষ্যতের ভয় পাচ্ছো, এদিকে অনেকেই যে মনে করেন আমাদের দিশী ছবি যথেষ্ট—অথবা যথা-অনিষ্ট—অশ্লীল হয়ে বসে আছে তাদের কথা ভাবছো না কেন? আমি আদপেই অস্বীকার করছিনে যে আমাদের অনেক ছবিতে অশ্লীলতার ইঙ্গিত থাকে। কিন্তু আমাদের মডার্ন গবিতায় কোনো কোনো কবি যে 'আর্টে'র নামে

অশ্লীলতার চরমে পৌঁছন তার বেলা কি? তোমার যদি মনে হয়, ফিল্‌ম ভেবেচিন্তে বাঁদর গড়ছে, গড়ুক। তোমার দেখবার ইচ্ছে নেই, না দেখলেই হল। কিন্তু কবিরা যে শিব গড়তে বাঁদর গড়ছেন যেখানে তুমি শিব দর্শনে গিয়ে পেলে বাঁদর—তার কি? তার তো কোনো সেনসর বোর্ড নেই। অথচ এরা তো রবীন্দ্রনাথ, রাজশেখর, সুকুমার রায়কে হটিয়ে দিতে পারেন নি। 'মনমোহন সিরীজে'র বিক্রি বেশী, না তারাশঙ্করের বেশী? আসলে শ্লীল হক অশ্লীল হক, যে বস্তু সত্য রসের (আর্টের) পর্যায়ে উঠে না সেটা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সংস্কৃত সাহিত্যে নিশ্চয়ই বিস্তর অশ্লীল বস্তু লেখা হয়েছিল—না হলে শ্লীল অশ্লীল নিয়ে আলঙ্কারিকেরা আলোচনা করলেন কেন? তাই আজ আশ্চর্য হই, সে সব অশ্লীল বই টিকে রইল না কেন?

তার অর্থ এই নয়, অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আপত্তি করার কোনো প্রয়োজন নেই—অবশ্য তোমার যদি মনে হয় ফিলিমগুলোর অনেকটাই অশ্লীল। আমি অন্য কথাগুলো বললুম, যাতে করে তুমি ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ না হও। গণতন্ত্র যখন করেছ তখন 'গণ-কলচর', 'গণ-সাহিত্য,' 'গণ-ফিল্‌ম্' হবেই হবে। তার জন্য তৈরি থাকা উচিত। কিন্তু গণতন্ত্রের তুমি আমি দুজনেই যখন 'গণ' তখন আমরাও আমাদের রুচি অনুযায়ী আমাদের যেখানে যেখানে বাধে সেখানে আপত্তি জানিয়ে যাব। আর সত্যজিৎ রায় তো আছেনই। তাঁর নীরব আপত্তিই তো সব চেয়ে জোরালো আপত্তি। আবার তিনিও যদি প্যুরিটানিজমের চূড়ান্তে পৌঁছে শুচিবায়ুগ্রস্ত হয়ে মানুষের অন্যতম ক্ষুধা—যে ক্ষুধাকে কবিরা যুগ যুগ ধরে সুন্দর মধুর রূপে প্রকাশ করেছেন—উপেক্ষা করেন, তবে তিনিও উপেক্ষিত হবেন। তার কারণ মানুষ অশ্লীলতা চায়, সে নয়। তার কারণ, কোনো জিনিসের চরমে পৌঁছলে সে জিনিস দিয়ে আর্ট হয় না।

তাই এক ফার্সী আলঙ্কারিক আর্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অন্যান্য

নানা মূল্যবান কথার ভিতর বলেছেন,—আর্ট='সনাখতন-ই-হদ্-ই-হর চীজ'। এর সব কটি কথাই বাঙলায় চলে। সনাখ্‌তন্=সনাক্ত করা, চেনা, জানা, হদ্=হদ্দ, সীমা; হর=প্রত্যেক, চীজ=বস্তু, চীজ। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সীমা কোন্ জায়গায় সেইটে বুঝে লেখাই আর্ট সৃষ্টি করা।'

*   *   *

বাবাজী চলে যাওয়ার পর অলস কৌতূহলে একখানা ফরাসী মাসিক হাতে তুললুম। নাম 'প্রাভ' অর্থাৎ 'প্রমাণ'—বাঙলায় এ মাসিক বের করতে হলে নাম হবে 'প্রামাণিক'। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে ইয়োরোপে যে 'কংগ্রেস ফর দি লিবার্টি অব্ কালচার' 'সংস্কৃতি স্বাধীনতা সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠিত হয়, তার দশম অধিবেশন হয় বার্লিনে, এই জুলাই মাসে। সে অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ দেন বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক, সমাজতত্ত্ববিদ দেনিস দ্য রুজমোঁ—'প্রাভে'র অগস্ট সংখ্যায় সেটি ছাপা হয়েছে। স্বাধীনতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ব্যাখ্যান দিতে গিয়ে দ্য রুজমোঁ বলেছেন :

এই যে আমরা প্রত্যেক জিনিসের 'চরমতম' চূড়ান্তে পৌঁছে গিয়ে এক জিনিস থেকে অন্য জিনিস আহাম্মুখের মত আলাদা আলাদা করে রাখছি—এক দিকে আর্টের সৌন্দর্যচর্চা অন্যদিকে দৈনন্দিন জীবনের শ্রীহীন আয়ুক্ষয়, এক দিকে কঠিন পরিশ্রম অন্য দিকে গভীর মানসিক চর্চা, এক দিকে বিমূর্ত সূক্ষ্ম জ্ঞানান্বেষণ অন্যদিকে টেকনিকেল ফলিত কর্ম,—এরা যে প্রতিদিন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে বিকৃত মুখভঙ্গী করছে, এর অবসান হোক।

এর প্রয়োজন পশ্চিম মহাদেশেই বেশী। কিন্তু এখন মহাদেশকে একত্র হয়ে তাদের আপন আপন সঞ্চয় বিশ্ববাসীর উপকারের জন্য তুলে ধরতে হবে :—

ইয়োরোপের চিন্তাবৃত্তিজাত ফল (যার থেকে টেকনিকেল কর্ম-বুদ্ধি বেরিয়েছে),

আফ্রিকার প্রাণশক্তি (যা সে বাঁচিয়ে রেখেছে, আর সকলের চেয়ে ভালো, তার সঙ্গীত, নৃত্য, ছন্দ, অনুভূতির কল্যাণে),

ভারতের আত্মা—যুগ যুগ ধরে সঞ্চিত তার ঐতিহ্যগত সম্পদ

আমার মস্তকে বজ্রাঘাত। ওদিকে ইয়োরোপ হাত পেতেছে আমাদের দিকে সর্বোত্তম সম্পদের জন্য—কে না জানে সর্বোত্তম সম্পদ আত্মার উপলব্ধি—আর এদিকে আমি মরছি আমেরিকার ভয়ে ।।

নিরলঙ্কার

একটি লোকের কাছে আমি নানা দিক দিয়ে কৃতজ্ঞ ছিলুম। মাসাধিক কাল আমি যখন টাইফয়েডে অজ্ঞান, সে তখন আমার সেবা করে বাঁচিয়ে তোলে। ভালো করেছে কি মন্দ করেছে, সে অবশ্য অন্য কথা। আর শুধু আমিই না, আমাদের পার্ক সার্কাস পাড়ার বিস্তর লোক তার কাছে নানান দিক দিয়ে ঋণী। মাঝারি রকমের পাস-টাস দিয়েছে—পরীক্ষার ঠিক আগে তার জোর চাহিদা। বেশ দু' পয়সা কামায়—ধার চাইতে হলে ও-ই ফাস্ট চইস। আর বললুম তো, রুগীর সেবায় ঝানু নার্সকে হার মানায়।

তার যে কেন হঠাৎ শখ গেল সাহিত্যিক হবার বোঝা কঠিন।

একটা ফার্স লিখেছে। তার বিষয়বস্তু: ধনী ব্যবসায়ী তাঁর ম্যানেজারের উপর ভার দিয়েছেন, কলেজ-পাস মেয়ের জন্য বিজ্ঞাপন দিয়ে ইণ্টারভ্যু নিয়ে বর বাছাই করতে। নাটকের আরম্ভ ইণ্টারভ্যু দিয়ে। কেউ 'কবি, কেউ 'গবিতা লিখে' গবি, কেউ 'ফিলিম স্টার— আরো কত কি।

পড়ে আমার কান্না পেল। দুই কারণে। অত্যন্ত প্রিয়জনের নিষ্ফল প্রচেষ্টা দেখলে যে রকম কান্না পায়, এবং দ্বিতীয়ত ঐ কথাটি ওকে বলি কি প্রকারে? ওটা কিছুই হয়নি, ওকে বলতে গেলে আমার মাথা কাটা যাবে। শেষটায় মাথা নিচু করে ঘাড় চুলকে বললুম 'বুঝলে, মামা, আমি ফার্স-টার্স বিশেষ পড়িনি, দেখিনি আদপেই অথচ এ-সব জিনিস স্টেজে দেখার এবং শোনার।'

মামা সদানন্দ পুরুষ। একগাল হেসে বললে, 'যা বলেছিস। আমি ঠিক তাই ভাবছিলুম।'

সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম।

ওমা, কোথায় কি। হঠাৎ পাড়ার চায়ের দোকানে শুনি মামার ফার্স ট্যাংরা না বেনেপুকুরে কোথায় যেন রিহার্সেল হচ্ছে। সর্বনাশ। বলি, 'ও চাটুয্যে, এখন উপায় ?'

সোমেন যদিও নিকষ্যি, তবু কথা কয় কলকাতার খাস বাসিন্দা বনেদি সোনার বেনেদের মত। অর্থাৎ আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে 'হুতোম' 'আলাল'কে আড়াই লেন্থ পিছনে ফেলে। দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত বের করে বললে, 'উপায় নদারদ্। দেখি নসিবে কি কি গর্দিশ আছে ?'

তারপর মামা একদিন ঝড়ের মত ঘরে ঢুকে ফার্স-অভিনয়ের লগ্ন র‍্যাঁদেভু বাৎলে গেলেন। ট্যাংরা, গোবরায় নয় ! রাজাবাজারের কোন এক গলির ভিতরে।

চাটুয্যের বাড়ি মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে। ওখানে কখনো যাইনি। ভাবলুম, সেদিন ওখানেই আশ্রয় নেব। মামা সময় পেলেও আমাকে খুঁজে পাবে না।

চাটুয্যে তো আমাকে দেখে অবাক। ব্যাপার শুনে বললে, 'তা আপনি চা পাঁপর খান আমাকে তো যেতেই হবে।' চাটুয্যে চাণক্যের সেই আইডিয়াল বান্ধব—রাজদ্বারে শ্মশানে ইত্যাদি। আর এটা যে মামার ফ্যুন্‌রেল্ সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দ ছিল না।

ঘণ্টা দুই দাঁত কিড়মিড়ি দিয়ে বার বার রাজাবাজারের দৃশ্যটা মনশ্চক্ষু থেকে তাড়াবার চেষ্টা করলুম। কিছুতেই কিছু হল না। কোথাকার কে এক কবি বলেছে, সদ্য লাঞ্ছিত জন যে রকম বার বার চেষ্টা করেও অপমানের কটুবাক্য মন থেকে সরাতে পারে না।

এমন সময় চাটুয্যে এক ঢাউস প্রাইভিট গাড়ি নিয়ে উপস্থিত। তার সর্বাঙ্গ থেকে উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। মুখে শুধু 'এলাহি ব্যাপার, পেল্লায় কাণ্ড।' বুঝলুম, মামাকে উদ্ধারের সৎকার্যে, কিংবা নিমতলার সৎকারে নিয়ে যেতে হবে। কিন্তু চাটুয্যে ঢাউস গাড়ি পেল কোথায়—পায় তো কুল্লে পঞ্চাশ টাকা, খাদী প্রতিষ্ঠানে।

গলির বাইরে থেকে শুনতে পেলুম তুমুল অট্টরব। বুঝলুম, গর্দিশ পেল্লায়।

ওমা, এ? কি কোথায় না দেখব, মানা লিন্‌চ্‌ট্ হচ্ছে—দেখি, হাজার দুই লোক হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে, হেথা হোথা কেউ কেউ পেটে খিল ধরেছে বলে ডান দিক চেপে ধরে কাতরাচ্ছে, আরেক দঙ্গল লোক হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে কাঁদছে। সে এক ম্যাস্ হিস্টিরিয়ার হাসির শেয়ার-বাজার কিংবা এবং রেসের মাঠ। ইস্তেক চাটুয্যে হেঁড়ে গলায় চেঁচাচ্ছে 'চাক্কু মারছে, চাক্কু মাইবা দিছে!'

ইতিমধ্যে ফার্স শেষ হয়েছে। মামাকে স্টেজে দাঁড় করানো হয়েছে। মামা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'এ সম্মান সম্পূর্ণ আমার প্রাপ্য নয়। বস্তুত সবটাই পাবেন, সুসাহিত্যিক আকাদেমি কর্তৃক সম্মানিত শ্রীযুত গজেন্দ্রশঙ্কর সান্যাল। একমাত্র তাঁরই পরামর্শে আমি এটা স্টেজ করি। পাড়ার আর সবাই বলছিল, এটা সাপ ব্যাঙ কিছুই হয়নি।'

বুঝতেই পারছেন, আমার নাম গজা সান্যাল। তখন আরেক ধুন্দুমার। আমার গলা জিরাফের মত হলেও অত মালার স্থান হত না। নিতান্ত রঙ্গদর্শী গৌরকিশোর সেখানে সেদিন উপস্থিত বুদ্ধি খাটিয়ে অমোকে সময় মত না সরালে, বঙ্গীয় পাঠকমণ্ডলী মল্লিখিত 'কলকাতার কাছেই কবির মহাপ্রস্থান,' বই থেকে বঞ্চিত হত।

বাড়ি ফেরার পরও আমার মাথা তাজ্জিম মাজ্জিম করছিল। নল ছেড়ে দিয়ে তলায় মাথা রেখে মনে মনে বললুম, 'অয়ি বাগেশ্বরী, তোমার সৃষ্টিরহস্য আমাকে একটু বুঝিয়ে বলোতো। মামার ঐ ফার্স পড়ে এ-পাড়ার সক্কলের তো কান্না পেয়েছিল। তবে কি পাড়ার মেধো ও-পাড়ার মধুসূদন?'

বিস্তর অলঙ্কারশাস্ত্র পড়ে আমার মনে একটা আত্মম্ভরিতা হয়েছিল, আমি বলতে পারি কোন্ রচনা রসোত্তীর্ণ হয়েছে, কোন্‌টা হয়নি। এখন দেখি ভুল!

ভারত, বামন, ক্রোচে, বের্গসোঁ, তাহা হোসেন, আবুসঈদ

আইয়ুব সবাইকে পরের দিন বস্তা বেঁধে শিশি-বোতলওলার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলুম।

আমি জানি, আমার পাঠকমণ্ডলী অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'তোমার যেমন বুদ্ধি! পার্ক সার্কাসের রদ্দি বই পেল রাজাবাজারের সম্মান। আর তুমি তাই করলে বামন ভামহকে প্রত্যাখ্যান! জৈসন্‌কে তৈসন্‌, শুঁটকিসে বৈগন—যার সঙ্গে যার মেলে—শুঁটকির সঙ্গে বেগুনই তো চলে। রাজাবাজার পার্ক সার্কাসে গলাগলি হবে না?'

কথাটা ঠিক। ফার্সীতেও বলে,

স্বজাতির সনে স্বজাতি উড়িবে মিলিত হয়ে
পায়রার সাথে পায়রা শিকরে শিকরে লয়ে?

The same with same shall take its flight,
The dove with dove and kite with kite.

কুনদ্‌ হম্‌-জিন্‌স্‌ ব্‌ হম্‌-জিন্‌স্‌ পরওয়াজ
কবুতর্‌ ব্‌ কবুতর্‌ বাজ্‌ ব্‌ বাজ্‌।

এসব অতিশয় খাঁটি কথা। কিন্তু প্রশ্ন, শেক্‌সপীয়র মলিয়েরের জনসাধারণের—রাজা-উজির গুণীজ্ঞানীর কথা হচ্ছে না—চিত্ত জয় করেছিলেন যে রস দিয়ে সেটি কি খুব উচ্চাঙ্গের রস? মাঝে মাঝে তো রীতিমত অশ্লীল। এবং শেক্‌সপীয়র যে আজও খাতির পাচ্ছেন তার কারণ জনসাধারণ তিনশ বছর ওঁর নাটক দেখতে চেয়ে চেয়ে ওগুলোকে বাঁচিয়ে রেখেছিল বলে। শুধুমাত্র গুণীজ্ঞানীর কদর পেলে ওঁর নাট্য আজ পাওয়া যেত লাইব্রেরির টপ শেল্‌ফে—সেটা উচ্চমান হলেও অপ্রয়োজনীয় বই-ই রাখা হয় সেখানে।

আরেকটা উদাহরণ দি: 'ওস্তাদ মরহুম ফৈয়াজ খানের শিষ্য শ্রীমান সন্তোষ রায়ের কাছে শোনা। রাস্তায় এক ভিখিরির গাঁইয়া গান শুনে ফৈয়াজ তাকে আদরযত্ন করে বাড়ি নিয়ে গিয়ে, তার সেই গাঁইয়া গানের এক অংশ শিখে নিয়ে তাকে 'গুরুদক্ষিণা' দিয়ে বিদায় দিলেন। কয়েক দিন পরে সেই টুকরোটি তাঁর অতিশয় উচ্চাঙ্গ

ওস্তাদী গানে বেমালুম জুড়ে দিয়ে বড় বড় ওস্তাদদের কাজে শাবাশী পেলেন—ওরকম ভয়ঙ্কর অরিজিনাল অলঙ্কার কেউ কখনো শোননি!

আরেকটি নিবেদন করি: মেজর জেনরল স্লীমান গেল শতাব্দীর গোড়ার দিকে এক রাত্রি কাটান দিল্লী থেকে মাইল দশেক দূরের এক গ্রামে। রাত্রে শোনেন ইঁদারা থেকে বলদ দিয়ে জল তোলার সময় এক চাষা অন্য চাষাকে মিষ্টি টানা সুরে 'হুঁশিয়ার', 'খবরদার', 'সবুর' বলছে। পরদিন সে কথা এক ভারতীয় কর্মচারীর সামনে উল্লেখ করাতে সে বলল, 'তানসেন মাঝে মাঝে এখানে এসে এসব সুর শিখে নিয়ে আপন সৃষ্টিতে জুড়ে দিতেন।'

মামার ফার্স টা চেয়ে নিয়ে আবার নূতন করে পড়লুম। নাঃ! আমি ফৈয়াজ নই, তানসেনও নই। এর কোনো বস্তুই আমার কোনো কাজে লাগে না। মামাকে দোষ দেওয়া বৃথা।

সমস্তটা ডাহা অন্‌রিয়েল, কোনো প্রকারের বাস্তবতা নেই কোনোখানে।

তখন মনে পড়লো ওস্কার ওয়াইল্‌ডের একটি গল্প। তিনি সেটি তাঁর সখা এবং শিষ্য আঁদ্রে জিদ্‌কে বলেছিলেন। তিনি সেটি ওয়াইল্‌ড সম্বন্ধে লেখা তাঁর 'ইন মেমোরিয়াম (সুভ্‌নীর)' পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। নিজের ভাষায় গল্পটা বলি—ও বই পাই কোথায়?

গ্রামের চাষাভূষোরা এক কবিকে খাওয়াতো পরাতো। কবির একমাত্র কাজ ছিল সন্ধ্যের পর আড্ডাতে বসে গল্প বলা। চাষারা শুধোতো 'কবি আজ কি দেখলে?' আর কবি সুন্দর সুন্দর গল্প শোনাতো। রোজ একই প্রশ্ন। একদিন যখন ঐ শুধোলে, তখন, কবি বললে, 'আজ যা দেখছি তা অপূর্ব। ঐ পাশের বনটাতে গিয়েছিলুম বেড়াতে। বেজায় গরম। গাছতলায় যখন জিরোচ্ছি তখন ওমা, কোথাও কিছু নেই, হঠাৎ দেখি, একটা গাছে ফোকর থেকে বেরিয়ে এল এক পরী। তারপর আরেকটি, তারপর আরেকটি, ক'রে ক'রে সাতটি। আর সর্বশেষে বেরুলেন রানী। মাথায় হীরের ফুলে

তৈরী মুকুট, পাখনা ছুটি চরকা-কাটা বুড়ীর সুতো দিয়ে তৈরী। হাতে সোনার বাঁশী! সাতটি পরীর চক্করের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাজাতে লাগল সেই সোনার বাঁশী। তারপর নাচতে নাচতে তারা এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। আমিও ঘাপটি মেরে পিছনে পিছনে। সেখানে গিয়ে এরা গান গেয়ে বাঁশী বাজিয়ে কাদের যেন ডাকলে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল সাত সমুদ্রকন্যা। সবুজ তাদের চুল—তাই আঁচড়াচ্ছে সোনার চিরুণী দিয়ে। সন্ধ্যা অবধি, ভাই, তাদের গান শুনলুম, নাচ দেখলুম—তারপর তারা চাঁদের আলোয় মিলিয়ে গেল।'

সবাই বললে, 'তোফা, খাসা, বেড়ে।'

কবি রোজই এ রকম গল্প বলে।

একদিন হয়েছে কি, কবি গিয়েছে ঐ বনে, আর সত্য সত্যই একটা গাছের ফোকর থেকে বেরলো সাতটি পরী, তারা নাচতে নাচতে গেল সমুদ্রপারে, সেখানে জল থেকে বেরিয়ে এল সমুদ্রকন্যা। কবি একদৃষ্টে দেখলে।

সেদিন সন্ধ্যায় চাষারা নিত্যিকার মতো শুধোলে, 'কবি, আজ কি দেখলে, বলো।'

কবি গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'কিচ্ছু দেখিনি।'

অর্থ সরল। যে বস্তু মৃন্ময়রূপে চোখের সামনে ধরা দিল, সেটাকে নিয়ে কবি করবে কি? কবির ভুবন তো চিন্ময়, কল্পনার রাজ্য। বাস্তবে যে জিনিস দেখা হয়ে গেল তার ঠাঁই কল্পনা রাজ্যে, কাব্যের জগতে আর কোথায়? চার চক্ষু মিলনের পর বধূকে আর কল্পনা কল্পনায় তিলোত্তমা বানিয়ে বেহশ্‌তের হুরী-পরীর শামিল করা যায় না।

প্রকৃতির বিরুদ্ধে ওয়াইল্‌ডের আরেকটি ফরিয়াদ, সৃষ্টিতে আছে শুধু একঘেয়েমি। প্রকৃতি বিস্তর মেহন্নৎ করে যদি একটি ফুল ফোটায় (রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'তত লক্ষ বরষের তপস্যার ফলে/ধরণীর তলে ফুটিয়াছে এ মাধবী/,) তবে বার বার তারই পুনরাবৃত্তি করে অপিচ

কবির সৃষ্টি নিরঙ্কুশ একক, সৃষ্টিকর্তারই মত একমেবাদ্বিতীয়ম্, এক জিনিস সে দুবার করে না, অন্যের নকল তো করেই না, নিজেরও কার্বনকপি হতে চায় না।

ওয়াইল্‌ডের বহুপূর্বে জর্মন কবি শিলার বলেছিলেন, 'প্রকৃতি প্রবেশ করা মাত্র কবি অন্তর্ধান করেন।'

আর রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে কি বলেছেন, সেকথা অন্যত্র বলার সুযোগ আমার হয়েছে। পুনরাবৃত্তির ভয় বাধ্য হয়ে বর্জন করে বলছি, তিনি প্রকৃতির সওগাৎ কদম ফুল দেখে বলেছেন, ওটা ঋতু-স্থায়ী, আর আমার সৃষ্টি অজরামর,

আজ এনে দিলে হয়তো দেবে না কাল
রিক্ত হবে যে তোমার ফুলের ডাল
এ গান আমার শ্রাবণে শ্রাবণে
তব বিস্মৃতি স্রোতের প্লাবনে
ফিরিয়া ফিরিয়া আসিবে তরণী
বহি তব সম্মান।

এ আবার কি রকমের সম্মান হল!

প্রকৃতিকে সব কবি হেনস্তা করার বর্ণন দেবার পর, আবার ক্ষণতরে ওয়াইল্‌ডে ফিরে যাই।

আচ্ছা মনে করুন, ওয়াইল্‌ডের সেই গ্রাম্য কবি যদি চাষাদের একদিন বলতো, 'আজ ভাই, আবার সেই বনে গিয়েছিলুম। দেখি গাছতলায় বসে এক পথিক তার সঙ্গীকে বলছে, সে তার পুরনো চাকরকে নিয়ে তীর্থ করতে যায়, সেখানে চাকরটা মারা যায়; তাই নিয়ে সে বিস্তর আপসা-আপসি করছিল।'

চাষারা নিশ্চয়ই ঠোঁট বেঁকিয়ে বলতো, 'এতে আবার বলার মত কি আছে—এ তো আকছারই হচ্ছে।'

কিন্তু মনে করুন, তখন যদি কবি, 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করতো? বিষয়বস্তু উভয় ক্ষেত্রে একই।

কবিতাটিতে যে অতি উত্তম রসসৃষ্টি হয়েছে সে সম্বন্ধে এ-যাবৎ কেউ কখনো সন্দেহ করেনি।

অথচ ওয়াইল্‌ড বর্ণিত কবির 'পরী-সিন্ধুবালা' অবাস্তব, 'পুরাতন ভৃত্যের' বিষয়বস্তু অতিশয় বাস্তব। 'পুরাতন ভৃত্য' মনে না ধরলে 'দেবতার গ্রাস' নিন। সেটা তো অতিশয় বাস্তব—আইন করে বন্ধ করতে হয়েছিল, পরীর নাচ বন্ধ করার জন্য আইন তৈরী হয় না।

তা হলে দাঁড়ালো এই, বাস্তব হোক, কাল্পনিক হোক—প্রাকৃত হোক, অতিপ্রাকৃত হোক—যে কোনো বিষয়বস্তু রসোত্তীর্ণ হতে পারে যদি—

এইখানেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। কি সে জিনিস, কি সে যাদুর কাঠি, কি সে ভানুমতীর মন্ত্র যার পরশ পেয়ে পুরাতন ভৃত্য বনের পরী কাব্যরসাঙ্গনে একই তালে, একই লয়ে চটুল নৃত্য আরম্ভ করে? কিংবা বাস্তবে না নেচেও কাব্যেতে নাচা হয়ে যায়? যথা—

জোন বললে,—'চ্যাটার্জি, এই আনন্দের দিনে তুমি অমন গ্লাম হয়ে ব'সে থেকো না, আমাদের নাচে যোগ দাও।'

বললুম,—'মাদার লক্ষ্মী, আমার কোমরে বাত। নাচতে কবি-রাজের বারণ আছে।'

(শুনুন কথা! পৃথিবীর উপরে—হাউ অন্ আর্থ—কবিরাজ কি করে কল্পনা করতে পারে যে, যাট বছরের বুড়া গাঁইয়া চাটুয্যের বলড্যান্সের অভ্যাস আছে; আগে-ভাগে বারণ করে দিতে হবে!)

'ভানুমতী' বলে ভালোই করেছি। ম্যাজিকের জোরেই শরৎকালে আম ফলানো যায়। দীপক গেয়ে আগুন ধরানো যায়, মল্লার গেয়ে বৃষ্টি নামানো যায়। কিন্তু সত্য সঙ্গীতজ্ঞ নাকি তাতে কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বলেন, 'এর চেয়ে ঢের বেশী সার্থক হবে সঙ্গীত যদি সদ্য-বিধবাকে সান্ত্বনা দিতে পারে, স্বাধিকারপ্রমত্তকে শান্ত করতে

পারে।[১] এবং কিছু না করেও যে সার্থক সঙ্গীত হতে পারে সে তো জানা কথা।

আর্টে এই ম্যাজিক জিনিসটির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ :—

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা
ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
সাতটি যেন পোষা পাখি।
শাণিত তরবারি গলাটি যেন,
নাচিয়া ফিরে দশদিকে,
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
বিজুলি হেন ঝিকমিকে।
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল
আপনি কাটি দেয় তাহা।
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,
সঘনে বলে, বাহা বাহা॥

---

১ ধর্মজগতেও এই ম্যাজিকের বড় সম্মান। সাধু সম্বন্ধে যদি গ্রামে রটে তিনি লোহাকে সোনা করতে পারেন, তবে এবিষয়ে নির্লোভজনও তার কাছে ধর্মোপদেশ চায়—যেন যে ম্যাজিক দেখায়, সে বুঝি ধর্মও বোঝে। রাজা রামমোহনের সঙ্গে খৃষ্টানদের ঐ নিয়ে বেধেছিল। তিনি খৃষ্টের অলৌকিক কর্মে (জলকে মদে পরিবর্তন করা ইত্যাদি) বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের ভিতর দুই দল আছেন। একদল বলেন, হজরৎ মুহম্মদ অলৌকিক কর্ম দেখাতে রাজী হতেন না; বলতেন 'আমি যা বলেছি সেইটা সত্য না মিথ্যা যাচাই করে নাও।' কোনো এক সাধু নাকি ত্রিশ বৎসর সাধনার পর পায়ে হেঁটে নদী পেরোতে পারতেন। তাই শুনে কবীর বলেছিলেন, 'এক পয়সা দিয়ে যখন খেয়া পার হওয়া যায় তখন ঐ মূর্খের ত্রিশ বৎসরের সাধনার দাম তো এক পয়সা।'

রস বিচারেও বলা যেতে পারে, একটি কাঠি দিয়েই যখন সব কটা প্রদীপ জ্বালানো যায়, তখন ওর জন্তে সঙ্গীতে ত্রিশ বৎসর সাধনা করার কি প্রয়োজন?

এখানে বিশেষ করে লক্ষ্য করবার জিনিস, সভার লোকে 'বাহা বাহা' বলছে, কেউ কিন্তু 'আহা আহা' বলেনি।

পার্থক্যটা কোথায়?

দড়ির উপর নাচ দেখে বলি 'বাঃ', জাদুকর যখন চিরতনের টেক্কাকে ইস্কাপনের ছুরি বানায় তখন বলি 'বা রে—' কাশীনাথ যখন গানের টেকনিকাল স্কিল (ম্যাজিক) দেখায় তখন বলি, 'বাঃ,' কিন্তু যখন কবি গান,

'তোমার চরণে আমার পরানে,
লাগিল প্রেমের ফাঁসি—'

তখন মনে হয়, যেন আমারই বিরহতপস্যা শ্রান্ত ভালে প্রিয়া তাঁর আপন কণ্ঠের যুথীরমালে আমার সর্ব দহনদাহ ঘুচিয়ে দিলেন। চরম পরিতৃপ্তিতে হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে বেরিয়ে আসে, 'আ—আ—হ।'

আশ্চর্য হলে বলি 'বাঃ,' পরিতৃপ্ত হলে আহ্'। ম্যাজিক 'বাব্বাবাব্বা' আর্টে 'আহাহা!'

'হাঁ'-কে 'না' করা, 'না'-কে 'হাঁ' করা কঠিন নয়, কিন্তু উভয়কে মধুরতর করাই আর্ট, সেইটি কঠিন, ঐটেই আলঙ্কারিকদের ওয়াটারলু। এবং সবচেয়ে কঠিন, মধুরকে মধুরতর করা। ফুল তো সুন্দর, তাকে সুন্দরতর করা যায় কি করে। স্বয়ং খৃষ্ট বলেছেন, 'লিলিফুলকে তুলি দিয়ে রং মাখায় কে?'

অথচ জাপানী শ্রমণ রিয়োকোয়ান রচলেন—

কি মধুর দেখি রেশমের গাছে
ফুটিয়াছে ফুলগুলি
কোমল পেলব করিল তাদের
ভোরের কুয়াশা তুলি।

কি সে ভোরের কুয়াশা তুলি যা সব-কিছুকে মধুর মেদুর, কোমল পেলব করে দেয়?

দৃষ্টান্ত দেই :—

প্রাচ্য ভূখণ্ড হইতে পবন আসিয়া আমাকে দোদুল্যমান করাতে আমি মুগ্ধ হইয়া 'আমরি, আ মরি' বলিতেছি—

কবির তুলির পরশ পেয়ে হয়ে যায় ; 'পূব হাওয়াতে দেয় দোলা মরি মরি'—

আমি বললুম, সব বনে ছায়া ক্রমে ক্রমে ঘন হইতে ঘনতর হইতেছে—

কবির তুলি লাগাতে হল, 'ছায়া ঘনাইছে বনে বনে।'

কিংবা আমি বললুম, শুক্লপক্ষের পঞ্চদশী রাত্রে পথ দিয়া যাইবার সময় যখন চন্দ্রোদয় হইয়াছে, তখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল ; তাহাকে কি শুভলগ্ন বলিব, জানি না।

'যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে।
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে
কী জানি কী মহা লগনে।'

পাঠক হয় তো বলবেন, 'তুমি বলেছ গদ্যে, সে যেন পায়ে চলা ; আর কবি বলেছেন ছন্দে সে যেন নাচা।'

উত্তম প্রস্তাব। ছন্দে বলি,

পথিমধ্যে তোমার সঙ্গে
পূর্ণিমাতে দেখা
বলবো একে মহা লগন
ছিল ভালো লেখা।

কবিতা হল, কিন্তু রসসৃষ্টি হল না।

আর নিখুঁত, নিটোল ছন্দ মিল হলেই যদি কবিতা হয় তবে নিচের কবিতাটির নোবেল প্রাইজ পাওয়ার কথায় :—

হর প্রতি প্রিয় ভাষে কন হৈমবতী
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি !

কোন গ্রহ রাজা হৈল কেবা মন্ত্রিবর
প্রকাশ করিয়া তাহা কহ দিগম্বর।

অলঙ্কারের দিক দিয়ে কবিতাটি দিগম্বরই বটে।

এই যে তুলি সব-কিছু মধুময় করে তোলে, কি দিয়ে এ বস্তু তৈরী, কি করে এর ব্যবহার শিখতে হয়? এ কি সম্পূর্ণ বিধিদত্ত না পরিশ্রম করে এর খানিকটে আয়ত্ত করা যায়?

ঘটিতে টোল দেখলে চট করে পাই, কিন্তু নিটোল ঘটি বানাই কি করে?

আর এই তো সেই তুলি সে যখন আপন মনে চলে তখন সে গীতিকাব্য—লিরিক—'মেঘদূত'। যখন ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত চরিত্রের ক্রমবিকাশের উপর এর ছোঁয়া লাগে সে তখন কাব্য—'রঘুবংশ।' যখন ধর্মকে ছুঁয়ে যায় সে তখন 'গীতা', 'কুরান', 'বাইবেল।'

আচার্য তেজেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ গত হলে বোম্বায়ে তাঁর স্মরণে সম্মিলিত এক শোক-সভায় শুনতে পাই, আসুন আমরা রবীন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুতে—'!

সেই সর্বব্যাপী শোকের মাঝখানে ঐ 'অকালমৃত্যু' কথাটি শুনে কারো কারো অধরপ্রান্তে ম্লান হাসির সামান্যতম রেখাটি ফুটে উঠেছিল। সকলেই বোধহয় ভেবেছিলেন, আশীতে পরলোকগমন ঠিক অকালমৃত্যু নয়!

আমি কিন্তু সচেতন হলুম—সত্যই তো, যদিও মহিলাটি হয়তো চিন্তা করে অকালমৃত্যু বাক্যটি ব্যবহার করেন নি, কথাটি অতিশয় সত্য। যে-কবি প্রতিদিন নিত্য নবীনের সন্ধানে তরুণের ন্যায় উদ্‌গ্রীব, তাকে নব নব রূপে-রসে পরিবেশন করার সময় যাঁর লেখনীতে নবীন অভিজ্ঞতা ও প্রাচীন প্রকাশ-দক্ষতা সমন্বিত হয়, চৈতন্যহীন হওয়ার কয়েক দণ্ড পূর্বেও যিনি অধ্যাত্মলোকে এক নবীন জ্যোতির সন্ধান পেয়ে সে-জ্যোতি কখনো ছন্দ মেনে, কখনো মিল না মেনে তারই উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করার সময় কঠিন রোগপীড়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন, যিনি আরো দীর্ঘ সুদীর্ঘকাল অবধি আরো নবীন নবীন অভিজ্ঞতার জন্য প্রস্তুত—আশী কেন দুই শতেও তাঁর লেখনী স্তব্ধ হলে সে মৃত্যু অকালমৃত্যু। পক্ষান্তরে সাহিত্যের ইতিহাসে এমন বহু কবির উল্লেখ পাই, যাঁদের সৃষ্টিসত্তার মৃত্যু হয়েছে চল্লিশে—দেহত্যাগ যদিও তাঁরা করেছেন নব্বইয়ে।

আচার্য তেজেশচন্দ্রের দেহত্যাগ একাত্তরে হয়েও সেটা অকাল দেহত্যাগ। তিনি রবীন্দ্রনাথের ন্যায় বিধিদত্ত অদ্ভুত ক্ষমতা নিয়ে জন্মাননি, কিন্তু এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না, সৃষ্টিকর্তা এই সংসার রঙ্গমঞ্চে যে পার্টে তাঁকে পাঠিয়েছিলেন, সেটি তিনি প্রতিদিন

অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে উদ্‌যাপন করার পর প্রতি রাত্রে প্রস্তুত হতেন, আগামী প্রাতে সেই অভিনয় সর্বাঙ্গসুন্দর করার জন্য।

তেজেশচন্দ্রের সহকর্মী মৌলানা জিয়াউদ্দিনের স্মরণে উভয়ের গুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,—

কারো কবিত্ব, কারো বীরত্ব,
কারো অর্থের খ্যাতি—
কেহ-বা প্রজার সুহৃদ্‌ সহায়
কেহ-বা রাজার জ্ঞাতি—

এবং তারপর সামান্য একটু পরিবর্তন করে কবির ভাষাতেই তেজেশচন্দ্রের উদ্দেশে বলি,—

তুমি আপনার শিষ্যজনের
প্রশ্নেতে দিতে সাড়া,
ফুরাতে ফুরাতে রবে তবু তাহা
সকল খ্যাতির বাড়া

বাস্তবিক এই একটি লোক তেজেশচন্দ্র, যাঁকে স্বভাব-কবির মত স্বভাব গুরু বা জন্ম-গুরু বলা যেতে পারে। সত্তরেও তাঁর মৃত্যু অকালমৃত্যু।

পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ষোল-সতের বৎসর বয়সে তিনি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়ে আসেন। আশ্রম স্থবিররা কেউই ঠিক বলতে পারেন না, তিনি এখানে গুরুরূপে না শিষ্যরূপে এসেছিলেন। তবে এ-কথা সত্য, অল্পদিনের ভিতরই তিনি শিক্ষকতা আরম্ভ করে দেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, ষোল বৎসরের বালক জানেই বা কি—কটা পাশ দিয়েছে, সেটা না-হয় বাদই দেওয়া গেল—পড়াবেই বা কি?

এ-প্রথা এদেশে অপ্রচলিত নয়। গুরুগৃহে বিদ্যাসঞ্চয় করার সময় কনিষ্ঠকে বিদ্যাদান করার প্রথা এদেশে আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। গ্রামের পাঠশালাতে এখনো 'সর্দার পড়ুয়া' নিচের শ্রেণীতে পড়ায়।

তারপর তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেছেন। এত দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যাপনা নাকি পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

শুনেছি, শান্তিনিকেতন বিহঙ্গশাবক যখন একদিন পক্ষবিস্তার করে মহানগরীর আকাশের দিকে তাকালে—অর্থাৎ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করতে চাইলে—তখন তেজেশচন্দ্র নাকি কুণ্ঠিতস্বরে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, 'আমি তাহলে প্রাইভেট পরীক্ষা দিয়ে পাসটাসগুলো করি।' রবীন্দ্রনাথ নাকি হেসে বলেছিলেন, 'ওসব তোমাকে করতে হবে না।'

কিন্তু এই পঞ্চাশ বৎসরের স্বাধ্যায়লব্ধ বিষয়বস্তু কি?

সঙ্গীতে তাঁর বিধিদত্ত প্রতিভা ছিল। তিনি বেহালা বাজাতে পারতেন। ওদিকে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিলাতিবাদ্যযন্ত্র বর্জন করেছিলেন। একমাত্র তেজেশচন্দ্রকেই দেখেছি রবীন্দ্রনাথের সামনে যখন দিনেন্দ্রনাথ বর্ষামঙ্গল বসন্তোৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের সমবেত সঙ্গীত পরিচালনা করতেন, তখন তেজেশচন্দ্র বেহালা বাজাতেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের স্বরলিপি, গায়নপদ্ধতি গায়কী ঘরানা নিয়ে কিছুদিন ধরে যে ভূতের নৃত্য আরম্ভ হয়েছে, তার ভিতরে তিনিই ছিলেন বিজ্ঞ রবীন্দ্র-সঙ্গীতসুরজ্ঞ। তাঁর নাম কেউ করেননি—তিনিও তৃপ্তির নিশ্বাস ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

সাহিত্যে তাঁর প্রচুর রসবোধ ছিল। ১৯১৯-২০ সালে যখন শান্তিনিকেতনে ফরাসী ভাষা শিক্ষার সূত্রপাত হয় তখন তিনি অগ্রণী হয়ে, ফরাসী শিখে আনাতোল ফ্রাঁসের রচনা বাঙলায় অনুবাদ করেন ও তখনকার 'শান্তিনিকেতন' মাসিক পত্রিকায় পর পর প্রবন্ধ লেখেন। সুদূর শ্রীহট্টে বসে সেগুলো পড়ে আমি বড়ই উপকৃত হই। এই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম চিন্ময় এবং বাঙ্ময় পরিচয়।

শান্তিনিকেতন প্রধানত সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য, চিত্রকলার পীঠভূমি। কিন্তু, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে একাধিকবার ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন যে তিনি অর্থাভাবে এখানে সামান্যতম লেবরেটরি নির্মাণ

করে বিজ্ঞানচর্চার কোনো ব্যবস্থা করতে পারেননি। তাঁর সে শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত করেছিলেন, জগদানন্দ রায় ও তেজেশচন্দ্র সেন। বিজ্ঞানাগার ছাড়াও কোনো কোনো বিজ্ঞান অন্তত কিছুটা শেখা যায়। উদ্ভিদবিদ্যা ও বিহঙ্গজ্ঞান। আর একাধিক সম্পূর্ণ বিজ্ঞান তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, কিন্তু ঐসব বিষয়ে আমার কণামাত্র সঞ্চয় নেই বলে, তেজেশচন্দ্রের প্রতি অবিচার করার ভয়ে নিরস্ত হতে হল।

এই সব জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করার সময় তেজেশচন্দ্রের সম্মুখে অহরহ থাকতো তাঁর ছাত্রসমাজ। সাধকমাত্রই চার সর্বাঙ্গ অমূর্ত জ্ঞানের সন্ধান করেন—তেজেশচন্দ্রও তাই করতেন—কিন্তু তিনি বারবার সেই ছাত্রসমাজকে স্মরণ করে তাদের যা দরকার, তার বাইরে সহজে যেতে চাইতেন না। তিনি তাঁর জীবনসাধনা দিয়ে প্রমাণ করেছেন, মানুষের শক্তি অসীম নয়, ছাত্রসেবাই যদি করতে হয়, তবে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে অন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করবে।

তাঁর বহু শিষ্যই জানতো, তিনি বিজ্ঞানের গভীর থেকে মুক্তা আহরণ করে তাদের সামনে ধরেছেন—পরবর্তীকালে ভালো ভালো বিজ্ঞানাগার থেকে এম এস-সি পাস করার পর অনেকেই সেটা আরো পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছে। এদের কেউ কেউ যখন সাংবাদিক জগতে প্রবেশ করল, তখন তাদের অনুরোধের তাড়নায় তিনি সেগুলি প্রবন্ধাকারে লিখে দেন। 'আনন্দবাজারে' 'দেশে' তাঁর প্রচুর লেখা বেরিয়েছে। এই তো সেদিন মাত্র কলকাতা থেকে আমার উপর তাগিদ এল, তেজেশবাবুর পিছনে লেগে থাকো, যতক্ষণ না তাঁর লেখাটি শেষ হয়।

ছেলেবেলায় আমরা এই শান্তিনিকেতনে দেখেছি, ছাতিমফুল, শালফুল আর বকুল। খোয়াই ডাঙাতে আকন্দ। তাই এই তিনটি প্রথমোক্ত কবিজনবল্লভ পুষ্প-বন্দনা যখন নিতান্তই শেষ হয়ে গেল, তখন রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'যেদিন প্রথম কবি-গান
বসন্তের জাগাল আহ্বান
ছন্দের উৎসব সভাতলে,
সেদিন মালতী যূথী জাতি
কৌতূহলে উঠেছিল মাতি
ছুটে এসেছিল দলে দলে।
আসিল মল্লিকা চম্পা কুরুবক
কাঞ্চন করবী
সুরের বরণমাল্যে সবারে
বরিয়া নিল কবি।
কী সংকোচে এলে না যে,
সভার দুয়ার হল বন্ধ
সব পিছে রহিল আকন্দ।

মোটামুটি ঐ সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, তেজেশচন্দ্র সেন মাথায় সাওতালি টোকা, হাতে নিড়েন নিয়ে ১১৪ ডিগ্রী গরমে আশ্রমের সর্বত্র খোঁচাখুঁচি আরম্ভ করেছেন। কি ব্যাপার? তিনি তাঁর যোল বৎসরের সঞ্চিত উদ্ভিদবিদ্যা কাজে লাগিয়ে হাতে-নিড়েনে দেখিয়ে দেবেন, এই কাঁকর-বালি-উই-পাথর, ক্ষণে জলাভাব ক্ষণে অতিবৃষ্টির খোয়াই ডাঙাতেও মরসুমী ফুল ফোটানো যায়। বাধ্য হয়ে 'আকন্দে' যাবার প্রয়োজন নেই।

আজকের লোক এ সব সহজে বিশ্বাস করবেন না। এখানে এখন ভারতের সব ফুল তো ফোটেই, তার ওপর ফোটে নানা বিদেশী ফুল, এমন কি অযত্নে আগাছার মত—রবীন্দ্রনাথের বহু বিদেশী শিষ্য-সখা এগুলো নানা দেশ থেকে তেজেশচন্দ্রের কৃতকার্যতার পর এখানে পাঠাতে আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণীতে' তার অনেকখানি ইতিহাস আছে। আজ যে 'উত্তরায়ণে' এত ফুলের বাহার, সেটা সম্ভব হল তেজেশচন্দ্রের পরীক্ষা সফল হল বলে।

বোধহয় এই সফলতা জানিয়েই তিনি রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লেখেন। প্রভাত মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্র-জীবনীতে লিখেছেন, 'ভিয়েনা প্রবাসকালে কবিকে শান্তিনিকেতন হইতে তথাকার পুরাতন শিক্ষক তেজেশচন্দ্র সেন গাছপালা সম্বন্ধে কতকগুলি রচনা পাঠাইয়া দেন। তাহার উত্তরে (২৩শে অক্টোবর, ১৯২৬) কবি লিখিতেছেন, "তোমার লেখাগুলির মধ্যে শান্তিনিকেতনের গাছপালাগুলি মর্মরধ্বনি ক'রে উঠচে! তাতেই আমার মন পুলকিত করে দিল।" পরবর্তীকালে তাঁর উদ্দেশ্যে আবার লিখেছেন,

'একথা কারো মনে রবে কি কালি,
মাটির পরে গেলে হৃদয় ঢালি!'

কার্তিকের বউ কলাগাছ। অকৃতদার তেজেশচন্দ্র বরণ করেছিলেন একটি তালগাছকে। আমার মনে হয় শান্তিনিকেতনের প্রতীক সপ্তপর্ণী না হয়ে তালগাছ হওয়া উচিত। এখানকার আদিম ছাতিম গাছটি খুঁজে বের করতে হয়। অথচ এখানে পৌঁছবার বহু পূর্বেই দূর থেকে দেখা যায়, আশ্রমের এদিক-ওদিক সারি সারি তালগাছ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে দিগন্তের পানে তাকিয়ে আছে অপ্রত্যাশিত মিত্রের আগমন আশঙ্কায়। তালগাছগুলি যে যুগের, তখন বীরভূমে ডাকাতের অনটন ছিল না। দ্বিজেন্দ্রনাথকে বলতে শুনেছি (১৯২৫), তিনি যখন চল্লিশ বৎসর পূর্বে এদেশে প্রথম আসেন, তখনো ঐ তালগাছগুলোর ঐ উচ্চতাই ছিল।

শান্তিনিকেতনে বোধহয় এমন কেউ আসেননি যিনি, একটি তালগাছকে ঘিরে গোল একখানা কুটির দেখেননি। মন্দিরে উত্তর-পূর্ব-কোণে, ডাকঘরের প্রায় মুখোমুখি। এটি তেজেশচন্দ্রের নীড়।

রবীন্দ্রনাথের 'বনবাণীতে' একটি কবিতা আছে 'কুটিরবাসী'। কবিতাটির ভূমিকা-স্বরূপ তিনি লেখেন,

'তরুবিলাসী আমাদের এক তরুণ বন্ধু এই আশ্রমের কোণে

পথের ধারে একখানা গোলাকার কুটির রচনা (এখানে লক্ষণীয় নির্মাণ নয়—'রচনা') করেছেন। সেটি আছে একটি পুরাতন তালগাছের চরণ বেষ্টন ক'রে। তাই তার নাম হয়েছে তালধ্বজ। এটি যেন মৌচাকের মতো নিভৃতবাসের মধু দিয়ে ভরা। লোভনীয় বলেই মনে করি, সেই সঙ্গে এও মনে হয়, বাসস্থান সম্বন্ধে অধিকার-ভেদ আছে: যেখানে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা থাকে সেখানে হয়তো আশ্রয় নেবার যোগ্যতা থাকে না।'

তেজেশ-শিষ্যমণ্ডলীর কাছে 'কুটিরবাসী' কবিতাটি সুপরিচিত। এর দুটি পাঠ আছে। পাঠকমাত্রকেই এ-দুটি মর্মস্পর্শী কবিতা পড়তে অনুরোধ করি। আমি মাত্র কয়েকটি ছত্র তুলে দিচ্ছি—

'তোমারি মত তব
কুটিরখানি,
স্নিগ্ধ ছায়া তার
বলে না বাণী।
তাহার শিয়রেতে তালের গাছে
বিরল পাতা ক'টি আলোয় নাচে,
সম্মুখে খোলা মাঠ
করিছে ধু-ধূ
দাঁড়ায়ে দূরে দূরে
খেজুর শুধু।
কীর্তিজালে ঘেরা আমি তো ভাবি
তোমার ঘরে ছিল আমারো দাবি;
হারায়ে ফেলেছি সে
ঘূর্ণিবায়ে,
অনেক কাজে আর,
অনেক দায়ে।'

যাঁর সরল, নিষ্কাম জীবন দেখে বিশ্বকবি পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে আপন

মনে নিজের সম্বন্ধে জমা-খরচ নিতে গিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছেন, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের আর বেশী কিছু বলার কি থাকতে পারে ?

শুধু এইটুকু বলি—তেজেশচন্দ্র নির্জন লোকচক্ষুর অগোচরে থাকতে ভালোবাসতেন। তাই যাবার সময়ও তিনি সকলের অগোচরে চলে গেলেন। ভোরবেলা জাগাতে গিয়ে দেখা গেল, লোকচক্ষুর অগোচরে তিনি চলে গিয়েছেন॥

এদেশে ছেলেদের প্রায় সবাই ম্যাট্রিক পাসের পর কলেজ পানে ধাওয়া করে। তার কারণ কি এদেশের গুণীজ্ঞানীরা 'উচ্চশিক্ষা চাই' 'উচ্চশিক্ষা চাই' বলে বড্ডবেশী চেঁচামেচি করেছেন বলে! তাঁরা তো আরো বেশী হট্টগোল করে বলেন, 'সিনেমা ফুটবলে অত বেশী যাসনি,' 'রকবাজি কমা,' 'পরীক্ষার হলে আসবাব-পত্র ভাঙিসনি,' কই, কেউ তো শোনে না। উচ্চ শিক্ষার বেলাতেই হঠাৎ তাদের অত্যধিক মুরুব্বি-মহব্বৎ বেড়ে যাবে এ-কথা তো চট করে বিশ্বাস করা যায় না। আসলে তারা কলেজ পানে ধাওয়া করে দুই কারণে,

(ক) ম্যাট্রিক পাস করার পর অন্য কিছু করার নেই বলে, এবং

(খ) চাকরি পেতে হলে বি এ টা অন্তত থাকা চাইই।

এ অবস্থাটা আমাদের দেশের একচেটে নয়। অন্যান্য দেশেও এটা মধ্যে মধ্যে হয়ে থাকে। একটা উদাহরণ দিই।

আশা করি, একথা কেউ বলবেন না, জর্মনি অশিক্ষিত দেশ। সেখানে আমি যখন ১৯২৯ সালে বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকি, তখন দেখি দুই পিরিয়ডের মধ্যে করিডরে করিডরে এত ভিড় যে চলা-ফেরা করা রীতিমত কষ্টের ব্যাপার।

আমি আশ্চর্য হইনি। ভেবেছিলুম, জর্মনি উচ্চশিক্ষিতদের দেশ, ভিড় হবে না কেন? কিছুদিন পরে কিন্তু আমার ভুল ভাঙলো, যখন শুনলুম, এক অধ্যাপক দুঃখ করে বলছেন, 'এত বেশী ছেলেমেয়ে এসে ভিড় জমিয়েছে যে পড়াই কি করে?' আমি তাঁকে জিজ্ঞেস-বাদ করে জানতে পারলুম, জর্মনিতে ছেলেমেয়েরা ১৭।১৮।১৯ বছর বয়সে ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে বা পাস করে সচরাচর কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে ঢুকে যায়; মাত্র কিছু সংখ্যক (ক) মেধাবী ছেলেমেয়ে—উচ্চশিক্ষার প্রতি যাদের একটা প্রাণের টান আছে—তারা, (খ) যে সব অধ্যাপক,

জজ ব্যারিস্টারের পরিবারে অনেক পুরুষ ধরে উচ্চশিক্ষার ঐতিহ্য আছে তাদের ছেলেমেয়ে (কোনো কোনো ক্ষেত্রে মেধাবী না হয়েও) এবং (গ) উচ্চশিক্ষার পালিশ লোভী হঠাৎ-নবাবদের দু-একটা ছেলে-মেয়ে—এই তিন শ্রেণীর ছাত্রই পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসতো (মেধাবী ছেলেদের প্রায় সবাই স্কলারশিপ পায় এবং আর গাধাদের উঁচু মাইনে দিতে হয়, 'নাকের ভিতর দিয়ে') এবং অধিকাংশই সেই কারণে উচ্চ-শিক্ষার জন্য উৎসুক এবং শাস্ত্রাধিকারী। এখন অর্থাৎ ১৯২৯ সালে বেকারের সংখ্যা এত অসম্ভব রকমে বেড়ে গিয়েছে যে ছেলে-ছোকরারা, এমন কি মেয়েরাও কাজকর্মে চাকরি-বাকরিতে কোনো রকম ওপ্‌নিং না পেয়ে বেনো জলের মত বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে ঢুকছে।

এই তো গেল ১৯২৯-এর কথা। ৩০।৩১।৩২ ক্রমাগত এদের সংখ্যা বেড়েই চললো। ১৯৩৩-এ হিটলার জর্মনির চ্যানসেলর হলেন। আমি দেশে ফিরেছিলুম ৩২-এ।

১৯৩৮ ফের জর্মনি বেড়াতে গিয়ে আমার এক বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করতে যাই বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমটায় ভেবেছিলুম, ছুটির দিন বুঝি, না হলে করিডরগুলি অত ফাঁকা কেন। অধ্যাপক বুঝিয়ে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয়টাই ফাঁকা ;—হিটলার বেকার সমস্যা সমাধান করে দেওয়াতে ছেলেরা এখন ম্যাট্রিক পাস না-পাস করেই কাজে ঢুকে যায়, পয়সা কামাচ্ছে বলে বিয়ে করছে তাই মেয়েরাও কলেজে আসছে না, এমন কি মেধারী ছেলেদের অনেকেই বলে, কলেজে ৬।৭ বছর ঘষ্টে ঘষ্টে পাস করে যখন কাজে ঢুকবো তখন দেখবো যারা ৬।৭ বছর আগে ঢুকেছিল তারা কামাচ্ছে বেশী—লাভ? বেনোজল এখন ভাটার টানে খাবার জলও টেনে নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আমার আশ্চর্য বোধ হল। আমার বিশ্বাস ছিল ধনী দেশে (যেখানে বেকার নেই) বুঝি উচ্চশিক্ষার তৃষ্ণা বেশী, গরীব দেশে কম। এখন দেখি উল্টো!

এ বিষয় নিয়ে আমি অনেক চিন্তা করেছি। ফলস্বরূপ আমার যে ধারণা হয়েছে সেটা যে আমি সপ্রমাণ করতে পারবো তা নয়। তবে সেটা আপনারা চিন্তা করে দেখতে পারেন।

মানুষ যা চায় পারতপক্ষে সেই দিকেই ধায়। ১৮।১৯।২০ বৎসরে মানুষ আপন হাতে কিছু একটা করতে চায়, গড়তে চায়, ঐ সময়ে তার স্বাধীনতা প্রবৃত্তিটা প্রখরতর হয় বলে কিছু-একটা অর্থকরী করতে চায়, এবং তৃতীয়ত সে তখন সঙ্গিনী খুঁজতে আরম্ভ করে। মোদ্দা কথা, সে তখন আপন বাড়ি বেঁধে, বউ এনে পয়সাকড়ি কামিয়ে ছা-পোষা গেরস্ত হতে চায়।

প্রাচীন ভারতে কি ব্যবস্থা ছিল?—ধরে নিচ্ছি আমরা তখন এতখানি বেকার গরীব ছিলুম না। গুণীজ্ঞানীরা আমাকে বললেন, 'ঐ ১৭।১৮।১৯-এ গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য সমাপন—অর্থাৎ লেখাপড়া শেষ করে—গৃহস্থাশ্রমে ঢুকতো, অর্থাৎ বিয়ে-শাদী করে টাকা পয়সা কামিয়ে সংসার চালাতো। তবে হ্যাঁ, দীর্ঘতর ব্রহ্মচর্যের ব্যবস্থাও ছিল; ২৬।২৮।৩০-এ সংসারধর্মে প্রবেশ করছে, এ ও হয়।' বুঝলুম, এই শেষের দল, আমাদের আজকের দিনের বি, এ, এম, এ, পি, এচ ডি কিংবা তারো সুপার পি, এচ, ডির দল।

লেখাপড়া করাটা কি খুব স্বাভাবিক, না সকলের পক্ষে আনন্দের বিষয়? দিনের পর দিন ৩০।৪০।৫০ বছর পর্যন্ত একটা লোক বইয়ের ভিতর মুখ গুঁজে বসে আছে, মাঝে মাঝে কাগজে খসখস করছে এইটে স্বাভাবিক, না ফসল ফলানো, খাল কাটা, এমারৎ তোলা, দোকান-পাট চালানো, ঐসব কর্মে দৌড়ঝাঁপ করা, শরীরের অবাধ চলাচল চালু রাখা—এসব স্বাভাবিক? অবশ্য ভাববেন না, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক বুঝি সংসারে ঢুকে সব রকম লেখা-পড়া একদম বন্ধ করে দেয়। অবসর সময় যার যে রকম রুচি সে রকম করে। বস্তুত ইয়োরোপে প্রায়ই দেখতে পাবেন, 'ম্যাট্রিক পাস পাদ্রী (পরে কিছু 'ধর্মশিক্ষা করেছে মাত্র)' অবসর সময়ের 'অধ্যয়নের ফলে' ভূতত্ত্ব,

পুরাতত্ত্বে নাম করেছে,—টমাস মানের মত প্রচুর সাহিত্যিক আছেন যাঁরা কখনো কলেজ যান নি। আর লেখালেখি করে নাম করাটাই তো সব চেয়ে বড় কথা নয়। কাজে কর্মে, লোক সেবার মাধ্যমে, পরিবার পালন করে, অবসর সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার ভিতর দিয়ে মানুষ জীবনকে যতখানি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারে, কর্ম-অভিজ্ঞতা-জ্ঞান দিয়ে জীবনকে যতখানি মধুময় এবং ঐশ্বর্যশালী করতে পারে সেইটেই তো বড় কথা! পক্ষান্তরে পাণ্ডিত্যে যাদের স্বভাবসিদ্ধ অনুরাগ তারা উচ্চশিক্ষা লাভ করে ঐ কর্মে লিপ্ত হবে।

অবশ্য মনে রাখতে হবে কন্টিনেন্টে ১৭।১৮-এর পূর্বে কেউ ম্যাট্রিক পাস করে না। এবং তাদের ঐ সময়ের ভিতর এমনই নিবিড় (intense) শিক্ষা দেওয়া হয় যে ওরই কল্যাণে পরবর্তী জীবনে সে অনেক কিছু আপন চেষ্টাতেই শিখতে পারে, রস নিতে পারে।

এদেশে ছেলেমেয়েকে ১৭।১৮ অবধি ইস্কুলে রাখুন আর নাই রাখুন, উত্তম পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করুন আর নাই করুন, প্রশ্ন এই তারা বেরিয়ে এসে করবে কি? কৃষি, বাণিজ্য, কলকব্জা বানানো, ম্যাট্রিকে তাকে যা-ই শেখান না কেন, বাইরে এসে তার ওপনিং কোথায়? যত ভালো কৃষিই সে শিখুক না কেন, গ্রামে যেটুকু জমি সে জোগাড় করতে পারবে তাতে সে জাপানের ড্রাই-ফার্মিংই করুক আর আইরল্যাণ্ডের কো-অপারেটিভই করুক, ঐ দিয়ে আণ্ডা-বাচ্চা পুষতে পারবে? আমি সাধারণ প্রতিভাবান ছেলেকে তিন বছরে তিনটে বিদেশী ভাষা শিখিয়ে দিতে পারি, যার জোরে সে ইয়োরোপে ভাল কাজ পাবে। এখানে?

কাজেই বাইরের অনুকূল পরিস্থিতি, আবহাওয়া, ওপনিংও সৃষ্টি করতে হবে।

তা সে দেশকে ইনডাসট্রিয়ালাইজ বা এগ্রিকালচারাইজ বা

অন্যান্য যা-কিছু হোক সে সব 'আইজ' করে, কিংবা অন্য কিছু করে। সেটা কি করে করতে হয় আমি জানিনে।

ততদিন কলেজে কলেজে ভিড়। অনিচ্ছুক লেখাপড়া করবে—আখেরে যার কোনো মূল্যও নেই। দেশের অর্থক্ষয়, শক্তিক্ষয়। সর্ব অপচয়।

কথায় বলে, 'ওরে পাগল, কাপড় পরিসনে কেন?' পাগল বললে, 'পাড় পছন্দ হয় না।' আমাদের হয়েছে উল্টোটা। ভাবছি, 'উচ্চ শিক্ষার' যত বস্তা বস্তা কাপড় ছেলের পিঠে বাঁধবো ততই সে সুবেশ নটবর হবে॥

ইংরেজের সুনাম, সে স্বদেশপ্রেমী। বিদেশে প্রত্যেক ইংরেজকেই তাই তার দেশের 'বেসরকারী' রাজদূত বলা হয়। মুসলমান মাত্রই মিশনারী। বিধর্মীকে ইসলামে টেনে আনার মত পুণ্য তার কাছে কমই আছে। এবং সে পুণ্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ মহাপাপ। ইসলামে তাই মাইনে দিয়ে বা অন্য কোনো প্রকারে অর্থ সাহায্য করে মিশনারী সম্প্রদায় গড়া হয় না। প্রত্যেক মুসলিম ব্যবসায়ীই তার ধর্মের মিশনারী। আফ্রিকায় এখনও মুসলমান হাতির দাঁতের কারবারী অনারারি মিশনারী পাল্লা দেয় মাইনে-খোর খৃষ্টান মিশনারীর সঙ্গে। মাইনে নেওয়ার অসুবিধা এই যে বিধর্মী স্বভাবতই সন্দেহ করে যে মিশনারী তার ধর্মপ্রচার করছে সে শুধু নিজের পেট পোষবার জন্য।

আরব বণিকরা সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে বেকার হিন্দু মাঝিমাল্লাকে আহ্বান জানালে, 'এসো আমাদের নৌকায় করে দেশ-দেশান্তরে—ব্যবসা-বাণিজ্য করবে, মাঝিমাল্লার কাজ করবে, তোমার শ্রীবৃদ্ধি হবে। তুমি সমাজচ্যুত হবে? আমি তোমাকে আমার সমাজে গ্রহণ করবো। সে সমাজ ক্ষুদ্র নয়। তুমি লাভবান হবে। আর আমার সমাজে নবদীক্ষিতের সম্মান সর্বোচ্চ এবং আমার সমাজে জাতিভেদ নেই।'

মুসলমানদের সুবিধা এই ছিল যে তাদের পূর্বে যারা এসেছিল তারা আপন ধর্মে অন্য লোককে দীক্ষিত করতো না, এবং আরব মুসলিমদের ভিতর যে সাম্যবাদ অত্যন্ত প্রখর সে সব কথা সবাই জানে।

আমার বিশ্বাস এই করে ইসলাম পূব বাঙলায় প্রচারিত হয় ৭।৮।৯ম শতাব্দীতে।

হিন্দুসমাজের আরেকটা বিপদ যে মানুষ সেখানে অনিচ্ছায় জাতিচ্যুত হতে পারে। কোনো হিন্দু যদি ভালোবাসা বশত ধর্মান্তরিত তার ভাই মুসলমান বা খৃষ্টানকে তার বাড়িতে তার সঙ্গে খেতে বসতে দেয় তবে সমাজ সে হিন্দুকে বর্জন করে। মুসলমান যদি তার খৃষ্টান ভাইকে বাড়িতে থাকতে দেয় তবে সমাজচ্যুত হয় না। তাকে পরিষ্কার বলতে হয়, সে ইসলামে বিশ্বাস করে না, তবে সে সমাজচ্যুত হবে। হিন্দু তার ধর্মে বিশ্বাস রেখেও সমাজচ্যুত হতে পারে। রামমোহন, আদি ব্রাহ্মসমাজের কথা স্মরণ করলেই কথাটা সুস্পষ্ট হয়।

কাজেই কোনো মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত নাবিক তার হিন্দু চাষা ভাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় পেলে তারও জাত যেত। সবাই যে আশ্রয় দিয়েছে তা নয়, কিন্তু যারা দিয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত ইচ্ছা অনিচ্ছায় মুসলমানই হয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এতটা ছড়ালো কি করে? তার একটি তুলনা দিতে পারি। প্যালেস্টাইন থেকে প্রথম প্রথম যেসব খৃষ্টানদের রোমে ক্রীতদাসরূপে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাদের কিভাবে সিংহের মুখে ফেলে দেওয়া হত সে ছবি অনেকেই নিশ্চয় সিনেমায় দেখেছেন —কুও ভাদিস্ পুস্তক কিংবা ছবি এদেশেও অপরিচিত নয়। অথচ এদেরই সংখ্যা একদিন এমনই বেড়ে গেল যে সে দেশের সীজারকেও শেষটায় খৃষ্টান হতে হল। এবং আশ্চর্য, রোমের পোপকে আজকেও রোমান সম্প্রদায়ের লোক হতে হয়। এরও অন্য উদাহরণ আছে। ইসলামের শেষের দিকের খলীফারা তুর্ক। আরব রক্ত এদের গায়ে একেবারেই নেই।

এবং খিলজীর বঙ্গাগমনের পূর্বেই বণিকদের কাছে খবর পেয়ে আস্তে আস্তে ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত (বণিকরা মিশনারী বটেন, কিন্তু সব সময় শাস্ত্রী হন না) সদাচারী মুসলমান সাধুসন্ত পূর্ববঙ্গে আসতে আরম্ভ করেন। এঁদের নাতি বিস্তৃত খবর এবং আমাদের মূল বক্তব্য

নিয়ে আলোচনা পাঠক পাবেন ডক্টর মহম্মদ এনামুল হকের বই 'পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম' পুস্তিকায়। আমাদের নিয়ে অনেক মতভেদ আছে সত্য (১) কিন্তু আমাদের মূল সিদ্ধান্ত একই—সমুদ্রপথেই ইসলাম পূব বাঙলায় আসে! মমাগ্রজ সৈয়দ মরতুজা আলী সাহেবের চট্টগ্রাম ও শ্রীহট্ট সম্বন্ধে লিখিত একাধিক প্রবন্ধে পাঠক আরো খবর পাবেন।

এইসব সাধু-সন্তরা ইসলাম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সন্দেহ নেই এবং হিন্দু রাজা তথা জনসাধারণ বিধর্মী সাধু-সন্তদের প্রতিও আকৃষ্ট হন, এ বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু মূল তত্ত্ব এই যে বণিকরা কতকগুলো কেন্দ্র নির্মাণ না করে থাকলে এঁরা অতখানি করতে পারতেন না। একটি উদাহরণ নিবেদন করি: ভারতবর্ষের সর্বত্র সুপরিচিত 'পাঁচজন' চিতশী সম্প্রদায়ের সন্তদের মধ্যে তিনজনের কর্মভূমি ও সমাধি দিল্লীতে। কুৎব্উদ্দীন বখতিয়ার কাকী (এঁর কবর কুৎব মিনারের কাছে), নিজাম উদ্দীন (এঁকে নিয়েই দিল্লী দূর অস্ৎ গল্প), এবং নাসিরউদ্দীন চিরাগ দিল্লী বহু শিষ্য পেয়েছিলেন কিন্তু এঁরা ধর্ম পরিবর্তন করেননি, দিল্লীতে এখনো তাঁদের উর্সপর্বে হিন্দু এবং শিখ অধিকতর এবং সর্বপ্রধান কথা—দিল্লী কখনো মুসলমান প্রধান হয়নি।

মুসলমান বাদশারা কতখানি সাহায্য করেছিলেন? আমার বিশ্বাস, অল্পই। যেখানে শুদ্ধমাত্র অস্ত্রবলে বিধর্মী এসে রাজ্য স্থাপন করে—পূর্বে যেখানে বিজয়ীর আপন ধর্মীয় কেউ ছিল না—সে সেখানে যদি প্রজার ধর্মে হস্তক্ষেপ করে তবে তাকে বেশী দিন রাজত্ব করতে হয় না। পূর্ব বাঙলায় পরিস্থিতি অন্য রকম ছিল। রাজারা পূর্ব

---

(১) খলীফা হারুন অর্ রশীদের ৭৮৮ খৃ মুদ্রিত একটি পাহাড়পুরের বৌদ্ধবিহারের ধ্বংস-স্তূপে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ আবিষ্কারের মূল্য আমি খুব বেশী দি না—হক সাহেব দেন।

দীক্ষিত মুসলমানদের সুখ-সুবিধা দিয়ে প্রতিবেশী হিন্দুকে আকৃষ্ট করতে পারতেন।

'কু দ্য পালে (রাজপ্রাসাদে হঠাৎ রাজাকে সরানো) 'কু দেতা (দেশে হঠাৎ সশস্ত্র বা বেআইনী রাষ্ট্র পরিবর্তন) এ ফরাসী কথাগুলো আমাদের কাছে এখন সুপরিচিত। বিশেষ করে সুয়েজ থেকে আরম্ভ করে চীন পর্যন্ত এ ঘটনা এখন নিত্য নিত্য হচ্ছে।

বখতিয়ার খিলজী অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে করেছিলেন, 'কু দ্য পালে। সেটা কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু প্রশ্ন, পরদিনই রাজার সৈন্যরা এসে লড়াই দিল না কেন?

তবে কি জনসাধারণ, সৈন্যদল রাজার আচরণে অসন্তুষ্ট ছিল? কোনো কোনো ঐতিহাসিক সে ইঙ্গিত দিয়েছেন। এর দৃষ্টান্তও আছে। 'আরবের 'মুষ্টিমেয় প্রথম সৈন্যবাহিনী যখন মরুভূমি অতিক্রম করে মহাপরাক্রান্ত' ইরান রাজকে আক্রমণ করলো তখন সেই বিরাট শক্তিশালী রাজবাহিনী অতিশয় 'অনিচ্ছায় যুদ্ধে নামল। 'আরবরা বিজয়ী হল। ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিকরা বলছেন, ইরানে তার পূর্বেই খবর রটে গিয়েছে, 'হজরৎ মুহম্মদ নামীয় এক 'আরব 'মহাপুরুষ, 'হ্যাভনট', নিঃস্বদের জন্য নূতন 'আশার বাণী নিয়ে এসেছেন। এরা সে ধর্মে বিশ্বাসী।

আমার প্রশ্ন, তবে কি পূব বাঙলার মুসলমান তখন অসন্তুষ্ট জনসাধারণের মধ্যে হজরতের বাণী হোক আর নাই হোক খিলজীকে পরিত্রাণ কর্তারূপে, কিংবা যে কোনো মুসলমান অভিযানকারীকে ঐ রূপে অঙ্কিত করে এমনই আবহাওয়ার সৃষ্টি করে রেখেছিল যে খিলজী তার কু দ্য পালেকে পরে কু দেতাতে পরিবর্তিত করতে পেরেছিলেন?॥

গেজেটেড অফিসার কবি

এ সংসারে দীনবন্ধুর বড়ই অভাব। তবে জগবন্ধুর কল্যাণে এ অধমের দু'একজন আছেন। তাঁরা মাঝে-মধ্যে দয়া করে আমাকে দু'একখানা অতিশয় উচ্চাঙ্গের, সাতিশয় 'হাইব্রাও'—'উন্নাসিক' মাসিক পাঠান। আগের দিন হলে আমার আর কোনো দুঃখ রইত না। এসব মাসিক থেকে চুরি করে হপ্তার পর হপ্তা দিব্য অরিজিনাল লেখা লিখে দেশে নাম করে ফেলতুম, কারণ এদেশে ক'টা গ্যোটে আছেন যে আমার লেখা পড়ে বলবেন, 'মহাশয়, আপনার লেখাতে অনেক অরিজিনাল এবং অনেক সুন্দর কথা আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় যেগুলো অরিজিনাল সেগুলো সুন্দর নয়, আর যেগুলো সুন্দর সেগুলো অরিজিনাল নয়।' চুরি করতে এখন অসুবিধাটা কি? সবচেয়ে বড় অসুবিধা ত্রিশ বৎসর আগেও আমি এসব লেখা পড়ে বেশ বুঝতে পারতুম, এখন আর পারিনে। তার কারণ, এখন ইয়োরোপীয় লেখকের অধিকাংশই, ইংরিজিতে যাকে বলে বিউইলডার্ড —হতভম্ব, দিক্‌ভ্রান্ত, মাথা গুবলেট—যা খুশী বলতে পারেন। নিজের কৃষ্টি-কলচর সম্বন্ধে এঁদের মনে দ্বিধা, হৃদয়দ্বন্দ্বের অন্ত নেই; শ্লীল অশ্লীল বিবেচনা করতে গিয়ে লেডি চ্যাটার্লির মত সাধারণ বই এঁদের তালুক-মুলুক-কুল্লে দেশে হালের চাটগাঁইয়া সাইক্লোন তোলে; এক দেশের বড় পাদ্রী অন্য দেশের বড় পাদ্রীর সঙ্গে সামান্য লৌকিতার দেখা করতে গেলে তারা হুররা রব ছেড়ে বলে, এবারে তাবৎ মুশকিল আসান, ঘড়ি ঘড়ি কলচরল কনফারেন্‌স্‌, তড়িঘড়ি ফের নেশার অবসাদ, পুনরায় খোঁয়ারি—

আর সর্বক্ষণ আর্তরব! ঐ এলরে, ঐ খেলরে! কে? কম্যুনিস্ট।

এঁরা এই একটি বিষয়ে সম্পূর্ণ মনস্থির করে ফেলেছেন যে, কম্যুনিস্ট এলে এঁদের আর কোনো গতি নেই। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বিলকুল বরবাদ হবে। সারি বেঁধে সবাই সাইবেরিয়া।

ওদিকে কম্যুনিস্টরা অভয় দিয়ে বলছে, আমরা এলেই তো তোমাদের পরিত্রাণ। ধনপতিদের অত্যাচারে খেতে পারছো না, পরতে পাও না, রাষ্ট্র তোমাদের জন্য কড়ে আঙ্গুলটি তোলে না, বস্তা-পচা ধর্মের আফিঙ পর্যন্ত এখন যে তোমাদের নেশায় বুঁদ করে রাখবে তারও উপায় নেই, ইত্যাদি অনেক মূল্যবান কথা।

পশ্চিম ইয়োরোপের লেখকরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণী, যে তাঁরা এলে পর ক্যাপিটালিস্ট দেশের লেখকরা অন্ততপক্ষে খেয়ে পরে বাঁচবে, কতখানি মনে মনে বিশ্বাস করেন সে-কথা বলা কঠিন, কিন্তু তাঁরা কম্যুনিস্টদের এই অভয়বাণীর একটি পরিপূর্ণ সুযোগ নিচ্ছেন।

সেইটে ইদানীং একটি পত্রিকাতে সরল ভাষায় আলোচিত হয়েছে। ঐটেই নিবেদন করি। বাকি—ঐ যে বললুম—বিউইলডার্ড জিনিস, সে তো আর চুরি যায় না, খালি-পকেট মারা যায় না, কিংবা বলতে পারেন, হাওয়ার কোমরে রশি বাঁধা যায় না।

সুইডেন থেকে জনৈক সুইস সংবাদদাতা তাঁর দেশের খবরের কাগজে সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, সে দেশের লেখকরা তাঁদের মূল্য বৃদ্ধির জন্য সরকারকে উদ্ব্যস্ত করে তুলেছেন (এস্থলে আমার মন্তব্য, ভাবটা এই, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রে লেখক কত সুখে আছে, এদিকে তোমার তথাকথিত জনকল্যাণ রাষ্ট্র আমাদের জন্য কিছুই করছে না, অনেকটা 'পাশের বাড়ির চাটুজ্যে তার গিন্নীকে কি রকম গয়না দিয়েছে ভাখো গে' গোছ)। পত্রলেখক সুইডেনের লেখক সম্প্রদায় সরকার থেকে যে সব অর্থ সাহায্য পান তার যে সবিস্তর নির্ঘণ্ট দিয়েছেন তার থেকে মাত্র একটি আমি তুলে দিচ্ছি—এ দেশে চালালে মন্দ হয় না —সাধারণ পাঠাগার থেকে যে পাঠক ধার নিয়ে বই পড়ে তার

প্রত্যেক বারের জন্য সরকার—পাঠক নয়—লেখককে কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দেন। সেটা সামান্যই, কিন্তু জনপ্রিয় লেখকের কাছে সেটা কিছু সামান্য নয়।

হালে তাই ডেনমার্ক, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড এবং সুইডেনের লেখক সম্প্রদায়ের মুরুব্বিরা সমবেত হয়ে রেডিয়ো ও টেলিভিজনে তাঁদের ফরিয়াদ ক্রন্দন শুনিয়েছেন ও দেখিয়েছেন। হেলসিঙ্কি শহরের তালকিস্‌ৎ বললেন 'সরকার লেখকদের বই কিনে পাঠাগারে পাঠগারে ফ্রী বিতরণ করে পাঠককে বদলে দেন করুণার মুষ্টি-ভিক্ষা (উপরে যেটা উল্লেখ করেছি)। অপিচ, পশ্য পশ্য, ঐ লেখক নামক জীবটি না থাকলে তামাম বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতো। প্রকাশক, মুদ্রাকর, দপ্তরী, পুস্তক বিক্রেতা এমন কি, পুস্তক সমালোচকের পর্যন্ত পাকা-পোক্ত আমদানী আছে, নেই কেবল লেখকের, তাকে সর্বক্ষণ কাঁপতে হয় অনিশ্চয়তার ভয়ে ভয়ে। সুইডিশ লেখক-সম্প্রদায়ের প্রধান মুরুব্বি বললেন, 'পূর্বে লেখক ছিল গরীবদের মধ্যে একজন গরীব ; আজ সে-ই একমাত্র গরীব।' যখন অকরুণ ইঙ্গিত করা হল, আজকের দিনে লেখকদেরও বড্ড বেশী ছড়াছড়ি, তখন তিনি বললেন, 'হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্য শুধু পাহাড়ের চূড়ো দিয়ে নির্মিত হয় না।'

শেষ পর্যন্ত এঁরা দাবী জানিয়েছেন, সরকারকে ওরকম ভিক্ষে দিলে চলবে না (বর্তমান লেখকের মন্তব্য : ব্যক্তিগতভাবে আমার কণা পরিমাণ ভিক্ষা নিতে কণামাত্র আপত্তি নেই); দিতে হবে পাকা-পোক্ত মাইনে। তবেই সে নিশ্চিন্ত মনে, পূর্ণ স্বাধীনতায় আপন সৃষ্টিকার্য করে যেতে পারবে, এবং তার জন্য সে সরকারের কাছে বাধ্যবাধক হবে না (রাশার প্রতি ইঙ্গিত নাকি ?)। এঁদের মতে সরকার এবং ফ্রী পাঠাগার থেকে লেখকরা বর্তমানে যা পান সেটাকে দশগুণ বাড়িয়ে দিলেও তাঁরা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পাবেন না, যার কৃপায়, অন্য চাকরি না করে তারা দারাপুত্র পোষণ করে আপন কার্যে মন দিতে পারবেন।

তারপর ইংরেজ, যুগোশ্লোভ, সুইডিশ ও জর্মন লেখকরা আপন আপন দেশ থেকেই টেলিফোন যোগে আপন আপন মন্তব্য সুইডেনে পাঠালেন ও সেখানকার বেতার কেন্দ্র থেকে সেগুলো বিশ্ব-সংসারের জন্য বেতারিত হল।

জর্মনির হাইন্‌রিষ ব্যোল বললেন, 'ঈশ্বর রক্ষতু (ফর হেভেন্‌স্ সেক, উম্ হিমেল্‌স্ বিলেন্! সর্বনাশ হবে—লেখক যদি সরকারের মাইনে-খোর হয়। সে সৃষ্টির কাজ করে যাবে নিছক সৃষ্টিরই জন্যে। এই আমাদের জর্মনিতে পঁয়ত্রিশ হাজার লেখক আছেন (সর্বনাশ! এই সোনার বাঙলায় পঁয়ত্রিশ হাজার ক্রেতা নেই)। কে এমন মাপকাঠি বের করবে যা দিয়ে স্থির করা হবে, কোন্ লেখক কত পাবেন? কৃতকার্য লেখকই যে মূল্যবান লেখক এ কথা বলে কে (সাক্সেস এবং কোয়ালিটি সমার্থসূচক নয়)।'

লণ্ডন থেকে রবার্ট গ্রেভসেরও বিচলিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'আমার আটটি সন্তান। সত্য বলতে কি, এদের পালা-পোষা আমার পক্ষে সব সময় সহজ হয়নি। তাই বলে যে-কাজ আমি এখনো আদপেই করিনি তার জন্য আগেভাগেই পয়সা নিয়ে বসবো? ইংরিজিতে একটি প্রবাদ আছে, "হি হু পেজ দি পাইপার কলজ দি ট্যুন—যে কড়ি ফেলে সে-ই হুকুম দেয় কোন্ সুর গাইতে হবে।" আমি আমার ইচ্ছে মত যে সুর খুশী গাইব।'

আর বেলগ্রেড থেকে উত্তেজিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল ডুসান মাটিকের,—'না, দয়া করে চাকুরে কবি তৈরী করতে যাবেন না। আমরা কারো চাকরি করিনে। কবিতা রচনা করা আর ফর্ম ফিল্ আপ্ করা এক কাজ নয়। মানুষকে লেখক হবার জন্য জোর করা যায় না, কবিতা রচনা করার সময় কোনো কবি কর্তব্য বোধ থেকে তা করে না, বরঞ্চ সে রচে যখন ভিতরকার তাড়না সে আর থামিয়ে রাখতে পারে না। কি করে মানুষ যে কবিকে সরকারী চাকুরে বানাবে তা তো আমার বুদ্ধির অগম্য......।'

এসব নিদারুণ মন্তব্য শোনার পরও কিন্তু সুইডেনের ঔপন্যাসিক ফল্‌কে ইসাকসন তাঁর সুইডিশ নৌকোর হাল ছাড়লেন না, অর্থাৎ সরকারী সাহায্যের প্রস্তাবটা। বললেন, 'কত ভালো লেখক দৈনন্দিন জীবনধারণ সমস্যায় এমনই ভার-গ্রস্ত যে, লেখার কাজ করে উঠতে পারেন না। সরকারের কিছু একটা করা উচিত……।' তার মানে এই নয়, সুইডেনের সব লেখকই এই মত পোষণ করেন। জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আকে ভার্সিং বলেছেন, 'প্রচুর, প্রচুর আমি শিখেছি মানবচরিত্রের, গড়ে তুলেছি আমার জীবনদর্শন, আমার জীবনের পেশা থেকে।' এঁর পেশা দারোয়ানি। অর্থাৎ বাড়ির দরওয়ান। পত্রলেখক জাল্‌ৎসার চিঠি শেষ করেছেন এই মন্তব্য করে, 'বাড়ির দরওয়ানই যদি এত ভালো লেখে তবে চিন্তা করো তো বড় হোটেলের পোর্টার (দরওয়ানই তো) আরো কত শতগুণে ভালো লিখবে!' অর্থাৎ কাকতালীয়।

*　　*　　*　　*

লেখাটি পড়ে শোনাতে আমার একজন প্রিয় লেখক-বন্ধু আশ্চর্য হয়ে শুধোলেন, 'বলেন কি মশাই! ওসব দেশে পাঠক যখন প্রতিবার লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে যায় তার জন্য সরকার লেখককে পয়সা দেয়! আর এদেশের লাইব্রেরি আমার কাছ থেকে ফ্রী বই চায়। বইটার দাম পর্যন্ত দিতে চায় না।'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেললুম, 'গরীব দেশ!' তারপর বললুম, 'কিন্তু ভেবে দেখুন, না চাইলে কি আরো ভালো হত? একদম পড়তেই চায় না, সেটা কি আরো ভালো হত? প্রিয়ার বিরহ বেদনা পীড়াদায়ক; কিন্তু যার একদম কোনো প্রিয়াই নেই?'

বন্ধু অধৈর্য হয়ে শুধোলেন, 'তোমার কাছে চাইলে তুমি কি করতে?'

আমার চিত্তে সহসা কবিত্বের উদয় হল। বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস নয়নে প্রকৃতির সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে লাগলুম॥

বরোদা-আহমদাবাদ-বোম্বাই করছি, আর বার বার মনে পড়ছে, স্বর্গত বাচুভাই শুক্লের কথা। ইনি রবীন্দ্রনাথের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন।

১৯২১ বিশ্বভারতীর কলেজ-(উত্তর)-বিভাগ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সেই সুদূর সৌরাষ্ট্র থেকে এসে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের পদপ্রান্তে আসন নেন। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে যে দুজন বিশ্বভারতীর শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উপাধি লাভ করেন, ইনি তারই একজন। বিশ্ব-ভারতীর সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসব হয় ১৯২৭। বাচুভাই রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে তাঁর উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন। শুনেছি স্বয়ং নন্দলাল সে উপাধি-পত্রের পরিকল্পনা ও চিত্রণকর্ম করেছিলেন। পরবর্তী যুগে তিনি গুজরাতী ভাষায় রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদকরূপে খ্যাতি লাভ করেন।

দাড়িগোঁফ গজাবার চিহ্নমাত্র নেই—সেই সুদূর কাঠিয়াওয়াড় থেকে এসে ছোকরাটি সীট পেল সত্য-কুটিরে। কয়েক দিন যেতে না যেতেই তার হল টাইফয়েড। বাসুদেব বিশ্বনাথ গোখলে ও আমি তাকে আমাদের কামরায় নিয়ে এলুম। সেই তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ১৯২১ সালে। তারপর ১৯৫৭ সালে তাঁর অকালমৃত্যুর দিন পর্যন্ত আমাদের যোগসূত্র কখনো ছিন্ন হয়নি।

তাঁর গুরু ছিলেন মার্ক কলিন্স্। তাঁর কাছে বাচুভাই উপাধি লাভ করার পরও দীর্ঘ সাত বৎসর তুলনাত্মক ভাষাতত্ত্ব অধ্যয়ন করেন। আমিও কলিন্সের শিষ্য। তাই তাঁর কিঞ্চিৎ পরিচয় দি। ইনি জাতে আইরিশ, শিক্ষা লাভ করেন অক্সফোর্ড ও জর্মনির লাইপ্ৎসিগে। এই বছর দুই পূর্বে লাইপ্ৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয় তার কোনো পরব উপলক্ষে মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে বিশ্বভারতীকে

প্রশ্ন করে পাঠায়, কলিন্‌স্‌ এখানে কি কি কাজ করে গেছেন। অর্থাৎ ছাত্র হিসেবেই তিনি সেখানে এত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন যে পরবর্তী যুগের অধ্যাপকেরা তাঁর কীর্তি-কলাপের সন্ধানে এদেশেও তাঁর খবর নিতে উদ্‌গ্রীব হয়েছিলেন। কেউ দশটা ভাষা জানে, কেউ বিশটা জানে একথা শুনলে আমি কণামাত্র বিচলিত হইনে। কারণ মার্সেই, পোর্ট সঈদ, সিঙ্গাপুরের দালাল দোভাষীরাও দশভাষী, বিশভাষী। কিন্তু কলিন্‌স্‌ ছিলেন সত্যকার ভাষার জহুরী। এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি আমাকে তুর্কী ভাষায় বাবুরের আত্মজীবনী অনুবাদ করে করে শুনিয়েছেন, শেলির প্রমিথিয়ুস্‌ আনবাউণ্ড পড়াবার সময় ইস্কিলাসের গ্রীক প্রমিথিয়ুস্‌ থেকে মুখস্থ বলে গেছেন, আমি তাঁকে একখানা আরবী স্থাপত্যের বই দেখাতে তিনি তার ছবিতে কুফী-আরবীতে লেখা ইনস্ক্রিপশন অনুবাদ করে করে শুনিয়েছিলেন। তার সঙ্গে মাত্র এইটুকু যোগ করি, আমার জীবনের সেই তিন বৎসরে আমি কখনো গুরু কলিন্‌স্‌কে কোনো প্রাচীন অর্বাচীন চেনা অচেনা ভাষার সামনে দাঁড়িয়ে বলতে শুনিনি, 'আমি তো এ ভাষা জানিনে'—অবশ্য সে-সব ভাষারই কথা হচ্ছে যার যে-কোনো একটা একজন লোকও পড়তে পারে।

বাচুভাই ছিলেন তাঁরই পুত্রপ্রতিম প্রিয় শিষ্য। কিন্তু বাচুভাই জানতেন, এ-দেশে বিস্তর ভাষা শেখার মত মাল-মশলা নেই, তাই তিনি বিস্তারে না গিয়ে গিয়েছিলেন গভীরে। বস্তুত তিনি শান্তি-নিকেতনে শিখেছিলেন মাত্র একটি জিনিস—ভাষাতত্ত্ব। নিজের চেষ্টায় শিখেছিলেন সংস্কৃত। আমরা যেরকম খাবলে খাবলে—অর্থাৎ স্কিপ করে করে—রাবিশ বাঙলা উপন্যাস পড়ি (সব বাঙলা উপন্যাস রাবিশ বলছিনে), বাচুভাই ঠিক তেমনি সংস্কৃত পড়তে পারতেন।

বোম্বায়ে ফিরে গিয়ে তিনি সর্বপ্রথম লেখেন একখানি অতি উপাদেয় গুজরাতী ব্যাকরণ। ভারতীয় অর্বাচীন ভাষাদের মধ্যে এই ব্যাকরণই যে সর্বোত্তম সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

আমরা সচরাচর বাঙলা ব্যাকরণের নাম দিয়ে লিখে থাকি সংস্কৃত ব্যাকরণ। ভারতের অন্যান্য অর্বাচীন ভাষাগুলিতেও তাই। গুজরাতী একমাত্র ব্যত্যয়—বাচুভাইয়ের কল্যাণে। বরোদায় গাইকোয়াড় সিরীজে এটি প্রকাশিত হয়।

এই সময় তিনি অন্য লোকের সহযোগিতায় বোম্বায়ে একটি ইস্কুল খোলেন। সাধারণ ইস্কুল, কিন্তু অনেকখানি শান্তিনিকেতন ইস্কুল প্যাটার্নের। অন্যান্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সঙ্গে শেখানো হতো রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্র নৃত্য-নাট্য। বাধ্য হয়ে তাঁকে তখন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের গুজরাতী অনুবাদ করতে হয়, এবং শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙলা সাহিত্যের সঙ্গে গুজরাতী রসিকসম্প্রদায়ের পরিচয় করিয়ে দেওয়াই তাঁর জীবনের চরম ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। বোম্বায়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। সেখানকার টেগোর সোসাইটির তিনিই অন্যতম উদ্যোক্তা।

বিয়াল্লিশের আন্দোলন আরম্ভ করার প্রাক্কালে মহাত্মাজী গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের শেষ অনুরোধ, এণ্ড্রুজ মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বোম্বায়ে আসেন। এসেই খবর দেন বাচুভাইকে, তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনবেন। বাচুভাই তাঁর ইস্কুলের গুজরাতী ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাঁকে শুনিয়ে এলেন—বিশ্বাস করবেন না—বাঙলা ভাষাতেই রবীন্দ্রসঙ্গীত। 'জীবন যখন শুকায়ে যায়,' 'যদি তোর ডাকশুনে কেউ না আসে' এবং আরো অনেক গান। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে বাচুভাইয়ের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল—তিনি জানতেন, মহাত্মাজী যখন শান্তিনিকেতন ইস্কুলে অধ্যক্ষ ছিলেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ কোন্ কোন্ গান রচেছিলেন এবং স্বভাবতই সেগুলোই মহাত্মাজীর বিশেষ করে জানার কথা। গাঁধীজীর ফরমায়েশমত বাচুভাই সেদিন তাঁকে সব গানই শোনাতে পেরে-ছিলেন। সেদিন, আজো, ক জন বাঙালী পারে?

রবীন্দ্রনাথের তাবৎ নৃত্য-নাট্য তিনি অনুবাদ করেছেন। 'গোরা,'

'নৌকাডুবি'র মত বৃহৎ উপন্যাসের পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ করেছেন এবং রবীন্দ্রনাথের আরো কত রচনা, কত গান, কত কবিতা, কত ছোট গল্প যে অতিশয় সাধুতার সঙ্গে অনুবাদ করেছেন তার সম্পূর্ণ ফিরিস্তি দেওয়া আমার ক্ষমতার বাইরে—যদিও ঐ সময়ে আমি গুজরাতেই ছিলুম এবং সাহিত্যজগতে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ সানন্দে সোৎসাহে লক্ষ্য করেছি। এই সাধুতা আকস্মিক ঘটনা নয়। বাচুভাই তাঁব 'অরিজিনাল' আইডিয়া রবীন্দ্রনাথেব অনুবাদের ভিতর দিয়ে পাচার করতে চাননি—সাধারণ অনুবাদকরা যা আকছারই করে থাকেন। কারণ তাঁর নিজের মৌলিক উপন্যাস এবং নাট্য গুজরাতী সাহিত্যে বছবের সেরা বইরূপে সম্মানিত হয়েছে।

নাট্যে, এবং নৃত্য-নাট্যে, ফিল্ম এবং রঙ্গমঞ্চে বাচুভাইয়ের কৃতিত্ব-খ্যাতি গুজরাতের বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে। ফলে আকাশবাণী তাঁকে দিল্লিতে বড় চাকরি দিয়ে নিয়ে যান—তাঁর কাজ ছিল সর্বভারতের তাবৎ রেডিয়োড্রামার মূল্য বিচার করে সেই অনুযায়ী আকাশ-বাণীকে নির্দেশ দেওয়া। কিন্তু ঐ সময়ও তিনি সমস্ত অবকাশ ব্যয় কবেছেন রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প গুজরাতীতে অনুবাদ করাতে—সাহিত্য আকাদেমির অনুরোধে। এ কাজটি তিনি সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন।

পঞ্চাশ পেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই গুজরাতী সাহিত্যের এই প্রতি-ভাবান লেখক সে সাহিত্যের অপূরণীয় ক্ষতি করে ইহলোক ত্যাগ করেন।

আমাদের শোক, বাঙলা সাহিত্যের গুজরাতী এম্বেসেডার প্লেনিপটেনশিয়ারি অকালে তাঁর কাজ পূর্ণ করে, কিন্তু আমাদের কাজ অসম্পূর্ণ রেখে চলে গেলেন। আমার ব্যক্তিগত শোকের কথা বলবো না। তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্রকে কাছে এনে আমাকেই দুঃসংবাদ দিতে হয়েছিল, তার পিতা ইহলোক ত্যাগ করেছেন॥

টমাস মান্ সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতায় বিশ্বাস করতেন ; পক্ষান্তরে হিটলার বিশ্বাস করতেন হুটেনটট এবং ফরাসী-জর্মন ইংরেজ বরাবর নয় ; অতএব পৃথিবীটাকে যদি ভালো করেই চালাতে হয় তবে সে-কাজটা সর্বশ্রেষ্ঠ জাতের উপরই ছেড়ে দেওয়া সমীচীন। হিটলার মান্‌কে ডেকে পাঠালেন তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। মান্ নারাজ হলেন। হিটলার চটে গিয়ে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়কে হুকুম দিলেন, মান্‌কে যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল সেটা যেন প্রত্যাহার করা হয়। উত্তরে মান্ এই সর্বপ্রথম নাৎসি 'জীবনদর্শন' সম্পর্কে আপন মত প্রকাশ করলেন। অতুলনীয় সে পত্র বিশ্বসাহিত্যে—রাজনীতিতে তার মূল্য কি আছে ঐ বাবদে গুণীরা তা বলতে পারবেন। আমি বলতে পারি, সে-পত্র আমার মনে মিলটনের এরিয়োপেজিটিকার চেয়েও গভীরতর রেখা কেটে গেছে।

ডক্টরেট হারানোতে মান্ আদৌ মনঃক্ষুণ্ণ হননি। স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে বলছি, মান্ তাঁর খোলা-চিঠি আরম্ভ করেছিলেন এইভাবে 'আজ আমি ডাক খোলার সঙ্গে সঙ্গে বন্ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সমাচার পেলুম, আমাকে একদা যে অনারারি ডক্টরেট দেওয়া হয়েছিল, সেটা প্রত্যাহার করা হয়েছে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কখনো বিদ্যাভ্যাস করিনি বলে সঠিক জানিনে এ সংবাদটি কি ভাবে সর্বসাধারণকে অবগত করানো হয়। অনুমান করি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নোটিশ বোর্ডে সেটা সেঁটে দেওয়া হয়। আমার অনুমান যদি সত্য হয়, তবে অনুরোধ করি, ঐ নোটিশের পাশে আরেকটি নোটিশও যেন সেঁটে দেওয়া হয়—বনের চিঠির সঙ্গে সঙ্গে একই ডাকে হার্ভাড (কিংবা অন্য কোনো মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়, আমার ঠিক মনে নেই—

সৈ-মু-আ) আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁরা আমাকে অনারারি ডক্টরেট দিয়েছেন। এই সুবাদে এটাও বলে রাখি, বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট আমি কখনো আমার নামের সঙ্গে জুড়িনি কিংবা অন্য কোনো প্রকারে কাজে লাগাইনি ; হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটও কাজে লাগালুম এই প্রথম এবং এই শেষবারের মত। কিন্তু কেন—?'

এই বলে মান্ জর্মনির সংস্কৃতির ঐতিহ্য তথা আদৌ ইয়োরোপীয় সভ্যতা বৈদগ্ধ বলতে কি বোঝায়, নাৎসি 'জীবনদর্শন' কিংবা বলি 'অদূরদর্শন' কি, সেই সম্বন্ধে শান্ত, বজ্রদৃঢ় কণ্ঠে প্রকাশ করেছেন আপন অতিশয় সুচিন্তিত যুক্তি-তর্ক-অভিজ্ঞতা-প্রসূত অভিমত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, গভীর দরদ দিয়ে। সেই যে জাপানী যক্ষ্মারোগী চিত্রকর, যে তার বুক কেটে তার থেকে তুলি দিয়ে রক্ত তুলে তুলে নিয়ে ছবি এঁকেছিল, ঠিক সেই রকম।

তারপর মান্ নীরব হলেন। কারণ তিনি রাজনৈতিক নন।

তারপর প্রায় সমস্ত পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তাণ্ডব-নৃত্য নেচে নিয়ে চলে গেল। কে তখন স্মরণ করে মানের ক্ষীণ কাকলি? তারপর তথাকথিত শান্তি। মানের বাসনা গেল আপন মাতৃভূমি পুনর্দর্শন করার। পশ্চিম জর্মনিতে তিনি এলেন। শেকস্পীয়র আজ ইংলণ্ডে ফিরে এলে এর সিকি সম্মানে তুষ্ট হতেন।

মান্ কমুনিজ্‌ম্ পছন্দ করতেন না, তবে কতখানি অপছন্দ করতেন সেটা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব, কারণ তাঁর তাবৎ লেখা এ-দেশে পাবার যো নেই।[১] তাই এক জর্মন তাঁকে ভীরু কণ্ঠে শুধোলেন, আপনি কি পূর্ব জর্মনি (কম্যুনিস্ট জর্মনি)-ও যাবেন?

মান্ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'জর্মন ভাষা যেখানে পূজা পায় সে ভূমিই আমার মাতৃভূমি।'

---

১ নেতিবাচক বাক্য বলা বড় কঠিন ; অস্তিবাচক বাক্য বলা সহজ। দৃষ্টান্ত : আমাকে যদি কেউ শুধোয়, 'ঘোড়া' শব্দ বাঙলাতে আছে কি, না ;

এত দীর্ঘ অবতরণিকা দেবার কারণ, অনেকেই মনে করেন মান্ এসকেপিস্ট ছিলেন—এই সুবাদে ঘটনাটির উল্লেখ করার সুযোগ হল।

শিলঙ, কটক, পাটনা—এই তিন জায়গায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের তিনটি বড় কেন্দ্র আছে। এ-তিনটির সঙ্গে আমি সুপরিচিত। ভাগলপুর, এলাহাবাদ, জবলপুর এবং আরো নানা জায়গায়ও আছে কিন্তু তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ক্ষীণ।[২]

এদের নানারকম সমস্যা আছে। তার চরম নিদর্শন তো হালে আসামের সর্বত্র হয়ে গেল।

প্রধান সমস্যা এই : মনে করুন আমি পাটনায় ডাক্তারি করি। আমার ঠাকুরদা সেখানে গিয়ে প্রথম বসবাস করেন। আদি নিবাস বিক্রমপুরের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র এখন সম্পূর্ণ ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। আগে রাষ্ট্রভাষা ইংরিজি ছিল বলে, আমি শিখেছিলুম বাঙলা এবং ইংরিজি। হিন্দীর বিশেষ প্রয়োজন হত না বলে ওটা আমি মেহন্নৎ করে শিখিনি। ধাই-আয়াদের কাছ থেকে, রাস্তাঘাটে ওটা আমি 'পিক্ অপ্' করে নিয়েছিলুম।

এখন অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। হিন্দী রাষ্ট্রভাষা। আমার ছেলে যদি বিহারীদের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায় তবে তাকে অত্যুত্তম হিন্দী শিখতে হবে। সে যখন কথা বলবে তখন যেন কেউ ঘুণাক্ষরেও

আমি অতি অবশ্য বলবো, 'নিশ্চয়ই', কারণ এ শব্দ আমি বাঙলা পুস্তকে শতাধিকবার পেয়েছি, কিন্তু কেউ যদি শুধোয়, 'কটহ্' শব্দ বাঙলা শব্দ কি, না; তবে আমি কি উত্তর দি? এ যাবৎ চোখে পড়েনি, তাই ব'লে কি বলবো, বাঙলা শব্দ নয়,—কারণ আমি তো তাবৎ বাঙলা বই, পুঁথি, পাণ্ডুলিপি পড়িনি, হলফ ক'রে বলবো, এটা বাঙলা শব্দ নয়।

২ ভাগলপুরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; আমার অগ্রজপ্রতিম জনৈক বন্ধু 'ভাগলপুরে বাঙলা ও বাঙ্গালী' এই বিষয়ে একখানি প্রামাণিক পুস্তিকা লিখছেন। সেটির দিকে এই বেলায়ই আমার পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে রাখছি।

না বুঝতে পারে যে হিন্দী তার মাতৃভাষা নয়; তার উচ্চারণ তার কথন শৈলী নিয়ে যেন কোনো হিন্দীভাষী টিটকারী না দিতে পারে।

এতখানি হিন্দী তাকে শেখানো যদি আমার আদর্শ হয় তবে তাকে অতি ছেলেবেলা থেকেই পাঠাতে হবে হিন্দী পাঠশালায়। শুধু তাই নয়, যেহেতুক বাড়িতে সে বাঙলা বলে, সে হ্যাণ্ডিক্যাপ কাটিয়ে ওঠবার জন্য তার জন্য আমার ফালতো ব্যবস্থাও করতে হবে। এ সব তাবৎ ব্যবস্থা যদি করি তবে সে উত্তম হিন্দী শিখবে সন্দেহ নেই কিন্তু সে যদি হরিনাথ দের মতন ভাষাবাবদে সব্যসাচী না হয়—এবং সে সম্ভাবনাই বেশী—তবে তার বাঙলা থেকে যাবে কাঁচা।

অথচ দেখুন, ভদ্রসন্তানই তার পিতামাতাকে শ্রদ্ধা করে। ভদ্রসন্তানই পুত্রকে শিক্ষা দেয়, পিতাকে মাতাকে, পিতৃপুরুষকে শ্রদ্ধা জানাতে। তার সরল অর্থ, পরিবারগত জাতিগত ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে। এর সবকিছুই করতে হয় মাতৃভাষার মারফতে। ছেলেবেলা থেকে হিন্দী শেখার ফলে মাতৃভাষা হবেন অবহেলিত। এবং তারই শেষ ফল :—পাটনার সর্বত্র সে সম্মান পাবে তার হিন্দীর জোরে, কিন্তু আপন বাড়িতে সে পরদেশী, আপন ঐতিহ্য তার ধমনীতে প্রবেশ করতে পারলো না,—সে বর্বর। এবং তার জন্য দায়ী আমি।

বোম্বায়ের বাঙালী ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা ম্যাট্রিক পাস করে বাঙলা মাতৃভাষা নিয়ে। এরা বড় সুন্দর বাঙলা লেখে। এ কথা আমি জানি; তার কারণ স্বর্গত শ্যামাপ্রসাদবাবুর কল্যাণে (ভুল হলে কেউ শুধরে দেবেন) যখন বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলাকে অন্যতম পরীক্ষার ভাষারূপে স্বীকার করে নিলেন তখন আমি হলাম তাদের এগজামিনার। তেরো বৎসর পরে আবার সে ইস্কুল দেখতে গিয়েছিলুম। বড় আনন্দ হল। সে যুগের দু'চারটি শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর পরিচিত স্মিতহাস্য বয়ানও দেখতে পেলুম।

এঁরা বোম্বায়ে বাঙলা ঐতিহ্য বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমার অনুরোধ, ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা যেন মারাঠী ভাষা অবহেলা না করে॥

অনেকেই হয়তো মনে করতে পারেন মুনিঋষিদের মত পরিবর্তন হয় না ; আজীবন একই বাণী প্রচার করে যান। আমি এ মত পোষণ করিনে। আমরা বিশ্বাস করি তাঁদেরও পরিবর্তন হয়, তবে আমার আরেকটি অন্ধ-বিশ্বাস,—মত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাঁদের একটি মূল সুর বরাবরই বজায় থাকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতনে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপন করেন তখন এটাকে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বা ব্রহ্মবিদ্যালয় বলা হত। ছেলেরা জুতো পরতো না, নিরামিষ খেত, ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণেতরের জন্য পৃথক পৃথক পঙ্‌ক্তি ছিল ; এমন কি প্রশ্ন উঠেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্র কায়স্থ গুরুর পদধূলি নেবে কি না।

সেই শান্তিনিকেতনেই, রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশায়ই, পৃথক পৃথক পঙ্‌ক্তি উঠে গেল, আমিষ প্রচলিত হল, গ্রামোফোন বাজলো, ফিল্ম দেখানো হল। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পূর্বেই শান্তিনিকেতন সত্যার্থে বিশ্বভারতী বা ইন্টারন্যাশনাল য়ুনিভার্সিটিরূপে পরিচিত হল। বস্তুত এরকম উদার সর্বজনীন বাসস্থল পৃথিবীতে আর কোথাও নেই।

* * *

একদিকে তিনি যেমন চাইতেন আমাদের চাষবাসের ট্র্যাক্টর এবং অন্যান্য কলকব্জা প্রচলিত হয়ে আমাদের ফসলোৎপাদন বৃদ্ধি করুক, অন্য দিকে ঠিক তেমনি ইয়োরোপের মানুষ কিভাবে অত্যধিক যন্ত্রপাতির নিপীড়নে তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে সে সম্বন্ধে তাঁর তীব্র মন্তব্য বিশ্বজনকে জানিয়ে গিয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর জীবনদর্শন কি ছিল তার আলোচনা কঠিন এবং দীর্ঘ ; আমাদের সামনে প্রশ্ন—আজ যে

রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প, উপন্যাস, নাট্য, নৃত্যনাট্য ফিল্মে আত্মপ্রকাশ করছে সেটা কি ভাবে করলে তিনি আনন্দিত হতেন ?

এ-কথা সত্য, প্রথম যৌবনে তিনি গ্রামোফোনের প্রতি বিরূপ ছিলেন এবং পরবর্তীকালে তিনি তার জন্য গেয়েওছেন। পিয়ানোযোগে তাঁর একাধিক নাট্য মঞ্চস্থ হয়েছে অথচ তিনি হারমোনিয়াম পছন্দ করতেন না। ফিল্মের প্রতি তাঁর অবজ্ঞা ছিল না ; এমন কি শুনেছি তাঁর 'প্রাণ চায় চক্ষু না চায়' গানটিতে তিনি যে সুর দিয়েছেন তাতে কিছুটা ফিল্মের রস দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এবং 'আমি চিনি চিনি তোমারে ওগো বিদেশিনী' জাতীয় একাধিক গানে যে বিলিতি সুর আছে সে তো জানা কথা।

প্রথম দিন রেডিয়োর কথা।

আমার বিস্ময় বোধ হয়, কোন্ সাহসে রেডিও-নাট্যের প্রডুসার রবীন্দ্র-নাটকের কাটছাঁট করেন !

গান, কবিতা, ছোট গল্প, উপন্যাস প্রত্যেক রসবস্তুরই একটা নির্দিষ্ট আয়তন আছে—এবং সেটি ধরা পড়ে রসবস্তুটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর। 'আগুনের পরশমণি'কে তিন ঘণ্টা ধরে পালা কীর্তনের মত করে গাইলে তার রস বাড়ে না, আবার কোনো মার্কিন কোটিপতির আদেশে তাজমহলকে কাটছাঁট করে তার জাহাজে করে নিয়ে যাবার মত সাইজ-সই করে দেবার চেষ্টাও বাতুলতা।

এই কিছুদিন পূর্বে বেতারে রবীন্দ্রনাথের একটি নাটক শুনছিলুম। এক ঘণ্টাতে সেটাকে ফিট করার জন্য তার উপর যে কী নির্মম কাঁচি চালানো হয়েছিল সেটা সর্ব কঠিন প্রতিবাদেরও বাইরে চলে যায়। শব্দে শব্দে ছত্রে ছত্রে, প্রশ্ন উত্তরে, ঘটনা ঘটনায় যতখানি সময় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তুলে ধরলেন তাতে কাটছাঁট করলে যে কী রসভঙ্গ হয় সে শুধু ঐ সব দাম্ভিকেরা বোঝে না। আমার মনে হয় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও যদি অতি অনিচ্ছায় কোনো কারণে রাজী হতেন ওটাকে ছোট করতে, তবে তাঁকেও বিষম বিপাকে পড়তে হত।

স্থাপত্যের বেলা জিনিসটা আরো সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। আজ যদি পুরাতত্ত্ব বিভাগ তদারকির খরচ কমাবার জন্য তাজমহলটাকে আকারে ক্ষুদ্রতর করার চেষ্টা করেন তবে কি অবস্থা হয় চিন্তা করুন তো। কিংবা ফিল্মেরই উদাহরণ নিন। বছর পাঁচেক পূর্বে আমি একটা নাম-করা বিদেশী ফিল্ম দেখে অবাক হয়ে বললুম, প্রত্যেক অংশই সুন্দর কিন্তু তবু রস জমলো না। তখন খবর নিয়ে জানা গেল ফিল্ম বোর্ড এর উপর এমনই নির্মম কাঁচি চালিয়েছেন যে, তার একটা বিপুল ভাগ কাটা পড়েছে। যেমন মনে করুন তাজের গম্বুজ এবং দুটি মিনারিকা কেটে নেওয়া হলে পর তার যে রকম চেহারা দাঁড়াবে!

আমার প্রশ্ন, কী দরকার? দুনিয়ায় এত শত জিনিস যখন রয়েছে যেগুলো বেতারের সময় অনুযায়ী পরিবেশন করা যায় তখন কী প্রয়োজন সর্বাঙ্গসুন্দর জিনিস বিকলাঙ্গ করার। হনুমান হনুমানই সই, কিন্তু শিব কেটে ঠুঁটো জগন্নাথ করার কি প্রয়োজন?

দুই নম্বর: রবীন্দ্রনাথের নাট্যের শব্দ পরিবর্তন। কিছু দিন পূর্বে একটি নাট্যে এ রকম পরিবর্তন শুনে কান যখন ঝালাপালা—বস্তুত কিছুক্ষণ শোনার পরই আমার মনে হল, এ ভাষা রবীন্দ্রনাথের হতেই পারে না এবং তাই বইখানি চোখের সামনে খুলে ধরে নাট্যটি শুনছিলুম—তখন এক জায়গায় দেখি ছাপাতে আছে 'কে তুমি?' এবং নাট্যে বলা হল 'তুমি কে?'

এ দুটোর তফাৎ তো ইস্কুল-বয়ও জানে।

নাট্যমঞ্চে হলে তবুও না হয় ভাবতুম, হয়তো নট ভালো করে মুখস্থ করেননি, কিন্তু এ তো বেতারের ব্যাপার—ছাপা বই তো সামনে রয়েছে।

পুনরায় প্রশ্ন করি, কী প্রয়োজন, কী প্রয়োজন? জানি পোনেরো আনা শ্রোতা ভাষা সম্বন্ধে অত সচেতন নয়, কিন্তু যেখানে কোনো প্রয়োজন নেই সেখানে এক আনা লোককেই বা কেন পীড়া দেওয়া?

তিন নম্বর—এবং সেইটেই সবচেয়ে মারাত্মক!

রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পকে নাটক করা হয়েছে। গল্পটি গত শতকের শেষের কিংবা এই শতকের গোড়ার পটভূমিতে আঁকা এবং নিম্ন মধ্যবর্তী শ্রেণী নিয়ে লেখা। বাপ-মায়েতে ঠিক হয়েছে অমুকের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে দেওয়া হবে। তখন বাপ তাঁর স্ত্রীকে শুধোচ্ছেন, 'তোমার মেয়ে কি বলে?' মা যে কী ন্যাকরার সুরে বললে সে অবর্ণনীয়—'ওকে জিজ্ঞেস করবে কি? সে তো সকাল-বিকাল ওরই ঘরে ঘুর ঘুর করছে।' সক্কলের পয়লা কথা, সে যুগে মেয়েকে বিয়ের পূর্বে ওরকম জিজ্ঞেস করা হত না, সে কাকে বিয়ে করতে চায়, দ্বিতীয়ত মেয়ের প্রেমে পড়া নিয়ে সে যুগে বাপে-মায়ে এরকম 'ন্যাকরা' করে কথা বলা হত না।

আমার কাছে এমনি বেখাপ্পা লাগলো যে, আমি কিছুতেই বুঝতে পারলুম না রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এ জিনিস কি প্রকারে সম্ভব। তখন উঠে বই খুলে পড়ে দেখি, মেয়ের মতামত জানবার জন্য বাপ-মায়েতে এই কথোপকথন গল্পটিতে আদৌ নেই!

সস্তা, কুরুচিপূর্ণ, ন্যাক্কারজনক বাজে নাটক শুনে শুনে আমাদের রুচি এমনই বিগড়ে গিয়েছে যে, প্রডুসার মনে করেন যে প্রচুর পরিমাণে ন্যাকামোর লঙ্কা-ফোঁড়ন না দিলে আমরা আর কোনো জিনিসই সুস্বাদু বলে গ্রহণ করতে পারবো না! দোষ শুধু প্রডুসারের নয় আমাদেরও।

তবে প্রশ্ন উঠতে পারে: স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই অনেক কিছু করেছেন।

যেমন মনে করুন 'শ্যামা' নাট্য তাঁর 'পরিশোধ' কবিতার উপর গড়া। আবার 'পরিশোধে'র প্লটটি জাতক থেকে নেওয়া। তাতেও আবার রবীন্দ্রনাথ মূল প্লটকে শেষের দিকে খানিকটা বদলে দিয়েছেন। এ স্থলে বক্তব্য, জাতকের গল্পেতে থাকে শুধু প্লটই। সেখানে অন্য কোন রসের পরিবেশ থাকে না বলে সেই প্লট নিয়ে কৃতকর্মা রস নির্মাতা গল্প উপন্যাস নাট্য নির্মাণ করতে পারেন।

অর্থাৎ দেবীর কাঠামোর উপর মাটি-কাদা-রঙ লাগিয়ে প্রতিমা নির্মাণ করা এক কথা—সেটা সহজও, যে যার খুশী মত করে তাকে সুন্দর করতে পারলেই হল—কিন্তু প্রস্তুত প্রতিমার উপর আরো মাটি লাগিয়ে হাত দুটিকে আরো লম্বা করা, কিংবা দশ হাতের উপর আরো দুটি চড়িয়ে দেওয়া, সে সম্পূর্ণ অন্য কথা। দ্বিতীয়ত রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'পরিশোধ'কে 'শ্যামা'তে পরিবর্তিত করতে পারেন, তাঁর সে শক্তি আছে। সে রকম শক্তিমান আমাদের ভিতর কই? এবং আমার মনে হয় সে রকম শক্তিমান ফিল্ম ডিরেক্টর রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া না করেও এমন প্লট অন্যত্র পাবে যেখানে সে তার জিনিয়াস, তার সৃজনীশক্তি আরো সহজে, আরো সুন্দর করে দেখাতে পারবে।

জাতক পড়ুন, জাতক পড়ুন, জাতক পড়ুন। ওর মত ভাণ্ডার কোনো ভাষাতেই নেই।

এবং রবীন্দ্রনাথ কি ভাবে জাতকের প্লট নিয়ে কবিতা এবং নাট্য করতেন সেই টেক্‌নীকটি রপ্ত করে নিন॥

সম্পাদক লেখক পাঠক

শ্রীযুত জলসা সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

সচরাচর আমি পাঠকদের জন্যই আপনার কাগজে লিখে থাকি (এবং আপনার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছি, যে প্রতি সংখ্যায়ই কিছু লেখা দেব)। আপনার পড়ার জন্য নয়। কারণ আমি নিন্দুকের মুখে শুনেছি, সম্পাদকেরা এত ঝামেলার ভিতর পত্রিকা প্রকাশ করেন যে তারপর প্রবন্ধগুলো পড়ার মত মুখে আর তাঁদের লালা থাকে না। কথাটা হয়তো একেবারে মিথ্যা নয়। কারণ যেদিন আমি

তিন্তিড়ী পলাণ্ডু লঙ্কা লয়ে সযতনে
উচ্ছে আর ইক্ষুগুড় করি বিড়ম্বিত
প্রপঞ্চ ফোঁড়ন লয়ে

রন্ধন কর্ম সমাধান করি, সেদিন আমারও ক্ষিদে সম্পূর্ণ লোপ পায়। কাজেই আপনার বিরুদ্ধে যে প্রিমা ফাশি কেস্ একেবারেই নেই, সে-কথা বলতে পারবেন না। অন্তত আমার লেখা যে আপনি একেবারেই পড়েন না, সে-বিষয়ে আমি সুনিশ্চয়—কারণ পড়া থাকলে দ্বিতীয়বারের জন্য লেখা চাইতেন না। ন্যাড়া একাধিক বার যেতে পারে বেলতলা—নিমতলা কিন্তু যায় একবারই।

ইতিমধ্যে আমি কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি। অথচ দোষটা পড়েছে নিশ্চয়ই আপনার ঘাড়ে। বাঙলাতে বলে,

খেলেন দই রমাকান্ত
বিকারের বেলা গোবদ্দন!

অর্থাৎ জবান খেলাপ করলুম আমি, বিকারটা হল আপনার!

'অয়, অয় জানতি পারো না'—আকছারই হয়। তার কারণটাও সরল। যে-দোষ আপনি করেছেন, তার গালমন্দ আপনিই খাবেন,

এ তো হক্ কথা, এ তো আপনার ন্যায্য প্রাপ্য। তাই তাতে আপনার ক্ষোভ থাকাটা অশোভন, কিন্তু সংসারটা তো ন্যায়ের উপর চলে না, সে কথা তো আপনি বিলক্ষণ জানেন—তাই মাঝে মাঝে অন্যায় অপবাদ সইতে হয়। আপনারই কাগজে দেখলুম, এক পাঠক আপনাদের টাইট দিয়েছেন, রাবিশ লেখা ছাপেন কেন? উত্তরদাতা বেচারী মুখ শুকনো করে (আমি হরফগুলোর মারফতেই তাঁর চেহারাটি স্পষ্টই দেখতে পেলুম) বলছেন, নাচার, 'নাচার স্যর। নামকরা লেখক। অনুরোধ জানিয়েছিলুম, একটি লেখা দিতে—অজানা জনকে তো আর অনুরোধ করতে পারিনে, বৃষ্টিতে ভেজার ভয়ে পুকুরে তো আর ডুব মারতে পারিনে—তারপর এসে উপস্থিত এই খাজা মাল। না ছাপিয়ে করি কি?'

বিলকুল সচ্চী বাং (আপনার কাগজে হিন্দী উর্দু শব্দের বগ্‌হার দিতে আমার বাধে না, কারণ আপনার পাঠক সম্প্রদায় পাইকিরি দরে হিন্দী ফিলিম দেখে দেখে দিব্য হিন্দী বুঝতে পারেন)! কারণ ফ্রান্স জর্মনিতেও বলে, বরঞ্চ রদ্দি মাল খেয়ে পেটের অসুখ করবো, তবু শা—হোটেলওলাকে ফেরত দেব না, পয়সা যখন দিতেই হবে,—পাছে অন্য খদ্দেরকে বিক্রি করে ডবল পয়সা কামায়!' অতএব আমার মতে ছাপিয়ে দেওয়াটাই সুবুদ্ধিমানের কর্ম।

এ হেন অবস্থায় একটা মাস যে মিস্ গেছে, সেটা কি খুব খারাপ হল? বুঝলেন না? তা হলে একটি সত্যি ঘটনা বলি :

ফিল্মাকাশের পূর্ণচন্দ্র শ্রীযুত দেবকী বসু আমার বন্ধু। দিল্লীতে যখন তাঁর 'রত্নদীপে'র হিন্দী কার্বন কপি দেখানো হয়, তখন দিল্লীর ফিল্ম সম্প্রদায় তাঁকে সেখানে নিমন্ত্রণ করে অভ্যর্থনা জানায়। স্বাগতাভিভাষণটি বলবার অনুরোধ আমাকেই করা হয়েছিল। কেন, তা জানিনে। এ তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো নয়। দেবকীবাবু যদি চটকদার রাবিশ ফিল্ম বানাতেন, তবে আমি ডাক পেলে আশ্চর্য হতুম না। তখন বুঝলুম, 'মুক্তো তুলতে ডুবুরি'—অর্থাৎ জউরী, যে

সত্যই মুক্তোর মূল্য জানে, সে জলে নামে না—নামে মুক্তো বাবদে আনাড়ী ডুবুরি। কারণ আমি ফিল্ম দেখতে যাইনে—এ রকম একটা বদনাম তরুণদের মধ্যে আমার আছে। বৃদ্ধেরা অবশ্য খুশী হয়ে বলবেন, 'বা, বা, বেড়ে ছেলে, খাসা ছেলে।' আমি কিন্তু বৃদ্ধের প্রশংসার চেয়ে তরুণের নিন্দাই কামনা করি। সংস্কৃতেও বলে, 'বৃদ্ধার আলিঙ্গনের চেয়ে তরুণীর পদাঘাত শ্রেয়।'

যাক্ সে কথা। সেই সূত্রে দেবকীবাবুর পুত্র দিলীপের সঙ্গেও পরিচয় হয়। তদ্দণ্ডেই সে আমার ন্যাওটা হয়ে যায়। খাসা ছেলে। ফিল্ম দেখেও বেড়ে ছেলে—তরুণ বৃদ্ধ এক সুরেই বলবেন।

সে ডাক্তাবি প্র্যাকটিসে নামার কয়েক বৎসর পর—আমি তখন ঘরের ছেলে কলকাতায় ফিরে এসেছি—দেবকীবাবু আমাকে একদিন শুধোলেন, 'দিলীপ কি রকম ডাক্তার।'

মিত্রপুত্রের প্রশংসা করতে সবাই আনন্দ পায়; একগাল হেসে বললুম, 'চৌকশ, ভালেবর।'

'মানে?'

'অতি সরল। এই দেখুন না, মাস ছয় আগে আমার হল দারুণ আর্ত-রাইটিস—আর্তরব ছেড়ে ডাকলুম ডাকসাঁইটে অমুক ডাক্তারকে। তিনি ওষুধ দেওয়ার পর আমার এমনই অবস্থা যে আর্তরব স্মার্তরব কোনো রবই আর ছাড়তে পারিনে। তখন এলেন আরেক বাঘা ডাক্তার। তিনি নাকি মড়াকে জ্যান্ত করতে পারেন। আমার বেলা হল উল্টো; জ্যান্তকে মরা করতে লাগলেন। যাই যাই। সেই যে,

এক দুই তিন,
নাড়ি বড় ক্ষীণ।
চার পাঁচ ছয়,
কি হয় না হয়।
সাত আট নয়,
মরিবে নিশ্চয়।

দশ এগারো বারো,
খাট জোগাড় করো।
আঠারো উনিশ কুড়ি
বল্ "হরি হরি।"

কী আর করি? মরি তো মরি, মরবো না হয় দিলীপেরই হাতে। আর যা হোক হোক, আমাকে মানে। ভোঁতা নীড্‌ল দিয়ে শেষ. ইন্‌জেকশনটা দেবে না।'

আমি থামলুম। দেবকীবাবু রুদ্ধশ্বাসে, শঙ্কিত কণ্ঠে শুধোলেন. 'তারপর কি হল? আপনি বেঁচে উঠেছিলেন কি?'

আমি বললুম, 'দিলীপ বাড়িতে ছিল না, তাই আসতে পারল না। আমি সেরে উঠলুম।

তবেই দেখুন, সে ভালো ডাক্তার কি না।'

সম্পাদক মশাই, আপনাদেরও কি সেই অবস্থা নয়? ডাকসাঁইটে অমুক লেখকের লেখা ছাপালেন। কাগজ নাবলো নিচে। বাঁচাতে গিয়ে ডেকে পাঠালেন আরেক বাঘা লেখককে। আপনাদের অবস্থা হল আরো খারাপ! তখন আমি দিলীপ—কাঁচা লেখক—চাইলেন আমার লেখা। আমি বরদায়। লেখা পাঠাতে পারলুম না। হুশ করে আপনার কাগজের মান উঁচু হয়ে গেল। বিশ্বাস না হয়, আপনার সেল্‌স্ ডিপার্টমেণ্টে খবর নিন—যে সংখ্যায় আমার লেখা ছিল না সেটি ইণ্ডো-পাকিস্তান ক্রিকেট টিকিটের মত বিক্রি হয়নি, ডাকে বিস্তরে বিস্তর খোয়া যায়নি, হয়তো বা আপনার অজানতে কালো-বাজারও হয়েছে। বলতে কি, ঐ সংখ্যাটি আমারও বড্ড ভালো লেগেছে। বিশেষ করে রঞ্জনের লেখাটি এবং ভোম্বে থেকে বৌমিকের 'প্রশ্নবাণ'। বস্তুত, আমি আজ ঠিক করেছিলুম এ সংখ্যাটি নিয়েই আলোচনা করবো কিন্তু উপস্থিত মাত্র দু'একটি মন্তব্য করে সে-আলোচনা মুলতুবি রাখি।

যেমন মনে করুন, রঞ্জন লিখেছেন, 'বম্বের চিত্রনির্মাতা ঠিকই ধরেছেন যে অধিকাংশ দর্শক আড়াই ঘণ্টার জন্য (যখন ছবি ওই সময়ে শেষ হয়) আপন আসন্ন পরিবেশ থেকে অব্যাহতি পেতে চায়।' সত্যই কি তাই? তবে আমার প্রশ্ন, বৃদ্ধের আসন্ন পরিবেশ মৃত্যুর। এবং মৃত্যু ভয় সব চেয়ে বড় ভয়। তবে বৃদ্ধেরা সিনেমা দেখতে যায় না কেন? আবার দেখুন, লড়াই যখন চলতে থাকে তখন ছুটি-ফেরা জোয়ান সেপাই জোর সিনেমা যায়। চল্লিশ এবং পঞ্চাশের মাঝামাঝি সময়েই এদেশের পরিবেশ সর্বাপেক্ষা নিরানন্দময়। ছেলেদের পড়াবার পয়সা নেই, মেয়েরা বড় হয়েছে অথচ বর জুটছে না, চাকরিতে আর যে একটা মহৎ পদোন্নতি হবে সে সম্ভাবনাও আর নেই—তবু ঐ বয়সের লোক সিনেমায় যায় কম। অথচ তার কলেজী ছেলে—যার ঘাড়ে এখনো সংসারের চাপ পড়েনি, খেলাধুলো সে করতে পারে, রকবাজিও তোফা জিনিস, তার আসন্ন পরিবেশ প্রৌঢ় বা বৃদ্ধের তুলনায় অনেক কম ভয়াবহ—সেই বা ড্যাং ড্যাং করে সিনেমায় যায় কেন? না, আমার মন সাড়া দিচ্ছে না।

মঞ্জু বসু আমাদের ভৌমিক সায়েবকে শুধিয়েছেন, 'বারাঙ্গনার বীরাঙ্গনাতে রূপান্তরিতের একটি উদাহরণ দিন।' ভৌমিক ঠিক উত্তরই দিয়েছেন—'বাজিরাও প্রেমিকা মস্তানা বেগম্।'

আমি উল্টোটার বিস্তর উদাহরণ দিতে পারি। বীরাঙ্গনা কি করে বারাঙ্গনা হয়। যে কোনো খবরের কাগজে যে কোনো দিন দেখতে পাবেন। আমি তো প্রথম দিনে হকচকিয়ে উঠেছিলুম। এক বিখ্যাত বাঙলা দৈনিকের প্রথম পাতার এক কোণে দেখি, একটি সৌম্যদর্শন মহিলার ফোটোগ্রাফ এবং নিচে লেখা 'বারাঙ্গনা—অমুক।' এদের কি মাথা খারাপ না এরা পাগল যে বারাঙ্গনার ছবি কাগজের পয়লা পাতায় ঘটা করে ছাপায়। তলায় আবার পরিচয় 'মহিলাটি বঁটি হাতে একা একটা ডাকাতকে ঘায়েল করে প্রাণ হারান।' তখন আমার কানে জল গেল। বাঙলা হরফের উপরের ও নীচের দিকের

অংশ প্রায়ই ভেঙে যায়। ী দীর্ঘঈকারের উপরের লুপটি ভেঙে যাওয়াতে 'বী' বদলে হয়ে গিয়েছে 'বা'। এটা এক দিনের নয়। উপরের লুপ ('বঞ্চিত' শব্দের উপরের হুক ভেঙে গেলে অবস্থা আরো মারাত্মক), নিচের হ্রস্বউকার গণ্ডায় গণ্ডায় নিত্যি নিত্যি ভাঙে। আমরা অভ্যাসবশে পড়ে যাই বলে লক্ষ্য করিনে। যদি ঠিক যে-রকম ছাপাটি হয়েছে—ভাঙাচোরার পর—সে-রকমটি পড়েন তবে দেখবেন বিস্তর বীরাঙ্গনা বারাঙ্গনা হচ্ছেন, এবং আরো অনেক সরেস উদাহরণ পাবেন যেগুলো স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ছাপলে আমি সমাজে মুখ দেখাতে পারতুম না। আপনাকে বলে রাখি, এখনো পারিনে—তবে সেটা পাওনাদারের ভয়ে।

অরুণ গুহ শুধিয়েছেন, 'এমন একটি আশ্চর্য জিনিসের নাম বলুন যা আজ আছে কিন্তু ত্রিশ বৎসর আগে ছিল না' ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন,—'শচীন ভৌমিক।' সরেস উত্তর।

তারপর অরুণ গুহ ফের শুধিয়েছেন, 'এমন একটি জিনিসের নাম বলুন যা না থাকলে বিশ্বের কোন ক্ষতি হত না।'—ভৌমিক উত্তর দিয়েছেন, 'অরুণ গুহ।' আমি শচীন ভৌমিক হলে লিখতুম, 'শচীন ভৌমিক'—এবারেও। কারণটা বুঝিয়ে বলি।

রবীন্দ্রনাথের শতবার্ষিকী চলেছে, সেই সুবাদ নিয়েই বলছি—

বিলাতের বিখ্যাত স্ট্র্যাণ্ড ম্যাগজীন একবার পৃথিবীর সেরা সেরা গুণীজ্ঞানীদের, প্রশ্ন শোধান,

১। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পাপমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর বেস্ট ফেভরিট ভাইস ?) ?

২। আপনার সব চেয়ে প্রিয় পুণ্যমতি কি (হোয়াট ইজ ইয়োর মোস্ট ফেভরিট ভার্চু ?) ?

উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

১। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারিনে—অর্থাৎ মত বদলাই)

২। ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি (অর্থাৎ কোনো জিনিসে অবিচল থাকতে পারিনে—অর্থাৎ মত বদলাই)।

একবার চিন্তা করলেই দেখবেন, ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি জিনিসটা পাপ বটে, পুণ্যও বটে।

যখন আমি স্বার্থের বশে কিংবা শত্রুভয়ে কাপুরুষের মত আপন সত্য মত বদলাই (কুলোকে বলে এ ব্যামোটা রাজনৈতিকদের ভিতরই বেশী—'টার্নকোট্' এর নাম) তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি পাপ। আবার যখন বুঝতে পারি আমার পূর্বমত ভুল ছিল, তখন লোক-লজ্জাকে ড্যাম-কেয়ার করে, এমন কি প্রয়োজন হলে স্বার্থত্যাগ করেও যখন মত বদলাই তখন আমার ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সি সাতিশয় পুণ্যকর্ম।

ঠিক সেইরকম ভৌমিক সায়েব যখন বলেন তিনি ত্রিশ বৎসরের আশ্চর্য জিনিস, আমরা সানন্দে সায় দিই। কারণ তিনি সুন্দর সুন্দর এবং চোখাচোখা, মৌলিক এবং চিন্তাশীল উত্তর দিতে পারেন। কখন আনন্দিত হয়ে বলি 'বাঃ', কখনো মার খেয়ে বলি 'আঃ'।

আর তিনি না থাকলেও কোনো ক্ষতি হত না। ইংরিজিতে বলে, 'যা তোমার অজানা সে তোমাকে বেদনা দিতে পারে না।' কিংবা বলবো, 'আমরা জানিলাম না, আমরা কি হারাইতেছি।'

একটু চিন্তা করে দেখুন, কথাটা শুধু ভৌমিক সাহেব না, টলস্টয় কালিদাস, আপনি আমি সকলের বেলায়ই খাটে কিনা।

* * *

রবীন্দ্রনাথ ও ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির সুবাদে আমাদের দুটি নিবেদন আছে।

গেল মাসে মিস গেছে তার জন্যই আমি সম্পূর্ণ দায়ী নই। বড় লেখক হলে আমি অনায়াসে বলতে পারতুম, 'মশাই, ইন্‌স্‌পিরেশন্ আসেনি—আমি কি দর্জি না ছুতোর অর্ডার-মাফিক মাল দেব?' তা নয়। আমি সাধারণ লেখক। আমি আজ পর্যন্ত কখনো ইন্‌স্‌পায়ার্ড হয়ে লিখিনি। আমি লিখি পেটের ধান্দায়। পূর্বেই বলেছি, চতুর্দিকে

আমার পাওনাদার। কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝিনে? যতবার ফুরিয়ে গিয়েছে ততবারেই হাড়ে হাড়ে বুঝেছি। একটু বেশী ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে, তবু না বলে উপায় নেই, আপনি হয়তো লক্ষ্য করেননি, আমি চাকরিতে থাকাকালীন কোনো প্রকারের 'সাহিত্যসৃষ্টি' করিনে —চাকরিতে থাকাকালীন আমার কোন বই বেরয়নি। তখন তো পকেট গরম, লিখতে যাবে কোন মূর্খ। অতএব ইন্‌স্‌পিরেশনের দোহাই কাড়লে অধর্ম হবে।

আমি গিয়েছিলুম বরদা। সেখানে আমি মধ্য যৌবনে আট বছর কাজ করি। ১৯৪৪-এ বরদা ছাঁড়ি। সেখানে রবি শতবার্ষিকী উদ্বোধন করতে আমাকে আহ্বান জানান হয়, পুরনো চেনা লোক বলে, অন্য কোন কারণে নয়। না গেলে নেমক-হারামী হত। ট্রেনে লেখা যেত না? না। আপনি যদি গবেষণামূলক উচ্চাঙ্গ উন্নাসিক গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ চাইতেন সে আমি গণ্ডায় গণ্ডায় ট্রেনে-বাসে, ভেস্‌টিবুলে-তরুমূলে যেখানে সেখানে বসে—না বসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েও লিখে দিতে পারি। কিন্তু একটুখানি রসের ভিয়েন দিতে গেলেই চিত্তির। তার জন্য ইন্‌স্‌পিরেশন্ না হোক, অবকাশটি চাই। সাধে কি আর জি, কে, চেস্টারটন বলেছিলেন, 'টাইম্‌স্ কাগজের গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় কলাম আমি দিনের পর দিন আধ ঘণ্টার ভিতর লিখে দিতে পারি, কিন্তু ঐ যে ট্রাম-বাসের কাগজ 'টিট্ বিট্‌স'—তার পয়লা পাতার বিশটি রসিকতার চুটকিলা গল্প এক সঙ্গে আমি কখনো রচনা করে উঠতে পারবো না।' অথচ কে না জানে, চেস্টারসন ছিলেন সে যুগের প্রধান সুরসিক লেখক। আর আমি? থাকগে।

দ্বিতীয়ত ঐ ইন্‌কন্‌সিস্‌টেন্‌সির কথা। ওটার বাড়াবাড়ি করলে লোকে ভাববে পাগল। গল্পটা তাই নিয়ে।

ট্রেনে ফেরার মুখে এক ভদ্রলোকের কাছ থেকে শোনা। ওটা উনি কোন ছাপা বই থেকে পড়ে বলেছেন কি না হলপ করতে

পারবো না, তবে এইটুকু বলতে পারি সেই থেকে যাকে বলেছি, তিনি উত্তরে বলেছেন, এটা তিনি আগে কখনো শোনেন নি। আজ দোল-পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ছিল—তার সঙ্গেও এর কিঞ্চিৎ যোগ (অর্থাৎ এসোসিয়েশন অব্ আইডিয়াজ) রয়েছে।

ক্লাস-টীচার বললেন, 'গত শতাব্দীর সূর্যগ্রহণ সংখ্যা থেকে চন্দ্র-গ্রহণ সংখ্যা বিয়োগ করে, তোমার কলারের সাইজের সঙ্গে এ বাড়ির থামের সংখ্যা যোগ দিয়ে, পদীপিসির নামকে ক্ষান্তমাসির নাম দিয়ে ভাগ করে বল দিকিনি আমার বয়স কত?'

ছেলেরা তো অবাক! এ কখনো হয়!

একটি চালাক ছোকরা হাত তুলে বললে, 'আমি পারি, স্যর।'

টীচার বললেন, 'বল।'

'চুয়াল্লিশ।'

টীচার ভারী খুশী হয়ে বলেন, 'ঠিক বলেছিস। কিন্তু স্টেপগুলো বাৎলা তো, কি করে তুই সঠিক রেজাল্টে পৌঁছলি।'

ছেলেটি তিন গাল হেসে বললে, 'মাত্র তিনটি স্টেপ, স্যর। অতি সোজা:—

আমাদের বাড়িতে একটা আধ-পাগলা আছে;

তার বয়স বাইশ;

অতএব আপনার বয়স চুয়াল্লিশ॥

রবীন্দ্র রচনাবলী

রবীন্দ্র রচনাবলী/জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ/বিশ্বভারতীর সৌজন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে শিক্ষাসচিব শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন কর্তৃক প্রকাশিত/২৫ বৈশাখ ১৩৬৮/বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে গ্রন্থ সম্পাদনের সহায়তা করেছেন শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য, শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীঅমিয়কুমার সেন।

রবীন্দ্র রচনাবলী সদ্য প্রকাশিত দুই খণ্ড যে আমার এবং আমার মত রবীন্দ্রানুরাগী বহু সহস্র পাঠকের মনে কি গভীর পরিতৃপ্তি সৃষ্টি করেছে সেটি এই অবকাশেই প্রকাশ না করলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথা বাঙালী জনমতের প্রতি বিলক্ষণ অবিচার করা হবে। উভয়েরই কৃতিত্ব সমান। রবীন্দ্রশতাব্দী উপলক্ষে সুলভ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশিত হোক, এই ঐকান্তিক ও ঐক্যবদ্ধ কামনা দেশের কাগজে কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ; আমরা, যাদের কথার কোনো মূল্যই নেই, যতদূর সম্ভব অনুনয়-বিনয় করেছি কর্তৃপক্ষের কাছে, উৎসাহ দিয়েছি যাঁরা বাঙালীর হয়ে তাঁদের কামনাটি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে জানিয়েছেন। অবশ্য বলে রাখা উচিত, এই উভয় কর্তৃপক্ষের ভিতর বিস্তর রবীন্দ্রানুরাগীও আছেন যাঁরা এই সুলভ রচনাবলী প্রকাশের জন্য জনমত তৈরী হওয়ার পূর্বেই এ ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন। বলা বাহুল্য, এঁদের সকলেই বিস্তর বিরুদ্ধাচরণ অতিক্রম করে আজ সাফল্যের দ্বারে এসে পৌঁচেছেন। বলা আরো বাহুল্য বিরুদ্ধাচারিগণ যে রবীন্দ্রভক্ত নন এ কথা বললে অন্যায় বলা হবে। কি কারণে তাঁরা এ প্রস্তাব অনুমোদন করেননি সে প্রসঙ্গ এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

এই দুই খণ্ড যে ছাপা, বাঁধাই, কাগজ, ছবি, কবির হস্তলিপি ইত্যাদি নিয়ে অনবদ্য সে-বিষয়ে কোনো তর্কের অবকাশ নেই।

কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা, প্রথম আড়াই বা তিন খণ্ডেই আমরা কবির তাবৎ কবিতা ও প্রচুর গান এক সঙ্গে পেয়ে যাচ্ছি। যাঁরা প্রাচীন রচনাবলী নিয়ে কাজ করতেন তাঁরাই জানেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা বের করতে আমাদের কী বেগই না পেতে হত। কোনো বিশেষ ছোট গল্প, নাট্য, বা প্রবন্ধ নিয়ে প্রায় ঐ একই অসুবিধায় পড়তে হত। এই দ্বিতীয় অসুবিধাটিও বর্তমান রচনাবলী দূর করে দেবে—কারণ এতে প্রাচীন রচনাবলীর মত চার রকমের জিনিসের (১, কবিতা ও গান, ২, নাটক ও প্রহসন, ৩. উপন্যাস ও গল্প, ৪, প্রবন্ধ) পাঁচমেশালি থাকবে না।

আমি রবীন্দ্রসৃষ্টির বিশেষজ্ঞ নই, কিন্তু আরো বহু বঙ্গসন্তানের মত রবীন্দ্রনাথের কোনো বিশেষ কবিতা পাঠ করে ভাবোদয় হলে সেটা তাদেরই মত প্রকাশ করতে চেয়েছি। এ যাবৎ সেটাও করতে পারিনি তার কারণ ঐ ছাব্বিশ খণ্ড নিয়ে রেফেরেন্স খুঁজে বেড়ানো আমাদের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আমার শোক—নবীন রচনাবলীখানা কুড়ি বৎসর পূর্বে পেলে হয়তো এই নিয়ে কোনো বৃহৎ কাজে হাত দিতে পারতুম। বক্তব্য একটু ব্যক্তিগত হয়ে গেল, কিন্তু আমার একাধিক অনুরাগী পাঠক এই নিয়ে ফরিয়াদ করেছেন বলেই এই সাফাইটি গাইতে হল। আমি কিন্তু প্রাচীন রচনাবলীর নিন্দা করার উদ্দেশ্য নিয়ে এ প্রবন্ধিকা লিখতে বসিনি—যাঁবা চার রকমের লেখা পাঁচমেশালী করেছিলেন তাঁদের উদ্দেশ্য শুভই ছিল, সে বিষয়ে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন প্রশ্ন, নবীন রচনাবলীর সম্পাদনা কি রকমে হয়েছে।

আমি বলবো উত্তম, অতি উত্তম। কিন্তু সর্বাঙ্গ-সুন্দর সম্পাদনা হতে এখনো একশ' কিংবা দুশ' বছর লাগবে। কারণ এ কাজ দশজন পণ্ডিতকে দশ বছর খাটিয়ে নিলেই হয় না।

প্রথমত, কবির তাবৎ প্রকাশিত রচনাবলীর প্রথম প্রকাশের ফোটোস্টাট, তাঁর জীবিতাবস্থায় তিনি যে-সব পরিবর্তন করেছিলেন সে সব এবং তাঁর পাণ্ডুলিপি (এগুলো সংগ্রহ করতে কতদিন লাগবে, কেউ বলতে পারে না) যেমন যেমন পাওয়া যাবে তারও ফোটোস্টাট (অন্য একটা নূতন সস্তা পদ্ধতিও হালে বেরিয়েছে) বের করতে হবে। তাদের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে কবির দেহত্যাগের পর যে সব পুনর্মুদ্রণ এবং নূতন সংস্করণ বেরিয়েছে তাতে যে সব পরিবর্তন করা হয়েছে সেগুলি পাণ্ডুলিপি-সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা। এখন এ কাজ সম্ভব নয়। ত্রিশ বৎসর পর যখন এ সব পুস্তকের উপর কারো কোনো কপিরাইট থাকবে না, তখনই উৎসাহী, অগ্রণী নানা প্রকারের প্রকাশক নানারকম জিনিস প্রকাশ করে পণ্ডিতদের সামনে তুলে ধরবেন। তাঁরা বাঙলার ভিতরে বাইরে বসে বসে যে সব গবেষণা প্রকাশ করলেন সে সমস্ত যাচাই বাছাই করে ধীরে ধীরে তৈরী হবে প্রামাণিক সংস্করণ। একটা তুলনা দিই; জর্মন কবি হাইনরিষ হাইনের মৃত্যু শতাব্দী উদ্‌যাপিত হয়েছে বছর পাঁচেক পূর্বে (আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্ম শত-বার্ষিকী করছি এখন) এবং আজও তাঁর চিঠিপত্র মুদ্রিতাকারে প্রকাশিত হচ্ছে! কবে শেষ হবে, অনুমান করা কঠিন।

নবীন রচনাবলীর সম্পাদকগণ এ ধরনের কাজে হাত না দিয়ে যে প্রাচীন রচনাবলী যেভাবে ছাপা হয়েছিল মোটামুটি সেভাবেই ছেপেছেন সেইটেই করেছেন ভালো। 'মোটামুটি' কথাটা বোঝাবার জন্য একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ দিই; প্রাচীন রচনাবলীর একাদশ খণ্ডে, গীতাঞ্জলি পুস্তকে আছে—

কত অজানারে জানাইলে তুমি,
কত ঘরে দিলে ঠাঁই
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু,
পরকে করিলে ভাই।

গীতবিতানেও তাই। কিন্তু ব্রহ্ম-সঙ্গীতে 'নিকটে'র পর কমা নেই অর্থাৎ 'নিকট-বন্ধু'রূপে পড়া যেতে পারে। আমরাও ছেলেবেলায় ঐ অর্থে পড়েছি—'বন্ধু'কে ভকেটিভ কেসে নিইনি। জন্ম শতবার্ষিক সংস্করণের (২য় খণ্ড, ২১৬ পৃষ্ঠায়) পাচ্ছি 'নিকট বন্ধু,'—মাঝখানে কমা নেই। অর্থাৎ ব্রহ্মসঙ্গীতেও আমরা ছেলেবেলায় যেটি শুনেছি সেই পাঠ। কবিতাটির পাণ্ডুলিপি রবীন্দ্র সদনে নেই। ওদিকে ঐ সদনের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মচারী আমাকে বলেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথের আপন হাতে অটোগ্রাফ বইয়ে লেখা এই কবিতাটিতে 'নিকট' ও 'বন্ধু'র মাঝখানে কমা পেয়েছেন।

নবীন সংস্করণের সম্পাদকগণ কমা না দিয়ে ভালো করেছেন না ভুল করেছেন সেটা পরবর্তীকালে হয়তো স্থির হবে। উপস্থিত এই পাঠটি দেওয়াতে, আমাদের ভিতর যে আলোচনা হত সেটি সজীব রইল, এবং আরো পাঁচজনের সামনে প্রকাশ পেল।

প্রাচীন সংস্করণ কপি করাতে নবীন সংস্করণে আরো কিছু কিছু অসম্পূর্ণতা থেকে যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু পূর্বেই বলেছি গত্যন্তর ছিল না। যেমন প্রাচীন রচনাবলী পূরবী পুস্তকের 'দুঃখ-সম্পদ' কবিতাটি শেষ হয়েছে, 'তখন বুঝিতে পারি আপনার মাঝে। আপন অমরাবতী চিরদিন গোপনে বিরাজে।' কিন্তু রবীন্দ্র সদনে সুরক্ষিত ঐ পুস্তকের পাণ্ডুলিপিতে এর পর আরো ছয়টি ছত্র আছে—

যখনি কুঁড়ির, বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দেয় তাপে,
তখনি ত জানি, ফুল চিরদিন ছিল তাপে।
দুঃখ চেয়ে আরো বড় না থাকিত কিছু
জীবনের প্রতিদিন হ'ত মাথা নীচু
তবে জীবনের অবসান
মৃত্যুর বিদ্রূপ হাস্যে আনিত চরম অসম্মান।

দু' একটি শব্দের তফাত নয় বলে এ কয়টি লাইনের বিশেষ মূল্য

আছে ও প্রাচীন রচনাবলীর গ্রন্থ পরিচয়ে দেওয়া আছে। যদিও বাজারে প্রচলিত ভাদ্র, ১৩৬৩ পুনর্মুদ্রণের 'পূরবীতে' নেই।

* * * *

ঠিক সেই রকম বানান, সমাজবদ্ধ শব্দ লেখার পদ্ধতি নিয়েও নানা কথা উঠবে, নানা আলোচনা হবে। কিন্তু বর্তমান সম্পাদকগণ সেদিকে না গিয়ে ভালোই করেছেন। প্রাচীন রচনাবলী নানা প্রতিকূল অবস্থার মাঝখানে সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছিল। তাতে অনেক বিষয়ে অনেকের মতান্তর থাকবে। আমরা চেয়েছিলুম, সেই প্রাচীন সংস্করণেরই একটি সুলভ, কবিতা গল্প ইত্যাদি আলাদা আলাদা করা হ্যাণ্ডি সংস্করণ। তাই পেয়েছি॥

কতকগুলো প্রশ্ন আমাকে ছেলেবেলা থেকেই চিন্তান্বিত করেছে এগুলোর সদুত্তর আমি বহু জায়গায় অনুসন্ধান করে কয়েকটি মীমাংসায় পৌঁচেছি বটে কিন্তু যতখানি দলিল-দস্তাবেজ থাকলে এগুলো প্রমাণ রূপে পেশ করা যায় ততখানি করে উঠতে পারিনি। তার প্রধান কারণ আমার আলসেমি নয়—দস্তাবেজের অপ্রাচুর্যই তার আসল কারণ। অনেকদিন ধরে তাই ভেবেছি, আমার যা বলবার তা বলে ফেলি—দলিল থাক আর নাই থাক—যারা এ-সব লাইনে কাজ করেন, হয়তো তাদের উপকারে লেগে যেতে পারে। 'দেশ' সম্পাদকও এই মত পোষণ করেন—বস্তুত তাঁরই অনুরোধে আমি আমার সমস্যা ও মীমাংসাগুলি পাঠকদের সামনে পেশ করছি ; কিন্তু আবার সাবধান করে দিচ্ছি, যথেষ্ট প্রমাণপঞ্জি আমার হাতে নেই।

আমার প্রথম প্রশ্ন, দিল্লী আগ্রা পাঠান-মুগলদের রাজধানী ছিল। সেখানে মুসলমানের সংখ্যা অত কেন? যুক্ত প্রদেশ, বিহার, পশ্চিম বাঙলার দিকে যতই এগোই, ততই দেখি মুসলমানের সংখ্যা কমে আসছে—সেইটেই স্বাভাবিক—কিন্তু হঠাৎ পুব বাঙলায় এসে এদের সংখ্যাধিক্য কেন? দিল্লীর বাদশা দিল্লী, এলাহাবাদ ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ পুব বাঙলায়ই তলোয়ার চালিয়ে জন-সাধারণকে মুসলমান করলেন কেন? উত্তরে কেউ কেউ বলেন, দিল্লীর বাদশারা তলোয়ার চালাননি, চালিয়েছিল বাঙলার স্বাধীন পাঠান বাদশারা। তাই যদি হবে, তবে সে যুগে বেহার, বিজাপুর আহমদাবাদেও স্বাধীন পাঠান রাজারা ছিলেন। তাঁরাই বা তলোয়ার চালালেন না কেন? কেউ কেউ বলেন, বাঙলাদেশ বৌদ্ধপ্রধান স্থান ছিল—তারা ভালো করে পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরে যাবার পূর্বেই মুসলমান ধর্ম বাঙলাদেশে আসে

বলে· এদের অনেকেই মুসলমান হয়ে যায়। এর উত্তরে আমার নিবেদন, —রাজগির, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র, নালন্দা, বিক্রমশিলা সবই বিহার প্রদেশে—সে তো আরো বৌদ্ধপ্রধান ছিল। তবে তারাই বা মুসলমান হল না কেন?

সর্বশেষে আরো সামান্য একটি বক্তব্য আছে। বহুকাল পূর্বে (শ্রাবণ, ১৩৫৮, 'বসুমতী') আমি স্বামী বিবেকানন্দের একটি উদ্ধৃতিতে পড়ি,

"ভারতবর্ষের দরিদ্রগণের মধ্যে মুসলমানের এত সংখ্যাধিক্য কেন? একথা বলা মূর্খতা যে তরবারির সাহায্যে তাহাদিগকে ধর্মান্তর গ্রহণে বাধ্য করা হইয়াছিল।......বস্তুত জমিদার ও পুরুতবর্গের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ইহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিল। আর সেইজন্য বাঙলাদেশে যেখানে জমিদারের বিশেষ সংখ্যাধিক্য সেখানে কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা বেশী।"(১)

আমার মূল বক্তব্যের সঙ্গে স্বামীজীর কথা কিছুটা মিলে। পরে তার দীর্ঘতর আলোচনা হবে। উপস্থিত তরবারির সাহায্যে যে ব্যাপকভাবে ধর্ম প্রচার করা যায় না, সেই সিদ্ধান্তটি মেনে নিয়ে এগোচ্ছি।

আরবভূমি যদিও মরুময়, তবু তার তিন দিকে সমুদ্র। নৌযাত্রায় আরবরা তাই কখনো পরাঙ্মুখ ছিল না। বিশেষত হজরৎ মহম্মদের সময় তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে নৌপথে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে দুখানা উত্তম গ্রন্থ এলাহাবাদ একাডেমি থেকে উর্দু ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে—আরবোঁকী জাহাজরাণী (আরব নৌবিদ্যা) ও হিন্দ ও আরবকী তাল্লুকাৎ (ভারত ও আরবের

---

(১) এ উদ্ধৃতিতে যে কয়েকটি ফুটকি আছে, সেগুলো প্রবন্ধের সঙ্কলন কর্তাই দিয়েছিলেন। মূল সম্পূর্ণ লেখাটি পেলে আমাদের আলোচনার সুবিধে হয়।

যোগসূত্র)। অতদূর না গিয়ে যাঁরা আরব্যোপন্যাসের সিন্দ-বাদকে স্মরণে আনতে পারবেন তাঁরাই বলতে পারবেন এক বিশেষ যুগে আরবজাতি কী দুর্দান্ত সমুদ্রাভিযানই করেছে। (২) ওরাই মৌসুমী (শব্দটি আসলে আরবী ও ইংরিজি মনসূনও তার থেকে) বাতাস আবিষ্কার করে ও ফলে উপকূল ধরে ধরে না এসে এডেন-সোকোত্রা থেকে সোজা সিংহল-ভারত আসা সুগম ও দ্রুততর হয়ে যায়।

স্থলপথে আরবরা, ইরান আফগানিস্থান জয় করে। জলপথে সিন্ধুদেশ।

এ ছাড়া সমুদ্রপথে যারা বাণিজ্য করতে ছড়িয়ে পড়ল তাদের নিয়েই আজ আমার আলোচনা। এরা প্রথমে সোকোত্রা (সংস্কৃত 'দ্বীপ সুখদ্বার'—এডেনের কাছেই,) তার পর মালদ্বীপ লাক্ষাদ্বীপে ইসলাম প্রচার করে। দক্ষিণ ভারতে পাবেনি, (পুব বাঙলার কথা পরে হবে), বর্মায় পারেনি, মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় পেরেছিল।

হিন্দুদের সমুদ্রযাত্রা কেন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল আমি ঠিক জানিনে, তবে যাঁরা বৌদ্ধদের পরাস্ত করে হিন্দুধর্ম পুনর্জীবিত করেছিলেন তাঁরা হয়তো চাননি যে সাগর-পারের বৌদ্ধদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগসূত্র থাকে—যার ফলে আবার একদিন বৌদ্ধধর্ম মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে।

তা সে যাই হোক, অষ্টম নবম শতাব্দীতে পুব বাঙলার মাল্লা-মাঝি, আমদানী-রপ্তানী ব্যবসায়ীদের দুরবস্থা চরমে। আজো যে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, সিলেটের মাঝি-মাল্লারা দুনিয়ার সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় (আজ তারা আবার ইংলণ্ডে বসতি স্থাপনা করতে আরম্ভ করেছে, প্লেন চা'টার করে পুব বাঙলায় বেড়াতে আসে) এটা কিছু নূতন নয়।

---

(২) আরব্যোপন্যাসের প্রথম গল্পটি জাতক থেকে নেওয়া। সতীদাহ ও কোনার্ক মন্দিরের 'প্রতিচ্ছবি'ও ঐ পুস্তকে পাওয়া যায়।

হিন্দু বৌদ্ধ যুগে এরাই বাঙলার তাবৎ এবং পুব ভারতের প্রচুর মাল আমদানী-রপ্তানী করেছে, নৌ-নির্মাণ ও নৌবহর চালিয়েছিল বটেই।

সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে প্রধানত এরাই হল অন্নহীন।

আরব ভৌগোলিক (ও ঐতিহাসিকরা) বলেন, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতেই (অর্থাৎ বখতিয়ার খিলজীর বহু পূর্বেই) আরবরা চট্টগ্রামে উপনিবেশ স্থাপন করেছে ও এ বন্দরেই সবকিছু সংগ্রহ করে (হিন্দুরা তো যাবে না) দক্ষিণ পুবেও ছড়িয়ে পড়ত।

আরবী ভাষাতে 'চ' ও 'গ' অক্ষর নেই। 'ট' 'ত' তেও পার্থক্য নেই। সেই হয়েছে বিপদ। তদুপরি নকলনবিশদের ভুল-ত্রুটি তো আছেই। কাজেই যদি বা চট্টগ্রাম শব্দটি বোঝা যায়, তবু পরবর্তী যুগে এরা 'সপ্তগ্রাম' ও 'সোনার গাঁ'-র সঙ্গেও এটা ঘুলিয়ে গিয়েছে। তারো পরবর্তী যুগের পর্তুগীজরা তাই চট্টগ্রামের উল্লেখ করতে পোর্টে গ্রাণ্ডে (বড় বন্দর) ও সপ্তগ্রামকে পোর্টে পিকোনে (ছোট বন্দর) বলে।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বর্তমান ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্রতটেই আরবরা বসতি স্থাপন করে—সিলেটের সঙ্গে জলপথে যাতায়াত আরও সহজ ছিল। এরাই মিশনারি এবং বণিক—একাধারে। এরাই অষ্টম নবম শতাব্দীতে, একদা যারা মাঝি-মাল্লা ছিল, সেই সব হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করে। এ তত্ত্বটা মেনে নিলে 'অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গ জয়' অন্য দৃষ্টিতে দেখা যায়। কিন্তু তার জন্য নূতন অধ্যায় প্রয়োজন॥

ভবঘুরে

ছন্নছাড়া, গৃহহারা, বাউণ্ডুলে ভবঘুরে, যাযাবর—কত হরেকরকম রঙবেরঙের শব্দই না আছে বাঙলাতে ভ্যাগাবণ্ড বোঝাবার জন্য। কিন্তু তবু সত্যকার বাউণ্ডুলিপনা করতে হলে সবচেয়ে উত্তম ব্যবস্থা—গেরুয়াধারণ। ইরান-তুরান-আরবিস্থানে দরবেশ সাজা। ইয়োরোপে এই ঐতিহ্যমূলক পরিপাটি ব্যবস্থা না থাকলেও অন্যান্য মুষ্টিযোগ আছে যার কৃপায় মোটামুটি কাজ চলে যায়। সেগুলোর কথা পরে হবে।

তবে এই সন্ন্যাসী বেশ ধারণ করার আগে একটুখানি ভেবে-চিন্তে নেওয়া দরকার। একটি ছোট উদাহরণ দেই।

আমি তখন বরদায়। বহু বৎসর আগেকার কথা। হঠাৎ সেখানে এক বঙ্গসন্তানের উদয়। ছোকরা এম এ পাস করে কি করে সেখানে একটা চাকুরী জুটিয়ে বসেছে—মাইনে সামান্যই, কষ্টে-শ্রেষ্ঠে দিন কেটে যায়।

ছোকরা আমাদের সঙ্গে মেলেমেশে বটে কিন্তু শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল পর্যন্ত তার পাত্তা পাওয়া যায় না—অথচ ঐ সময়টাতেই তো চাকুরেদের দহরম-মহরম, গাল-গল্প করা, বিশেষ করে যখন বিনয়তোষের বাড়িতে রবির দুপুরে ভূরি-ভোজনের জন্য তাবৎ বাঙালীর ঢালাও নেমন্তন্ন। অনুসন্ধান না করেই জানা গেল বাঁড়ুয্যে ছোকরার দু-পায়ে দুখানা এ্যাব্বড়া বড়া বড়া চক্কর। শনির দুপুরে আপিস ছুটি হতে না হ'তেই সে ছুট দেয় ইস্টিশান পানে। সেখানে কোনো একটা গাড়ি পেলেই হল। টিকিট মিন্-টিকিটে চললো সে ইঞ্জিনের এক চোখা দৃষ্টিতে সে যেদিকে ধায়।

পূর্বেই বলেছি, এহেন সৃষ্টি-ছাড়া কর্মের জন্য সন্ন্যাসী-বেশ

প্রশস্ততম। হিন্দু-মুসলমান টিকিট-চেকারের কথা বাদ দিন, সে যুগের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ছুঁদে চেকার পর্যন্ত মিন্-টিকিটের গেরুয়াকে ট্রেন থেকে নামাতো না—বিড়বিড় করতে আমিই একাধিক বার শুনেছি, 'গড্ ড্যাম হোলি ম্যান—নাথিং ডুইং।' অর্থাৎ 'ওটা খোদার খাসী, কিচ্ছুটি করার যো নেই।'

আমাদের বাঁড়ুয্যে ছোকরাটি অতিশয় চৌকশ তালেবর। দু'টি উইক্-এণ্ডের বাউণ্ডুলিপনা করতে না করতেই আবিষ্কার করে ফেললে এই হৃদয়-রঞ্জন তথ্যটি—সঙ্গে সঙ্গে তার পায়ের চক্কর দুটি টাইমপীসের ছেঁড়া স্প্রিং-এর মত ছিটকে তার পা দুটিকেও ছাড়িয়ে গেল। বিশেষ করে যেদিন খবব পেল, সৌরাষ্ট্রেব বীরমগাম ওয়াচওয়ান থেকে আরম্ভ করে ভাওনগর দ্বাবকাতীর্থ অবধি বহু ট্রেনে একটি ইস্পিশেল কামরা থাকে যার নাম 'মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্ট' ; গেরুয়া পবা থাকলেই সে কামরায় মিন-টিকিটে উঠতে দেয়। সেখানে নাকি সাধু-সন্ন্যাসীরা আপোসে নির্বিঘ্নে আত্মচিন্তা-ধর্মচিন্তা পরব্রহ্মে মনোনিবেশ করতে পারেন। তবে নেহাত বেলেল্লা নাস্তিকদের মুখে শুনেছি সেখানে নাকি বিশেষ এক ধোঁয়ার গন্ধ এমনই প্রচণ্ড যে কাগে বগে সেখান থেকে বাপ-বাপ করে পালায়—দুষ্টেরা আবো বাঁকা হাসি হেসে বলে আসলে নিরীহ প্যাসেঞ্জারদের ঐ কৈবল্য ধূম্রের উৎপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ঐ খয়রাতী মেণ্ডিকেণ্ট কম্পার্টমেণ্টের উৎপত্তি। কিন্তু আমাদের বাঁড়ুয্যে তার থোড়াই পরোয়া করে—আসলে সে খাস দর্জি-পাড়ার ছেলে, বাবা,—ছোকরা বয়েস থেকে বিস্তর ইটালিয়ান (অর্থাৎ ইঁটের উপর বসে) ছিলিম-ফাটানো দেখেছে, দুচার কাচ্চা যে নাকে ঢোকেনি সে-কথাও কসম খেয়ে অস্বীকার করতে সে নারাজ। হু আ ভূআ না করে বাঁড়ুয্যে তদ্দণ্ডেই ধুতিখানি গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে মাদ্রাজী প্যাটার্নে লুঙ্গিপানা করে পরলো, বাসন্তী রঙ করাতে গিয়ে গেরুয়াতে জাতান্তরিত তার একখানি উড়নি আগের থেকেই ছিল। 'ব্যোম ভোলানাথ' বলতে বলতে বাঁড়ুয্যে

চাপলো 'মেগ্নিকেন্ট কম্পার্টমেন্টে'। বাবাজী চলেছেন সোমনাথ দর্শনে!

আমাদের বাঁড়ুযো কিপ্‌টে নয়। মিন্‌-টিকিটে চড়ার পরও তার ট্যাকে ছুঁচোর নেত্য। তাই আহারাদিতেও তাকে হাত টেনে হাত বাড়াতে হত পয়সা দিতে। তাই ঐ ব্যাপারে রিট্রেঞ্চমেণ্ট করতে গিয়ে সে আবিষ্কার করলো আরেকটি তথ্য—পুরী তরকারী, দহি-বড়া শিঙাড়ার চেয়ে শিক-কাবাব ঢের সস্তা, পোষ্টাইও বটে। এক পেট পরোটা-শিক-কাবাব খেয়ে নিলে শুবো-শাম ত্রিযামা-যামিনী নিশ্চিন্তি।

'গোস্ত-রোটী কাবাব-রোটী' যেই না ফেরিওয়ালা দিয়েছে হাঁক অমনি বাঁড়ুয্যে তিন লম্ফে দরজার কাছে এসে তাকে দিল ডাক। লোকটা প্রথমে কেমন যেন হকচকিয়ে গেল।—আসতে চাইল না। বাঁড়ুয্যে ঘন ঘন ডাকে, 'আরে দেখতে নাহী পারতা হায়, হাম তুমকো ডাকতে ডাকতে গলা ফাটাতা হায়—' সে-হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা না বলে 'লোষ্ট্রভাষা' বলাই উচিত। এক একটি লব্‌জো যেন ইঁটের থান।

ফেরিওলা কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে হিন্দী গুজরাতীতে বুঝিয়ে বললে, 'সাধুজী এ তোমার খাওয়ার জিনিস নয়।' বাঁড়ুয্যে গেল চটে। সে কি এতই অগা যে জানে না, শিক-কাবাব কোন্‌ অখাদ্য চতুষ্পদ থেকে তৈরী হয়। তেড়ে বললে 'হাম ক্যা খাতা হায়, নাহী খাতা হায়, তোমার ক্যা ভেটকি-লোচন?' ফেরিওলা তর্ক না করে, —স্পষ্ট বোঝা গেল অনিচ্ছায়—কাবাব রুটি দিয়ে পয়সাগুলো না গুনেই ধামাতে ফেলে চলে গেল।

ট্রেন ছেড়েছে। বাঁড়ুয্যে কাবাব রুটি মুখে দিতে গিয়েছে—লক্ষ্য করেনি, কামরার থমথমে ভাবটা। এমন সময় দশটা হেঁড়ে গলায় এক সঙ্গে হুঙ্কার উঠলো, 'এই শালা, ক্যা খাতা হৈ?'

প্রথমটায় বাঁড়ুয্যে বুঝতে পারেনি। আস্তে আস্তে তার চৈতন্যোদয় হতে লাগল—সন্ন্যাসীদের প্রাণঘাতী চিৎকারের ফলে।

শালা পাষণ্ড, নাস্তিক। অখাদ্য খায়, ওদিকে ধরেছে গেরুয়া। চোর ডাকাত কিংবা খুনীও হতে পারে। ফেরার হয়ে ধরেছে ভেক। এই করেই তো সাধু-সন্ন্যাসীদের বদনাম হয়েছে, যে তাদের কেউ কেউ আসলে ফেরারী আসামী।'

বাঁড়ুয্যে কি করে বলে সে জানতো না, ওটা অখাদ্য। একে মাংস, তায়—। ওদিকে ওরা ফেরিওলাতে বাঁড়ুয্যেতে যে কথা কাটাকাটি হয়েছে সেটা যে ভালো করেই শুনেছে, তাও ওদের কথা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল।

ওদিকে সন্ন্যাসীরা এক বাক্যে স্থির করে ফেলেছে, এই নরপশুকে চলন্ত ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে এর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করানো হোক। দু একটা ষণ্ডা তার দিকে তখন এগিয়ে আসছে।

বাঁড়ুয্যের মনের অবস্থা কল্পনা করুন। চেন টানার ব্যবস্থা থাকলেও সেদিকেও দুশমনদের ভিড়। সে বিকল অবশ। এরকম অবশ্য-মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে কটা লোক ?

একজন তার দু বাহুতে হাত দিয়ে ধরতেই কম্পার্টমেণ্টের এক কোণ থেকে হুঙ্কার এল, 'ঠহ্রো।' সবাই সেদিকে তাকালে। এক অতি বৃদ্ধ সন্ন্যাসী উপরের দিকে হাত তুলেছেন। ইনি এতক্ষণ এদের আলোচনায় যোগ দেননি।

বললেন, 'সাধুরা সব শোনো। এঁর গায়ে হাত তুলো না। ইনি কি ধরনের সন্ন্যাসী তোমরা জান না। উনি যে দেশ থেকে এসেছেন সে দেশের এক জাতের সন্ন্যাসীকে সব-কিছু খেতে হয়, লজ্জা ঘৃণা ভয় ওঁদের ত্যাগ করতে হয়। শুধু ত্যাগ নয় সানন্দে গ্রহণ করতে হয়। ইনি সেই শ্রেণীর সন্ন্যাসী। তোমরা তো জানো না, সন্ন্যাসের গুরু বুদ্ধদেব শুয়োরের মাংস খেয়ে নির্বাণ লাভ করেছিলেন। এঁকে একদিন ঐ পর্যায়ে উঠতে হবে। মৃত্যু ভয় এঁর নেই। দেখলে না উনি এখন পর্যন্ত একটি শব্দ মাত্র করেননি। ঘৃণা এবং ভয় থেকে উনি মুক্ত হয়েছেন। বোধহয় একমাত্র লজ্জা-

জয়টি এখনো তাঁর হয়নি। তাই এখনো পরনে লজ্জাবরণ। সেও তিনি একদিন জয় করবেন।

তোমরা ওঁর গায়ে হাত দিয়ো না।'

কতখানি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর যুক্তিবাদের ফলে, কতখানি তার সৌম্য দর্শন শান্ত বচনের ফলে মারমুখো সন্ন্যাসীরা ঠাণ্ডা হ'ল বলা কঠিন।

বাঁড়ুয্যে সে যাত্রায় বেঁচে গেল।

দু-তিন স্টেশন পরই সব সন্ন্যাসী নেমে গেল ঐ বৃদ্ধ ছাড়া।

তখন তিনি বাঁড়ুয্যেকে হাতছানি দিয়ে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবুজী এ যাত্রায় ভগবানের দয়ায় বেঁচে গেছ, ভবিষ্যতে সাবধান হয়ো।'

* * *

সেই থেকে ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সন্ধান আমি প্রতি তীর্থেই করি। উনি যদি একবার আমার গৃহিণীকে বুঝিয়ে দেন, আমিও একটা অবধূত-টবধূত তাহলে ওর খাই-বয়নাক্কা-নথ ঝামটা থেকে নিষ্কৃতি পাই। দশটা মারমুখো সন্ন্যাসীকে ঠাণ্ডা করতে পারলেন আর ওকে পারবেন না? কি জানি!

* * *

ভবঘুরে সব দেশেই আছে কিন্তু শীত এলেই ইয়োরোপের ভবঘুরেদের সর্বনাশ। ঐ জমাট বরফের শীতে বাইরে শোওয়া অসম্ভব। যদি বা কেউ পার্কের বেঞ্চের উপরে খবর কাগজ পেতে (এই খবরের কাগজ সত্যি শরীরটাকে খুব গরম রাখে; হিমালয়ের চটিতে যদি দু'খানা কম্বলেও শীত না ভাঙে তবে কম্বলের উপর পা থেকে মাথা পর্যন্ত কয়েকখানা খবরের কাগজের শীট সন্তর্পণে বিছিয়ে নেবেন। আমি কোনো কোনো খানদানী ট্র্যাম্পকে বুকে পিঠে খবরের কাগজ জড়িয়ে তার উপর ছেঁড়া শার্ট পরতে দেখেছি) শোবার চেষ্টা করে তবে বেদরদ পুলিস এসে লাগায় হুনো। প্যারিসে তখন কেউ কেউ আশ্রয় নেয় নদীর কোনো একটা ব্রিজের তলায় শুকনো

ডাঙায়। সেখানেও সকালবেলা পুলিস আবিষ্কার করে শীতে জমে গিয়ে মরা ট্র্যাম্প। পাশে দু'একটা মরা চড়ুইও। গরমের আশায় মানুষের শরীরের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল। গর্কি না কার যেন লেখাতে পড়েছি, এক ট্র্যাম্প ছোকরাকে সমস্ত রাত জড়িয়ে ধরে একটি ট্র্যাম্প মেয়ে সমস্ত রাত কাটিয়ে যে যার পথে—কিংবা বিপথেও বলতে পাবেন—চলে গেল। (এদেশে বর্ষাকালে তাই বুদ্ধদেবও সন্ন্যাসীর সঙ্ঘে আশ্রয় নিতে আদেশ দিয়ে গেছেন।)

এই বিপথে কথাটার উপর আমি জোর দিতে চাই। গ্লোব-ট্রটার জীবটি আদপেই ভবঘুরে নয়—যদিও একটা শব্দ যেন আরেকটা শব্দের অনুবাদ। গ্লোব-ট্রটার সমুখ পানে এগিয়ে চলে, তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থল আছে। ভবঘুরে যেখানে খুশী দু চারদিন এমন কি দু চার মাসও স্বচ্ছন্দে কাটায়, এমন কি কোনো দয়াশীলের আশ্রয়ে সুখেও কাটায়। কিন্তু হঠাৎ একদিন বলা-নেই-কওয়া-নেই, হুট করে নেবে যায় রাস্তায়। কেন? কেউ জানে না। ওরা নিজেরাই জানে না। শুধু এইটুকু বলা যায়, সুখের নীড় তাদের বেশীদিন সয় না—নামে দুঃখের পথে; আবার দুঃখের পথে চলতে চলতে সন্ধান করে একটু সুখের আশ্রয়। দুটোই তার চাই, আর কোনোটাই তার চাইনে। এ বড় সৃষ্টিছাড়া দ্বন্দ্ব সৃষ্টিছাড়াদের।

যাদের ভিতরে গোপনে চুরি করার রোগ ঘাপটি মেরে বসে আছে—ওটাকে সত্যই দৈহিক রোগের মত মানসিক রোগ ব'লে ধরে নেওয়া হয়েছে বলে এটার নাম ক্লেপ্টোমেনিয়া—তাদের জন্য আমাদের শাস্ত্রকাররা বৎসরে একদিন চুরি করার—তাও ফলমূল মাত্র —অনুমতি দিয়েছেন। ওটা যেন এক্‌জস্ট পাইপ। ঠিক তেমনি হোলির দিন একটুখানি বেএক্তেয়ার হওয়ার অনুমতি কর্তারা আমাদের দিয়েছেন। এটাও অন্য আরেক ধরনের এক্‌জস্ট পাইপ।

জর্মন জাতটা একটু চিন্তাশীল। তারা স্থির করলে এই বাউণ্ডুলে-পনা যাদের রক্তে ঘাপটি মেরে বসে আছে—এদের নাম ভাণ্ডার-

ফ্যোগোল অর্থাৎ ওয়াণ্ডারিং বার্ডজ অর্থাৎ উড়ুক্কু পাখি—তাদের জন্য জায়গায় জায়গায় অতিশয় সস্তায় রেস্ট হাউস করে দাও, যেখানে তারা নিজে রেঁধে খেতে পারবে, যদি অতি সস্তায় তৈয়ারী খানা খায় তবে বাসন বর্তন মেজে দিতে হবে, যদি ফ্রী বালিশের ওয়াড় বিছানার চাদর চায় তবে সেগুলো কিংবা আগের রাত্রে অন্য কারোর ব্যবহার-করা বাসি ওয়াড়-চাদর কেচে দিতে হবে যাতে করে, ইচ্ছে করলে, সে অতি ভোরেই ফের রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে পারে। ওদের রান্না-ঘরে নিজের আলুমালু সেদ্ধ করে খেলে আর চাদর ওয়াড় না চাইলে রাত্রি-বাস একদম ফ্রী।

উড়ুক্কু পাখিরা অনেক সময় দল বেঁধে বেরোয়; সঙ্গে রান্নাবান্নার জিনিস এবং বিশেষ করে বাজনার যন্ত্র—ৎসী হারমনিকা (হাত অর্গিন), ব্যাঞ্জো, মাণ্ডলিন। ঐ সব রেস্ট হাউসের কমন রুমে তারা গাওনা-বাজনা নাচা-নাচি করে সমস্ত রাত কাটাতো। অনেকেই শনির দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোমের সকালে বাড়ি ফিরত। কেউ-কেউ পুরো গরমের ছুটি, কেউ-কেউ দীর্ঘতর অনির্দিষ্টকাল।

এ-সব আমার শোনা কথা। নিজের অভিজ্ঞতা পরে বলবো।

রাস্তার ট্রাম্পকে অনেকেই লিফ্‌ট্‌ দেয়। জোড়া পাখি যদি হয় তবে লিফ্‌ট্‌ পাওয়া আরো সোজা, একটু কৌশল করলেই। ছেলেটা দাঁড়ায় গাছের আড়ালে। মেয়েটা ফ্রক হাঁটু পর্যন্ত তু'লে গার্টার ফিট করার ভান করে সুডৌল পাটি দেখায়। রসিক নটবর গাড়ি থামিয়ে মধুর হেসে দরজা খোলেন। ছোকরা তখন আড়াল থেকে আস্তে আস্তে এসে পিছনে দাঁড়ায়, নটবর তখন ব্যাক-আউট করেন কি করে? করলেও দৈবাৎ। যে উড়ুক্কু পক্ষিণী আমাকে গল্পটি বলেছিল তার পাটি ছিল সত্যিই সুন্দর। তা সে যাকগে।

অনেকেই আবার লিফ্‌ট্‌ দিতে ডরায়। তাদের বিরুদ্ধে নিম্নের গল্পটি প্রচলিত :—

কুখ্যাত ডার্টমূর জেলের সামনে সদ্য খালাসপ্রাপ্ত দুজন কয়েদী

লিফ্‌টের জন্য হাত তুলছে। যে ভদ্রলোক মোটর দাঁড় করালেন তিনি কাছে এসে যখন বুঝতে পারলেন এরা কয়েদী তখন গড়িমসি করতে লাগলেন। তারা অনেক কাকুতি-মিনতি করে বোঝালে তারা সামান্য চোর—খুনীটুনী নয়। সামনের টাউনে পৌঁছে দিলেই বাস ধরে রাতারাতি বাড়ি পৌঁছতে পারবে। ভদ্রলোক অনেকটা অনিচ্ছায়ই রাজী হলেন। পরের টাউনে ভদ্রলোকেরও বাড়ি। পরের টাউনে পৌঁছতেই লাইটিং টাইম হয়ে গিয়েছে। ওদিকে ওঁর হেডলাইট ছিল খারাপ। পড়লেন ধরা। পুলিস ফুটবোর্ডে পা রেখে নম্বর টুকে হিপ পকেটে নোটবুকখানা রেখে দিয়ে চলে গেল। ভদ্রলোক আপসোস করে বললেন, তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে যে তিন মিনিট বাজে খরচা হ'ল সেটা না করলে এতক্ষণ আমি বাড়ি পৌঁছে যেতুম। এখন পুলিস কোর্টে আমার জেরবার হয়ে যাবে। লোকে কি আর সাধে বলে কারো উপকার করতে নেই। দুই খালাস পাওয়া কয়েদী হাসতে হাসতে গাড়ি থেকে নামার সময় বললে, 'আপনার কিছু ভয় নেই, হুজুর, আপনার নামে কোনো সমন আসবে না। এই নিন সেই পুলিসের নোটবুক—যাতে আপনার গাড়ির নম্বর টোকা ছিল। আমরা পুলিসের পকেট তখনই পিক করেছি। আসলে পকেট মেরেই ধরা পড়াতে আমাদের জেল হয়েছিল। আপনি আমাদের উপকার করতে গিয়ে বিপদে পড়বেন, এটা আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি কি প্রকারে বলুন।'

আমি নিজে কখনো খানদানী বাউণ্ডুলে ব'নে বাড়ি থেকে বেরোইনি; তবে হেঁটে সাইক্লে, আধা-বোটে—অর্থাৎ কোনো প্রকারের রাহা খরচা না করে হাইকিং করেছি বিস্তর।

আমি তখন রাইন নদীর পারে বন্ শহরে বাস করি। রাইনের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার জন্য পৃথিবীর লোক সেখানে প্লেজার স্টীমারে করে উজান-ভাটা করে। আমিও একবার করার পর আমার মনে বাসনা জাগলো ঐ অঞ্চলেই হাইক্ করে রাইনতো দেখবো দেখবোই,

সঙ্গে সঙ্গে ঐ এলাকার গিরি-পর্বত, উপত্যকার ক্ষেত-খামার, গ্রামাঞ্চলের বাড়ি ঘরদোর, নিরিবিলি গ্রাম্যজীবন সব-কিছুই দেখে নেব। আর যদি রাইন অঞ্চল ভালো না লাগে তবে চলে যাব যেদিক খুশী।

আমার ল্যাণ্ডলেডিই আমাকে রাস্তা-দুরুস্ত করে দিলে। মাথায় প্রকাণ্ড ঘেরের ছাতা—হ্যাট। পশমের পুরু শার্টের উপর চামড়ার কোট। চামড়ার শার্ট। সাইক্লোমোজা। ভারী বুট জুতো।

শব্দার্থে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা একটি হেভার-স্যাক। তার ভিতরে রান্নার সরঞ্জাম, অর্থাৎ অতি, অতি হাল্কা এবং পাতলা কিন্তু বেশ শক্ত এলুমিনিয়ামের সসপেন জাতীয় বস্তু, প্লেট, চামচে—ছুরি-কাঁটা নিইনি—স্পিরিট স্টোভ এবং অত্যন্ত ছোট সাইজের বলে ডুবার মাত্র হাঁড়ি চড়ানো যায়—, কয়েক গোলা চর্বি, কিঞ্চিৎ মাখন, নুন-লঙ্কা আর একটি রবারের বালিশ—ফুঁ দিয়ে ফোলানো যায়।

আর বিশেষ কিছু ছিল বলে মনে পড়ছে না। এসবে আমার খরচা হয়েছিল অতি সামন্যই, কারণ বাড়ির একাধিক লোক এসব বস্তু একাধিক বার ব্যবহার করেছেন। এস্তেক কোট পাতলুনে একাধিক চামড়ার তালি! ল্যাণ্ড-লেডি বুঝিয়ে বললে, উকীলের গাউনের মত এ-সব বস্তু যত পুরনো হয় ততই সে খানদানী ট্র্যাম্প!

পকেটে হাইনের 'বুখ ড্যার লীডার'—কবিতার বই। কবি হাইনে বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় এ বইয়ের কবিতাগুলো লিখেছিলেন। এতে রাইন নদী বারবার আত্মপ্রকাশ করেছে।

রবির অতি ভোরে গির্জার প্রথম ম্যাসে হাজিরা দিয়ে রাস্তার নামলুম।

(২)

একটা কোঁৎকা ছাড়া হাইকিঙে বেরোতে নেই। অবশ্য সর্বক্ষণ সদর রাস্তার উপর দিয়ে চললে তার বড় প্রয়োজন হয় না, কিন্তু সদর রাস্তার দুপাশে আলুক্ষেত, আপেল বাগান থাকে না, লোকজন যারা থাকে তারাও ট্র্যাম্প ভিখিরি পছন্দ করে না। পিঠের ব্যাগটা খালি হয়ে গেলে সেটা বিন্-খরচায় ভরে নিতে হলে অজ পাড়াগাঁই প্রশস্ততম।

কিন্তু যত প্রচণ্ড শিক্ষিত দেশই হোক না কেন পাড়াগাঁয়ে দু' একটা বদ-মেজাজী কুকুর থাকবেই। এবং তারা পয়লা নম্বরের স্নব্। ছিমছাম ফিটফাট স্যুট পরে গটগট করে চলে যান—কিচ্ছুটি বলবে না। কিন্তু আপনি বেরিয়েছেন হাইকিঙে—যতই ফিটফাট হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন না কেন, লঙ্ঝড় কাক বক তাড়ানোর স্কোয়ার-ক্রো বনে যেতে আপনার দুদিনও লাগবে না। দু' দিন কেন, গাছ-তলায় এক রাত কাটানোর পর সকাল বেলাই স্যুটমুটের যে চেহারা হয় তার মিল অনেকটা ভ্যাগাবণ্ড চার্লিরই মত, এবং ঐ স্নব কুকুর-গুলো তখন ভাবে, আপনাকে ভগবান নির্মাণ করেছেন নিছক তাদের ডিনার লাঞ্চের মাংস জোগাবার জন্য—সিঙ্গিকে যেমন হরিণ দিয়েছেন, বাঘকে যে রকম শুয়ার দিয়েছেন। পেছন থেকে হঠাৎ কামড় মেরে আপনার পায়ের ডিম কি করে সরানো যায় সেই তাদের একমাত্র উচ্চাভিলাষ। ওটাতে আপনারও যে কোনো প্রয়োজন থাকতে পারে সে বিষয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

আমার ল্যাণ্ড-লেডি হাতে লাঠি তুলে দিতে দিতে বললে, এক জর্মন গিয়েছে ঘোর শীতকালে স্পেনে। স্পেনের গ্রামাঞ্চল যে বিশ্ব-সারমেয়ের ইউনাইটেড নেশন সেটা ভদ্রলোক জানতেন না। তারই

গণ্ডা তিনেক তাঁকে দিয়েছে হুড়ো। ভদ্রলোক আর কিছু না পেয়ে রাস্তা থেকে পাথর কুড়োতে গিয়ে দেখেন সেগুলো জমিতে জোর সেঁটে রয়েছে—আসল হয়েছে কি শীতে জল জমে বরফের ভিতর সেগুলো মোক্ষম আটকে গেছে। ভদ্রলোক খাঁটি গ্লোব-ট্রটারের মত আত্মচিন্তা করলেন, 'অদ্ভুত দেশ! কুকুরগুলোকে এরা রাস্তায় ছেড়ে দেয়, আর পাথরগুলোকে চেন্ দিয়ে বেঁধে রাখে।'

ল্যাণ্ড-লেডিকে বলতে হল না—আমি বিলক্ষণ জানতুম, তদুপরি আমার শ্যাম-মনোহর বর্ণটি অষ্টাবক্র স্কন্ধ-কটি—ভদ্রাভদ্র যে কোনো সারমেয় সন্তানই এই ভিনদেশী চীজটিকে তাড়া লাগানো একাধারে কর্তব্যকর্ম সম্পাদন এবং আয়বর্ধন রূপে ধরে নেবে—লক্ষ্য করেননি চীনেম্যান আমাদের গাঁয়ে ঢুকলে কি হয়।

কোঁৎকাটা ঠুকতে ঠুকতে শহর ছেড়ে মেঠো পথে নামলুম।

খৃষ্টান দেশে রববারে ক্ষেতখামারের কাজও ক্ষান্ত থাকে। পথের দুধারের ফসল ক্ষেতে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। রাস্তায়ও মাত্র দু'একটি লোকের সঙ্গে অনেকক্ষণ চলার পর দেখা হয়। তারাও গ্রামের লোক বলে হ্যাট তুলে গুটেনটাখ্ বা গুটেন মর্গেন (শুভদিন বা শুভ দিবস) বলে আমাকে অভিবাদন জানায়। বিহার মধ্যপ্রদেশের গ্রামাঞ্চলেও ঠিক এই রকম অপরিচিত জনকেও 'রাম রাম' বলে অভিবাদন করার পদ্ধতি আছে। কাবুলে তারও বাড়া। একবার আমি শহরের বাইরের উপত্যকায় বেড়াতে গিয়েছিলুম। রাস্তা প্রায় জনমানবহীন। বিরাট শিলওয়ার এবং বিরাটতর পাগড়ী-পরা মাত্র একটি কাবুলী ধীরে মন্থরে চলেছে—গ্রামের লোক শহুরেদের তুলনায় হাঁটে অতি মন্থর-গমনে এবং তারো চেয়ে মন্দ গতিতে চলে যারা একদম পাহাড়ের উপর থাকে। তাই কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি তাকে ধরে ফেললুম। ঘাড় ফিরিয়ে অলস কৌতূহলে আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভালো তো? কুশল তো?' শুধিয়েই আমার দিকে এক গুচ্ছ স্যালাড পাতা এগিয়ে দিলে। এস্থলে এটিকেট কি বলে জানিনে—আমি একটি পাতা

তুলে নিলুম। তখন এগিয়ে দিলে বাঁ হাতের পাতার ঠোঙাটি। সেটাতে দেখি হলদে-লালচে রঙের ঘন কি পদার্থ। আমি বোকার মত তাকিয়ে আছি দেখে সে নিজে একখানা স্যালাড পাতা নিয়ে ঐ তরল পদার্থে গুত্তা মেরে মুখে পুরে চিবোতে লাগল। আমিও করলুম। দেখি, জিনিসটা মধু এবং অত্যুত্তম মধু। ঐ প্রথম শিখলুম, কাবুলীরা তেল-নুন-সিরকা দিয়ে স্যালাড পাতা খায় না, খায় মধু দিয়ে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়, মোদ্দা কথা দেহাতী কাবুলী যদি কিছু খেতেখেতে রাস্তা দিয়ে চলে তবে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে তার হিস্যা এগিয়ে দেবেই দেবে। এবং স্ট্রিক্‌ট্‌লি ব্রাদারলি ডিভিজন্‌ —অর্থাৎ আমার একখানা পাতা চিবানো শেষ হতে না হতেই আরেকখানা পাতা এবং 'মধুভাণ্ড' এগিয়ে দেয়। পরে গ্রামে ঢোকা মাত্রই সে আমাকে এক চায়ের দোকানে টেনে নিয়ে যায় এবং দাম দেবার জন্য আখেরে বিস্তর ধস্তাধস্তি করে। কিন্তু থাক সে কথা— এটা আছে 'কাবুলে ভবঘুরেমি' অনুচ্ছেদে।

এস্থলে স্থির করলুম, অপরিচিতকেও নমস্কার জানানো যখন এ-দেশে রেওয়াজ তবে এবার থেকে আমিই করবো।

আধঘণ্টাটাক পরে দেখি এগিয়ে আসছে একজন। বয়সে আমার চেয়ে বড়ও বটে। ও মোকা পাবার পূর্বেই আমি বেশ চেঁচিয়ে বললুম 'গ্র্যু স্‌গট্‌!'

এস্থলে নব জর্মন শিক্ষার্থীদের বলে রাখি, জর্মনভাষী জর্মন এবং সুইস সচরাচর 'গুটেন টাখ গুড্‌ডে', শুভদিবস ইত্যাদি বলে থাকে, কারণ এরা বড্ড সেকুলারাইজড (ধর্মনিরপেক্ষ) হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে অস্ট্রিয়াবাসী জর্মনভাষীগণের অনেকেই এখনো 'গ্র্যু স্‌গট্‌' —'ভগবানের আশীর্বাদ' বলে থাকে। এদেশের মুসলমানরা আল্লাকে স্মরণ করেই 'সালাম' বলেন, হিন্দুরা 'রাম রাম' এবং বিদায় নেবার বেলা গুজরাতে 'জয় জয়! জয় শিব, জয় শঙ্কর।'

স্পষ্ট বোঝা গেল লোকটা 'গ্র্যু স্‌গটের' জন্য আদপেই তৈরী ছিল

না। 'গুটেনটাখ, গুটেনটাখ' বলে শেষটায় বার কয়েক 'গ্র্যু সগট্' বলে সামনে দাঁড়াল। শুধালে, 'কোথায় যাচ্ছ?'

ইংলণ্ডে গ্রামাঞ্চলের এটিকেট জানিনে। সেখানেও বোধহয় শহুরেদের কড়াক্কড়ি নেই।

বললুম, 'বিশেষ কোথাও যাচ্ছিনে। ঐ সামনের গ্রামটায় দুপুরবেলা একটু জিরোবো। রাতটা কাটাবো, তারপরের কোনো একটা গ্রামে, কিংবা গাছতলায়।'

বললে, 'আমি যাচ্ছি শহরে!' তার পর বললে, 'চলো না, ঐ গাছতলায় একটু জিরোন যাক।' আমি বললুম, 'বিলক্ষণ'। ভবঘুরেমির ঐ একটা ডাঙর সুবিধে। না হয় কেটেই গেল ঐ গাছ-তলাটায় ঘণ্টা কয়েক—যদিও ওটা তেঁতুল গাছ নয় এবং ন'জন সুজন তো এখনো দেখতে পাচ্ছিনে।

চতুর্দিক নির্জন নিস্তব্ধ। ইয়োরোপেও মধ্যদিন আসন্ন হলে পাখি গান বন্ধ করে। শুধু দূর অতি দূর থেকে গির্জায় ঘণ্টা অনেকক্ষণ ধরে বেজে যাচ্ছে। রবির দুপুরের ঐ শেষ আরতি—হাই ম্যাস—তাই অনেকক্ষণ ধরে ঘণ্টা বেজেই চলেছে। ওরই ভেসে আসা শব্দের সঙ্গে আমার মনও ভেসে চলেছে দূর দূরান্তে—ঐ বহুদূরে যেখানে দেখা যাচ্ছে ভিনাস পাহাড়ের চুড়োর উপর গাছের ডগাগুলো।

বললে, 'আসলে পাইপটা অনেকক্ষণ টানিনি; তাই এই জিরোনো।' তারপর শুধালে 'তোমার দেশ কোথায়?' আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার (ভারতীয়)।' এমনি চমক খেল যে তার হ্যাটটা তিন ইঞ্চি কাৎ হয়ে গেল। তোৎলালে 'ইণ্ডিয়ানার'?

'ইণ্ডার' অর্থাৎ 'ইণ্ডিয়ান', আর 'ইণ্ডিয়ানার' অর্থ 'রেড্ ইণ্ডিয়ান'। দেহাতীদের কথা বাদ দিন, শহরে অর্ধ-শিক্ষিতেরাও এ দুটোতে আকছারই ঘুলিয়ে ফেলে। অনেক রকম করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করলুম, আমি কোন্ দেশের লোক। শেষ

পর্যন্ত সে বুঝতে পেরেছিল কি না জানিনে তবে তার বিস্ময় যে চরমে পৌঁচেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর বার বার শুধু মাথা নাড়ে আর বলে, 'বিপদে ফেললে, বড় বিপদে ফেললে।'

আমি শুধালুম, 'কিসের বিপদ?'

'কত ভবঘুরে, বাউণ্ডুলে কত দেশ-দেশান্তরে যাচ্ছে—আমার তাতে কি। কিন্তু তুমি অত দূর দেশের লোক, আমার গাঁয়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ, আমার সঙ্গে আলাপ হল আর তোমাকে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে পারলুম না—এতে দুঃখ হয় না আমার?'

তারপর মরিয়া হয়ে বললে, 'আসলে কি জানো, আমার স্ত্রী একটি জাঁতিকল। দুনিয়ার লোকের হাড় গুঁড়িয়ে দেওয়াই ওঁর স্বভাব। না হলে তোমাকে বলতুম, আমার বাড়িতে বিকেল অবধি জিরিয়ে নিতে—আমিও ফিরে আসতুম।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কত লোক ইয়ার-দোস্তকে দাওয়াৎ করে খাওয়ায়, গাল-গল্প করে, আমার কপালে সেটি নেই।'

আমি তাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বললুম তার সহৃদয়তাই আমাকে যথেষ্ট মুগ্ধ করেছে, যদি সম্ভব হয় তবে ফেরার মুখে তার খবর নেব।

পুনরায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'কিছু মনে করো না, কিন্তু ভব-ঘুরেদের কি আর কথা রাখবার উপায় আছে? আমার নামটা কিন্তু মনে রেখো—টেরমের।'

আমি বললুম 'সে কি! আমি তো ফের বন্ শহরে ফিরে যাবো। এই নাও আমার ঠিকানা। সেখানে আমার খবর নিয়ো। দুজনাতে ফুর্তি করা যাবে।'

খুশী হয়ে উঠলো। বললে, 'বড্ডই জরুরী কাজ তাই। উকিল বসে আছে, এই রববারেও, আমার জন্যে। টাকাটা না দিলে সোমবার দিন কিস্তি খেলাপ হবে।'

আমি বললুম, 'ভগবান তোমার সঙ্গে থাকুন।' বললে, 'যতদিন না আবার দেখা হয়।'

দশ পা এগিয়েছি কি না, এমন সময় শুনি পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলছে, 'ঐ সামনের মোড় নিতেই দেখতে পাবে ডানদিকে এক-পাল ভেড়া চরছে। ওখানে কিন্তু দাঁড়িয়ো না। ভেড়াগুলোকে সামলায় এক দজ্জাল আলসেশিয়ান কুকুর। ওর মনে যদি সন্দেহ হয়, তোমার কোনো কুমতলব আছে তবে বড় বিপদ হবে।'

কথাটা আমার জানা ছিল্ল, কিন্তু স্মরণ ছিল না। বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ।'

(৩)

ইউরোপ তখনো প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এর বর্ণনা সে মহাদেশের কবি, চিত্রকার, বস্তুত চিন্তাশীল তথা দরদী ব্যক্তি মাত্রেরই দেওয়া সত্ত্বেও বলতে হয়, না দেখলে তার আংশিক জ্ঞানও হয় না। তুলনা দিয়ে এদেশের ভাষায় বলা যেতে পারে, বন্যা ও ভূমিকম্পের মার যাঁরা দেখেছেন তাঁরাই জানেন এর জের দেশকে কতদিন ধরে টানতে হয়।

মোড় নিতেই দেখি, বাঁ দিকের ক্ষেতের ভিতর দিয়ে নাসপাতি-ভর্তি ঠেলা গাড়ি ঠেলতে ঠেলতে রাজ-আল ধরে আসছে একটি বয়স্ক লোক। সর্বপ্রথমই চোখে পড়ল, তার ডান হাতখানা কনুই অবধি নেই। হাতের আস্তিন ভাঁজ করে ঘাড়ের সঙ্গে পিন করা। বড রাস্তায় সে উঠলো ঠিক আমি যেখানে পৌঁচেছি সেখানেই। আমি প্রথমটায় 'গ্র্যু স্গট্' বলে তার অনুমতির অপেক্ষা না করেই গাড়িটায় এক হাত দিয়ে ঠেলতে লাগলুম। এ অভিবাদনে লোকটি প্রথম চাষার মত মোটেই হকচকালো না, এবং প্রত্যুত্তরে 'গ্র্যু স্গট্' বলে আর পাঁচজনেরই মত 'গুটেন টাখ'—'সুদিবস' জানালে। তারপর বলল, 'ও গাড়ি আমি একাই ঠেলতে পারি। নাসপাতিগুলোর প্রতি তোমার যদি লোভ হয়ে থাকে তবে অত হ্যাঙ্গামা পোহাতে হবে না—যত ইচ্ছে তুলে নাও।' আমি এই অন্যায় অপবাদে চটিনি—পেলুম গভীর লজ্জা। কী যে বলবো ঠিক করার পূর্বেই সে বললে, 'হাত না দিলেও দিতুম।' আমি তখন মোকা পেয়ে বললুম, 'নাসপাতি খেতে আমি ভালোবাসি নিশ্চয়ই, এবং তোমারগুলো যে অসাধারণ সরেস সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু ঠেলা দেবার সময় আমার মনে কোনো মতলব ছিল না, এবং তুমিও যে স্বচ্ছন্দে ছোট

রাস্তা থেকে বড় রাস্তার উঁচুতে গাড়িটাকে ঠেলে তুললে সেও আমি লক্ষ্য করেছি। আমি হাত দিয়েছিলুম এমনি। পাশাপাশি যাচ্ছি, কথা বলতে বলতে যাবো, তখন দুজনাই যে একই কাজ করতে করতে যাবো সেই তো স্বাভাবিক—এতে সাহায্য লোভ কোনো কিছুরই কথা ওঠে না।' চাষা হেসে বললে, 'তোমার রসবোধ নেই। আর তুমি জানো না, এবারে নাসপাতি এত অজস্র একই সঙ্গে পেকেছে যে এখন বাজারে এর দর অতি অল্পই। এই সামনের গ্রামগুলোর ভিতর দিয়ে যখন যাবে তখন দেখতে পাবে গাছতলায় নাসপাতি পড়ে আছে—কুড়িয়ে নিয়ে যাবার লোক নেই। যত ইচ্ছে খাও, কেউ কিছু বলবে না।' আমি বললুম, 'আমাদের দেশেও এই রেওয়াজ। কোথায়, কোন দেশ, ইণ্ডিয়ান আর রেড-ইণ্ডিয়ানে পুনরায় সেই গুবলেট, তারপর আশ-কথা পাশ-কথা সেরে সর্বশেষে নিজেই বললে, তার হাতখানা গেছে গত যুদ্ধে। হেসে বললে, 'লোকে বলে, তারা করুণার পাত্র হতে চায় না ; আমার কিন্তু তাতে কোনো আপত্তি নেই। হাত গিয়ে কত সুবিধে হয়েছে বলবো। গেরস্তালীর কোনো কিছু করতে গেলে বউ বেটি হা হা করে ঠেকায়, যদিও আমি এক হাত দিয়েই দুনিয়ার চোদ্দ আনা কাজ করতে পারি। চাষ বাস, ফলের ব্যবসা, বাড়ি মেরামতী সবই তো করে যাচ্ছি—যদিও মেয়ে-জামাই ঠ্যাকাবার চেষ্টা করেছিল এবং শেষটায় করতে দিলে, হয়তো এই ভেবে যে কিছু না করতে পেলে আমি হন্যে হয়ে যাব।'

আমি বললুম, 'তোমরা তো খৃষ্টান ; তোমাদের না রববারে কাজ করা মানা।'

লোকটা উত্তর না দিয়ে হকচকিয়ে শুধোলে, 'তুমি খৃষ্টান নও ?'

—'না।'

'তবে কি ?'

'হীদেন'।

আমি জানতুম, পৃথিবীর খৃষ্টানদের নিরানুব্বই নয়া পয়সা বিশ্বাস করে, অখৃষ্টান মাত্রই হীদেন। তা সে মুসলমান হোক আর বণ্টুই হোক। নিতান্ত ইহুদীদের বেলা হয়তো কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, অবশ্য সেটা পুষিয়ে নেয় তাদের বেধড়ক ঠেঙিয়ে। তাই ইচ্ছে করেই বললুম, হীদেন।

লোকটা অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করে বললে, 'আমি গত যুদ্ধে ঈশ্বরকে হারিয়েছি। তবে কি আমিও হীদেন?' নিজের মনে যেন নিজেকেই শুধোলে।

আমি বললুম, 'আমি তো পরমেশ্বরে বিশ্বাস করি।'

এবারে সে স্তম্ভিত। এবং শব্দার্থে। কারণ গাড়ি ঠেলা বন্ধ করে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকালে। শেষটায় বললে, 'এটা কিন্তু আমাকে সোজা করে নিতে হবে। আমাদের পাদ্রী তো বলে, তোমরা নাকি গাছ, জল এই সব পুজো করো, পাথরের সামনে মানুষ বলি দাও।'

আমি বললুম, 'কোনো কোনো হীদেন দেয়, আমরা দিনে। আমি বিশ্বাস করি, ঈশ্বরকে ভক্তি দিলেই যথেষ্ট।'

বোকার মত তাকিয়ে বললে, 'তবে তো তুমি খৃষ্টান! আমাকে সব-কিছু বুঝিয়ে বলো।'

আমি বললুম, 'থাক। ফেরার সময় দেখা হলে হবে।'

তাড়াতাড়ি বললে, 'সরি, সরি। তুমি বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। ঐ তো সামনে গ্রাম। আমার বাড়িতে একটু জিরিয়ে যাবে?'

আমি টেরমেরের স্মরণে শুধালুম, 'তোমার বউ বুঝি টেরমেরের বউয়ের মত খাণ্ডার নয়?

সে তো অবাক। শুধোলে 'ওকে তুমি চিনলে কি করে?' সব-কিছু খুলে বললুম। ভারী ফুর্তি অনুভব করে বললে, 'টেরমের একটু দিল-দরিয়া গোছ লোক আর তার বউ একটু হিসেবী—এই যা। আব

এ-সব ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করলেই চিন্তা বাড়ে। যুদ্ধের সময়, আমার এক জর্মনের সঙ্গে আলাপ হয়—সে বুলগেরিয়াতে, বিয়ে করে বসবাস করছিল। তিন বছর সুখে কাটাবার পর একদিন তার স্ত্রীর এক বান্ধবী তাকে নির্জনে পেয়ে শুধোলে, "তুমি তোমার বউকে ভালোবাসো না কেন—অমন লক্ষ্মী মেয়ে।" সে তো অবাক। শুধোলে, "কে বললে? কি করে জানলে?" বান্ধবী বললে "তোমার বউ বলেছে, তুমি তাকে তিন বছরের ভিতর একদিনও ঠাঙাওনি!" শোনো কথা!'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'আমিও তো বুঝতে পারছিনে।'

সে বললে, 'আমিও বুঝতে পারিনি, প্রথমটায় ঐ জর্মন স্বামীও বুঝতে পারেনি। পরে জানা গেল, মেয়েটা বলতে চায়, এই তিন বছর নিশ্চয়ই সে কোনো না কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে দু'একটি হাসিঠাট্টা করেছে, স্বামী দেখেছে, কিন্তু পরে ঠ্যাঙায়নি। তার অর্থ, স্বামী তাকে কোনো মূল্যই দেয় না। সে যদি কাল কোনো পর-পুরুষের সঙ্গে পালিয়ে যায়, তবে স্বামী কোনো শোক করবে না, নিশ্চিন্ত মনে আরেকটা নয়া শাদী করবে। ভালবাসলে ওকে হারাবার ভয়ে নিশ্চয়ই ওকে ঠেঙিয়ে সোজা রাখতো।'

আমি বললুম, 'এতো বড়ো অদ্ভুত যুক্তি!'

'আমিও তাই বলি। কিন্তু ঐ করে বুলগেরিয়া চলছে। আর এদেশে বউকে কড়া কথা বলেছে কি সে চললো ডিভোর্সের জন্য! তাই তো তোমায় বললুম, ওসব নিয়ে বড্ড বেশী ভাবতে নেই। লড়াইয়ে বহু দেশের জাত-বেজাতের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে। অনেক দেখেছি। অনেক শিখেছি।'

আমার মনে পড়ল ওরই দেশবাসী রেমার্কের 'পশ্চিম রণাঙ্গন নিশ্চুপ' বইখানার কথা। সেখানে তো সব কটা সেপাই বাড়ি ফিরেছিল—অর্থাৎ যে কটা আদপেই ফিরেছিল—সর্বসত্তা তিক্ততায় নিমজ্জিত করে। আদর্শবাদ গেছে, ন্যায়-অন্যায়-বোধ গেছে; যেটুকু আছে সে শুধু যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অহরহ মৃত্যুর সম্মুখীন

হয়েছে তাদের জন্য। দেশের জন্য আত্মদান, জাতির উন্নতির জন্য সর্বস্ব ত্যাগ, ফ্রান্সকে পরাজিত করার জন্য জীবন-দান—এসব বললে মারমুখো হয়ে বেআইনী পিস্তল নিয়ে তাড়া লাগায়।

নাসপাতিওলাকে শুধোতে সে বললে সে বইটই পড়ে না। খবরের কাগজ পড়ে বাজার দর জানবার জন্য, আর নিতান্তই যদি কোনো রগরগে খুন কিংবা কেলেঙ্কারী কেচ্ছার বয়ান থাকে। তবে হ্যাঁ, ওর মনে পড়ছে ফিল্মটা নাকি জর্মনীতে বারণ করে দেওয়া হয়েছিল—ওব মেয়ের মুখে শোনা। আমি শুধালুম, 'ছবিটা দেখে ছেলেছোকরাদের লড়াইয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা হবে বলে?' বললে, 'না, ওতে নাকি জর্মনদের বড় বর্বররূপে দেখানো হয়েছে বলে।' তখন আমার মনে পড়ল, ফ্রান্সেও দেখাবার সময় যে অংশে ফরাসী নারীরা ক্ষুধার তাড়ায় জর্মন সেপাইদের কাছে রুটির জন্য দেহ বিক্রয় করার ইঙ্গিত আছে সেটা কেটে দেওয়া হয়।

অনেকক্ষণ দুজনাই চুপচাপ। নাসপাতিওলা ভাবছে। হঠাৎ বললে, 'পিছন পানে তাকিয়ে আর লাভ কি? যারা মরেছে তারা গেছে। যারা পাগল হয়ে গিয়েছে, যাদের মুখ এমনই বিকৃত হয়েছে যে দেখলে মানুষ ভয় পায়, যাদের হাত পা গিয়ে অচল হয়ে আছে নিছক মাংসপিণ্ডবৎ, তাদের বড় বড় হাসপাতালে লুকিয়ে রাখা হয়েছে; আর আত্মীয়স্বজনদের বলা হয়েছে তারা মারা গিয়েছে— এরাও নাকি ফিরে যেতে চায় না। আর আমার হাল তো দেখছই।

আমাদের গ্রামের সব কিছুই থিতিয়ে যাওয়ার পর একটা ট্র্যাজেডির দিকে সক্কলেরই নজর গেল। একটা ছেলে গ্রামে ফিরে এসে শোনে, তার অবর্তমানে তার বাগদত্তা মেয়েটি পরপুরুষের সঙ্গে প্রণয় করেছিল। এতে আর নূতন কি? লড়াইয়ের সময় সব দেশেই হয়েছে এবং হবে। মেয়েটা তবু পদে আছে—জারজ সন্তান জন্মায়নি। আর সেই দু'দিনের প্রেমিক কবে কোথায় চলে গেছে কে জানে।

এ অবস্থায় আর পাঁচটা ছেলে অন্য মেয়ে নেয়, কিংবা ক্ষেমাঘেন্না করে আগেরটাকেই বিয়ে করে। এ হয়ে গেল মনমরা। সমস্ত দিন ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা কয় না, আমাদের পীড়াপীড়িতেও বিয়ার খেতে আসে না। মেয়েটা নাকি একাধিকবার তার পায়ে ধরে কেঁদেছে। সে কিচ্ছু বলে না।

ছোট গাঁ, বোঝ অবস্থাটা। গির্জেয়, রাস্তায়, মুদির দোকানে প্রতিদিন আমাদের একে অন্যের সঙ্গে যে কতবার দেখা হয় ঠিক-ঠিকানা নেই। মেয়েটা করুণ নয়নে তাকায়, ছেলেটা ঘাড় ফিরিয়ে নেয়। আমরা যারা তখন সামনে পড়ি, বোঝো আমাদের অবস্থাটা! ছেলেটা সামনে পড়লে আমাদের মুখ গম্ভীর, মেয়েটা সামনে পড়লে অন্যদিকে তাকাই, আর দুজনা সামনে পড়লে তো চরম। ছেলেটা যখন মুরুব্বী, পুরনো দিনের ইয়ার-বক্সী ইস্তেক পাদ্রী সায়েব কারো কথায় কান দিলে না, তখন মেয়েটাকে বলা হল সে যেন অন্য একটা বেছে নেয়। যদিও বরের অভাব তবু সুন্দর এবং পয়সাওয়ালার মেয়ে বলে পেয়েও যেতে পারে। দেখা গেল, সেও নারাজ।'

নাসপাতিওলা রাস্তায় থেমে বলল, 'এই যে বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। চলো ভিতরে।'

আমি বললুম, 'না ভাই, মাফ করো।'

'তবে ফেরার সময় খবর নিয়ো। বাড়ি চেনা রইল।'

আমি বললুম, 'নিশ্চয়। কিন্তু ওদের কি হল?'

'কাদের? হ্যাঁ, ঐ দুটোর। একদিন ঐ হোথাকার (আঙুল তুলে দেখালে) ডোবায় পাওয়া গেল লাশ।'

আমি শুধালুম, "ছেলেটার?"

'না মেয়েটার।' 'আর ছেলেটা?' 'এখনো ছন্নের মত ঘুরে বেড়ায়। এক্ষুনি আসবে। থাকো না—আলাপ করিয়ে দেব।' আমি পা চালিয়ে মনে মনে বললুম, এ গ্রাম বিষবৎ পরিত্যজ্য।

(৪)

সিনেমার কল্যাণে আজকাল বহু নৈসর্গিক দৃশ্য, শহর-বাড়ি, পশুপক্ষী বিনা মেহন্নতে দেখা যায়। এমন কি বাস্তবের চেয়েও অনেক সময় সিনেমা ভালো। বাস্তবে বেল্‌কনি থেকে রানীকে আর কতখানি দেখতে পেলুম ?—সিনেমায় তাঁর আংটি, জুতো বকলস, হ্যাটের সিল্কটি পর্যন্ত বাদ গেল না। আলীপুরে গিয়ে বাঘ-সিঙ্গি না দেখে সিনেমাতে দেখাই ভালো—ক্যামেরামেন যতখানি প্রাণ হাতে করে ক্লোজ-আপ নেয় অতখানি ঝুঁকি নিতে আপনি আমি নারাজ।

বিলিতি ছবির মারফতে তাই ওদের শহর, বার্, রেস্টুরেন্ট, নাচ, রাস্তা-বাড়ি, দালান-কোঠা আমাদের বিস্তর দেখা হয়ে গিয়েছে কিন্তু গ্রামের ছবি এরা দেখায় অল্পই। গ্রামে বৈচিত্র্যই বা কি, সেখানে রোমান্সই বা কোথায় ? অন্তত সিনেমাওলাদের চোখে সেটা ধরা পড়ে না—ধরা পড়ে এখনো আর্টিস্টদের কাছে। ইউরোপীয় গ্রাম্য-জীবনের ছবি এখনো তাঁরা এঁকে যাচ্ছেন আর পুরনো দিনের মিইয়ে, ভান গখের তো কথাই নেই।

আমাদের গ্রামে সাধারণত সদর রাস্তা থাকে না। প্রত্যেক চাষা আপন খড়ের ঘরের চতুর্দিকে ঘিরে রেখেছে আম-কাঁঠাল সুপুরি-জাম গাছ দিয়ে—কিছুটা অবশ্য ঝড় থেকে কুঁড়েগুলোকে বাঁচাবার জন্য। এখানে সে ভাবনা নেই বলে গ্রামে সদর রাস্তা থাকে, তার দুদিকে চাষাভুষো, মুদী, দর্জি, কসাই, জুতোওলা সবাই বাড়ি বেঁধেছে। আর আছে ইস্কুল, গির্জে আর পাব্—জর্মনে 'লোকাল' (অর্থাৎ 'স্থানীয় মিলন ভূমি')। এইটেকেই গ্রামের কেন্দ্র বললে ভুল বলা হয় না।

রাস্তাটা যে খুব বাহারে তা বলা যায় না। শীতকালে অনেক সময় এত বরফ জমে ওঠে যে চলাফেরাও কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যেতে

পারে—আমাদের দেশে বর্ষাকালে যে রকম হয়। শুধু বাচ্চাদেরই দেখতে পাওয়া যায় তারই উপর লাফালাফি করছে, পেঁজা বরফের গুঁড়ো দিয়ে বল বানিয়ে একে অন্যকে ছুঁড়ে মারছে।

শুনেছি কট্টর প্রোটেস্টান্ট দেশে—স্কটল্যাণ্ড না কোথাও যেন—রববার দিন কাচ্চাবাচ্চাদেরও খেলতে দেওয়া হয় না! এখানে দেখি, ছেলে এবং মেয়েরাও রাস্তার উপর একটা নিম-চুবসে-যাওয়া ফুটবলে ধপাধপ কিক্ লাগাচ্ছে। এদের একটা মস্ত সুবিধে যে জাতিভেদ এদের মধ্যে নেই। দর্জীর ছেলে মুচির মেয়েকে বিয়ে করতে পারে, ইস্কুল মাস্টারের মেয়ে শুঁড়ির ছেলেকেও পারে। পাদ্রির ছেলেকেও পারতো—কিন্তু ক্যাথলিক পাদ্রির বিয়ে বারণ। আফগানিস্থানে যে রকম মেয়েদের মোল্লা হওয়া বারণ—দাড়ি নেই বলে।

একে ট্র্যাম্প তায় বিদেশী, খেলা বন্ধ করে আমার দিকে যে প্যাট প্যাট করে তাকাবে তাতে আর আশ্চর্য কি। এমন কি ওদের মা বাপরাও। ওদের অনেকেই রবির সকালটা কাটায় জানলার উপর কুশন্ রেখে তাতে দুই কনুইয়ে ভর দিয়ে, বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। প্রথম প্রথম আমার অস্বস্তি বোধ হত, শেষটায় অভ্যাস হয়ে গেল। সেটা অবশ্য পরের কথা।

ছবিতে দেখেছিলুম ছোঁড়াদের একজন চার্লির পিছন থেকে এসে একটানে তার ছেঁড়া শার্ট ফরফর করে একদম দু'টুকরো করে দিলে—সেটা অবশ্য শহরে। এবং আমার শার্টটা শক্ত চামড়ার তৈরী, ওটা ছেঁড়া ছোঁড়াদের কর্ম নয়। কিন্তু তবু দেখি গোটা পাঁচেক ছেলেমেয়ে একজায়গায় জটলা পাকিয়ে আমার দিকে তাকাচ্ছে আর ফন্দি-ফিকির আঁটছে। একটি দশ-বারো বছরের মেয়েই দেখলুম ওদের হন্টরওয়ালী, 'ফিয়ারলেস নাদিয়া, মিস্ ফ্রন্টিয়ার মেল, ডাকুকী দিল্‌রুবা, জম্বুকী বেটী যা খুশী বলতে পারেন। হঠাৎ বলা নেই, কওয়া নেই সে দল ছেড়ে গটগট করে এসে প্রায় আমার রাস্তা বন্ধ করে মধুর হাসি হেসে বললে, 'সুপ্রভাত'। সঙ্গে সঙ্গে একটি মোলায়েম কার্টসিও

করলে—অর্থাৎ বাঁ পাটি সোজা সটান পেছিয়ে দিয়ে, ডান হাঁটু, ইঞ্চি তিনেক নিচু করে দুহাতে দুপাশের স্কার্ট আলতোভাবে একটু উপরের দিকে তুলে নিয়ে বাও করলে। এই কার্টসি করাটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শহরে লোপ পেয়েছে, গ্রামাঞ্চলে তখনো ছিল, এখনো বোধকরি আছে।

এরা 'গ্র্যুস্ গট্' হয়তো জীবনে কখনো শোনেই নি। এদের জন্ম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তাই 'গুটেন্ মার্গেন' বলার পূর্বে প্রথম ছাড়লুম একখানা মৃদু হাস্য—একান ওকান ছোঁয়া। আমার মুখখানাও বোম্বাই সাইজের। কলাটা আড়াআড়ি খেতে পারি। স্যাণ্ডউইচ খাবার সময় রুটির মাখন আকছারই দু'কানের ড্যালায় লেগে যায়।

ইতিমধ্যে মেয়েটি অতিশয় বিশুদ্ধ ব্যাকরণে আমাকে যা শুধালো তার যদি শব্দে শব্দে অনুবাদ করা হয় তবে সেটা বাইবেলের ভাষার মতই শোনাবে। 'আপনি ইচ্ছে করলে বললে হয়তো বলতেও পারেন এখন কটা বেজেছে।' পশ্চিম ইউরোপীয় ভাষাগুলোকে সব্জন্ক্টিভ মুড তথা কণ্ডিশনাল প্রচুরতম মেকদারে লাগালে প্রভূততম ভদ্রতা দেখানো হয়। বাঙলায় আমরা অতীতকাল লাগিয়ে ভদ্রতা দেখাই। শ্বশুরমশাই যখন শুধোন 'বাবাজী তাহলে আবার কবে আসছ?' আমরা বলি, 'আজ্ঞে, আমি তো ভেবেছিলুম—' অর্থাৎ আমি যা ভেবেছিলুম কথাটা আপনার সম্মতি পাবে না বলে প্রায় নাকচ করে বসে আছি। তবু আপনি নিতান্ত জিজ্ঞেস করলেন বলে বললুম।

তা সে যাক্গে। মেয়েটি তো দুনিয়ার কুল্লে সব্জন্ক্টিভ একেবারে কপিবুক স্টাইলে, ক্লাস-টীচারকে খুশী করার মত ডবল হেল্পিং দিয়ে প্রশ্নটি শুধোলে। আমিও কটা সব্জন্ক্টিভ লাগাবো মনে মনে যখন চিন্তা করেছি এমন সময় গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজল একটা। আমার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলল। কোনো কথা না

বলে ডান হাত কানের পেছনে রেখে যেদিক থেকে শব্দ আসছিল সেইদিকে কান পাতলুম।

ইতিমধ্যে দু'চারটে ছোঁড়া রাস্তা ক্রস্ করে মেয়েটার চতুর্দিকে দাঁড়িয়েছে। সে আস্তে আস্তে ফিসফিস করে ওদের বললে, 'বোধহয় জর্মন বোঝেন, কিন্তু বলতে পারেন না।'

আমি বললুম, 'বোধহয় তুমি জর্মন বলতে পারো, কিন্তু শুনতে পাও না।'

অবাক হয়ে শুধোলে, 'কি রকম?'

আমি বললুম, 'গির্জার ঘড়িতে ঢং করে বাজলো একটা—বদ্ধ কালাও শুনতে পায়। আবার তুমি আমায় শুধোলে কটা বেজেছে। গির্জার ঘণ্টা যে শুনতে পায় না, সে আমার গলা শুনতে পাবে কি করে? তাইতো উত্তর দিই নি। তারপর ছোঁড়াগুলোর দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি বলো, ভাইরা সব! ও নিশ্চয়ই লড়াইয়ে গিয়েছিল। সেখানে শেল্‌শকে কালা হয়ে গিয়েছে—আহা বেচারী!'

সবাই তো হেসে লুটোপুটি। ইস্তেক মেয়েটি নিজে। একাধিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল; 'মেয়েছেলে আবার লড়াইয়ে যায় নাকি। তা-ও এইটুকু মেয়ে!' আমি গোবেচারীর মত মুখ করে বললুম, 'তা কি করে জানবো ভাই। আমি তো বিদেশী। কোন্ দেশে কি কায়দা, কি করে জানবো, বলো। এই তো তোমরা যখন ঠাহর করতে চাইলে, আমি জর্মর জানি কি না, তখন পাঠালে মেয়েটাকে। আমাদের দেশ হলে, মেয়েটা বুদ্ধি জোগাতো, কোনো একটা ছেলে ঠেলা সামলাবার জন্য এগোতো।'

একসঙ্গে অনেকগুলো প্রশ্ন, 'আপনার দেশ কোথায়? যাবেন কোথায়?' ইত্যাদি।

আমার মাথায় তখন কলি ঢুকেছে। সংস্কৃতে বললুম, 'অহং বৈদেশিকঃ। মম কোঽপি নিবাসো নাস্তি। সর্বদা পরিভ্রমণেব করোমি।'

কী উল্লাস। কী আনন্দ তাদের।

আমি ইণ্ডিয়ান, আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান, আমি চীনেম্যান এমনকি আমি নিগ্রো ইস্তেক। যে যার মত বলে গেল একই সঙ্গে চিৎকার করে।

আমি আশ্চর্য হলুম, কেউ একবারের তরেও শুধোলে না, আমি 'কোন্ ভাষায় কি বললুম সেটা অনুবাদ করে দিতে। তখন মনে পড়ল, রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, তাঁর বাল্য বয়সে শিশুসাহিত্য নামক কোনো জিনিস প্রায় ছিল না বলে তিনি বয়স্কদের জন্য লেখা বই পড়ে যেতেন এবং বলেছেন, তাতে সব-কিছু যে বুঝতে পারতেন তা নয়, কিন্তু নিতান্ত আবছায়া-গোছের কি একটা মনের মধ্যে তৈরি করে সেই আপন মনের নানা রঙের ছিন্ন সূত্রে গ্রন্থি বেঁধে তাতে ছবিগুলো গেঁথেছিলেন—বইখানাতে অনেকগুলো ছবি ছিল বলে তিনি নিজেই না বোঝার অভাবটা পুষিয়ে নিয়েছিলেন। কথাটা খুবই খাঁটি। বাচ্চারা যে কতখানি কল্পনাশক্তি দিয়ে না-বোঝার ফাঁকা অংশগুলো ভরে নিতে জানে, তা যাঁরা বাচ্চাদের পড়িয়েছেন তাঁদের কাছেই সুস্পষ্ট। অনেক স্থলেই হয়তো ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছয় কিন্তু তাতে কি এসে যায়। আমি চীনম্যান না নিগ্রো তাতে কার ক্ষতি-বৃদ্ধি। তারা বিদেশী, অজানা নূতন কিছু একটা পেয়েই খুশী। আর আমি খুশী যে বিনা মেহন্নৎ বিনা কসরৎ আমি এতগুলো বাচ্চাকে খুশী করতে পেরেছি—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি, আমি সোনার মোহরটি নই যে দেখামাত্রই সবাই উদ্বাহু হয়ে উল্লাসে উল্লম্ফন দেবে।

তা সে যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত স্থির হল আমি রেড্ ইণ্ডিয়ান। তার কারণটা একটু পরেই আমার কাছে পরিষ্কার হল। এরা কয়েকদিন পর ইস্কুলের শো-তে একটা রেড-ইণ্ডিয়ান নাচ, তীর ছোঁড়া এবং 'শান্তির পাইপ খাবার' অভিনয় করবে—আমি যখন স্বয়ং রেড্ ইণ্ডিয়ান উপস্থিত, তখন আমি রিহার্সেলটি তদারক করে দিলে

পাশের গ্রামের ছেলেমেয়েরা একেবারে থ মেরে যাবে। ওঃ। তাদের কী সৌভাগ্য।

আমি নৃতত্ত্বের কিছুই জানিনে। রেড-ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে আমার জ্ঞান নির্জলা নিল্। তাদের 'শান্তির পাইপ' কি, সে সম্বন্ধে আমার কণামাত্র জ্ঞান নেই। বুশ-মেনের বেশ-পোশাক আর রেড-ইণ্ডিয়ানেব ঐ বস্ত্রতে কি তফাত তাও বলতে পারবো না।

অথচ ওদের নিরাশ করি কি প্রকারে?

যাক্। দেখেই নি ওরা কতদুর এগিয়েছে।

তখন দেখি, ইয়াল্লা, এরা জানে আমার চেয়েও কম। ছোট্ট ইস্কুল বাড়ির একটা ঘর থেকে বেঞ্চি ডেস্ক সরিয়ে সেখানে রিহার্সেল আরম্ভ হল। রেড-ইণ্ডিয়ান মাথায় পালক দিয়েছে বটে কিন্তু বাদবাকি তার সাকুল্য পোশাক কাও বয়দের মত। আরো যে কত 'অনাছিষ্টি' সে বলে শেষ করা যায় না।

তখন আবার বুঝলুম রবীন্দ্রনাথের সেই কথাই আপ্তবাক্য। অল্প-বয়স্করা কল্পনা দিয়েই সব-কিছু পুষিয়ে নেয়। তদুপরি এদের প্রাণ-শক্তি অফুরন্ত। এরা পেট ভরে খেতে পায়। জামা-কাপড়ে এদের মধ্যেও কিছু দামী সস্তা ছিল বটে কিন্তু ছেঁড়া জামা-জুতো কারোরই নয়। আট বছর হতে না হতে এরা খেত-খামারের কাজে ঢোকে না। কোথায় এদের গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা আর কোথায় আমার গ্রামের কাচ্চা-বাচ্চারা! এই বাচ্চাদের হাসিখুশী দেখে এদের যে কোনো একটির মাথায় হাত রেখে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করা যায়;—

তুমি একটি ফুলের মত মণি
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর
মুখের পানে তাকাই যখনি
ব্যথায় কেন কাঁদায় অন্তর!

শিরে তোমার হস্ত দুটি রাখি
পড়ি এই আশিস মন্তর,
বিধি তোরে রাখুন চিরকাল
এমনই মিষ্টি এমনই সুন্দর।

ডু বিস্ট্ ভী আইনে ব্লুমে
জো হোল্ট, উন্ট্ শ্যোন উন্ট রাইন ;
ইষ শাও' ডিষ আন, উন্ট্ ভেমূট
শ্লাইষ্ট্ মীর ইন্স্ হের্ৎস্ হিনাইন।

মীর ইস্ট্ আল্স্ অপ ইষ ডি হ্যান্ডে
আউফ্স্ হাউপ্ট্ ডীর লেগেন জলট,'
বেটেণ্ড, ডাস্ গট্ ডীব এবহাল্টে
জো রাইন উন্ট্ শ্যোন উন্ট্ হোল্ট্।

এই গ্রামের পাশের বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হাইন্রিষ হাইনে যাঁর ছোট্ট কবিতার বইটি, 'বুখ ড্যার লীডার' পকেটে নিয়ে বন্ থেকে বেরিয়েছি এই কবিতাটি তার থেকে নেওয়া।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পরম বিস্ময় বোধ হয় এই কথা স্মরণ করে যে তিনিই প্রথম বাঙলাতে অনুবাদ করেন—এবং খুব সম্ভব ভারতেব সব ভাষা নিলে বাঙলাতেই প্রথম—হাইনের কবিতা। এবং তাও হাইনেব মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর যেতে না যেতেই এবং মূল জর্মন থেকে—ইংরিজি অনুবাদ মাবফতে নয়। পববর্তী কবিদের অধিকাংশই অনুবাদ কবেছেন ইংবিজি থেকে। মাত্র সত্যেন দত্ত ও যতীন্দ্র বাগচীরই অনুবাদ রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের কিছুটা কাছে আসতে পারে। রবীন্দ্রনাথই যে প্রথম হাইনের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন সেদিকে হালে শ্রীযুক্ত অরুণ সরকার আমাদের দৃষ্টি

আকর্ষণ করে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের চলিত অচলিত কোনো রচনাবলীতেই এ অনুবাদের উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

হাইনের সঙ্গে চণ্ডীদাসের তুলনা করা যায়। দুজনাই হৃদয় বেদনা নিবেদন করেছেন অতি সরল ভাষায়। দরদী বাঙালী তাই সহজেই এঁর সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে।

গ্যোটে যে সংস্কৃতের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার অন্যতম কারণ সংস্কৃত এবং গ্যোটের দেশ ও জাতের ভাষা দুটোই আর্য ভাষা। কিন্তু হাইনে জাতে ইহুদি। আর্য-সভ্যতা এবং ইহুদিদের সেমিতি সভ্যতা আলাদা। তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন নিছক ভারতবর্ষের নৈসর্গিক দৃশ্যের বর্ণনা পড়ে এবং শুনে।

তাঁর যে গুরু ফন্ শ্লেগেল তাঁর মাথায় সর্বপ্রথম কবির মুকুট পরিয়ে দেন তিনি ছিলেন বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যাপক।

(৫)

গেরো বাঁধলো 'শান্তির পাইপ খাওয়া' নিয়ে। এটা বোধহয় ড্রেস রিহার্সেল। তাই এই প্রথম সত্যকার পাইপে করে সত্যকার তামাক খাওয়া হবে। যে-ছেলেটি রেড-ইণ্ডিয়ানদের দলপতি সে বোধহয় একটু অতিরিক্ত মাত্রায় গোবেচারী—নিতান্ত দিক-ধেড়েঙ্গে ঢ্যাঙা বলে তাকে দলপতি বানানো হয়েছে এবং জীবনে কখনো রান্না-ঘরের পিছনে, ওদের ভাষায় চিলকোঠায় (এ্যাটিকে) কিংবা খড়-রাখার ঘরে গোপনে আধ-পোড়া সিগরেটও টেনে দেখিনি। না হলে আগে ভাগেই জানা থাকতো ভস্‌ভস্‌ করে পাইপ ফোঁকা চাট্টিখানি কথা নয়।

দিয়েছে আবার ব্রহ্ম-টান। মাটির ছিলিম হলে ফাটার কথা।

ভিরমি যায় যায়। হৈহৈ রৈরৈ কাণ্ড। একটা ছেলে তো ভ্যাঁক করে কেঁদেই ফেললে। ওদিকে আমিই ওদের মধ্যে মুরুব্বি। আমাকে কিছু একটা করতে হয়। একজনকে ছুটে গিয়ে মিনরেল-ওয়াটার আনতে বললুম—ও জিনিস এ অঞ্চলে পাওয়া যায় সহজেই—টাই-কলার খুলে দিয়ে শির-দাঁড়া ঘষতে লাগলুম। এসব মুষ্টিযোগে কিছু হয় কিনা জানিনে—শুনেছি মৃত্যুর দু'একদিন পূর্বে রবীন্দ্রনাথের হিক্কা থামাবার জন্য ময়ূরের পালক-পোড়া না কি যেন খাওয়ানো হয়েছিল—তবে সাইকলজিকাল কিছু-একটা হবে নিশ্চয়ই। আমি যখন রেড-ইণ্ডিয়ান তখন ওদের পাইপের পাপ কি করে ঠেকাতে হয় আমারই জানার কথা।

ফাঁড়া কেটে যাওয়ার পর দুর্ভাবনা জাগলো, শো'র দিনে পাইপ টানা হবে কি প্রকারে? হায়, হায়, এত সব বখেড়া পোওয়াবার পর, এমন কি জলজ্যান্ত রেড-ইণ্ডিয়ান পাওয়ার পর তীরে এসে ভরাডুবি?

আমি বললুম, 'কুছ পরোয়া নেই। সব ঠিক হো জায়েগা। কয়েক ফোঁটা ইউকেলিপ্‌টাস তেল নিয়ে এস'—অজ পাড়াগাঁ হলে কি হয়, এ যে জর্মনি।

তারই কয়েক ফোঁটা তামাকে ফেলে আগুন ধরাতেই প্রথমটায় দপ্‌ করে জ্বলে উঠলো। সেটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে ফের ধরালুম। তারপর ভস্‌ভস্‌ করে কয়েক টান দিয়ে বললুম, 'এইবারে তোমরা খাও। কাশি, নাকের জল, বমি কিছুই হবে না।' কেউ সাহস করে না। শেষটায় ঐ মারিয়ানা, ফিয়ারলেস্‌ নাদিয়াই দিলে দম! সঙ্গে সঙ্গে খুশীতে মুখচোখ ভরে নিয়ে বললে, 'খাসা! মনে হচ্ছে ইউকেলিপ্‌টাসের ধুঁয়োয় নাক-গলা ভর্তি হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেমন যেন শুকনো শুকনো।'

আমি বললুম, 'মাদাম ক্যুরিকে হার মানালি। ধরেছিস ঠিকই। শুকনো শুকনো ভাব বলেই খুব ভিজে সর্দি হলে ডাক্তাররা এই প্রক্রিয়ায় ইউকেলিপ্‌টাস ব্যবহার করতে বলে।'

শুধালে, 'আর তামাকের কি হল? তার স্বাদ তো আদপেই পাচ্ছিনে।'

সাক্ষাৎ মা দুর্‌গা! দশ হাতে এক সঙ্গে পাঁচ ছিলিম গাঁজা সেজে—কুলোকে বলে নিতান্ত ঐ গাঁজার স্টেডি সাপ্লায়ের জন্যই শিব দশভুজাকে বিয়ে করেছিলেন—বাবার হাতে তুলে দেবার পূর্বে মা নিশ্চয়ই তাঁর বখরার পূর্ব-প্রসাদ নিয়ে নিতেন! এ মেয়ে শিব পাবার পূর্বেই নেশাটা মক্‌সো করে রেখেছে—বেঁচে থাকলে শিবতুল্য বর হবে।

আমি বললুম, 'তামাক কর্পূর—মায় নিকোটিন।'

এমন সময় স্পষ্ট শোনা গেল গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বাজলো ছটো। সঙ্গে সঙ্গে এদের সক্কলের মুখ গেল শুকিয়ে। কি ব্যাপার? ছ'টোর সময় সব্বায়ের বাড়ি ফেরার হুকুম! মধ্যাহ্ন-ভোজন।

জর্মনি কড়া আইন, ডিসিপ্লিনের দেশ। বাচ্চাদের ডিসিপ্লিন

আরম্ভ হয়, জন্মের প্রথম দিন থেকেই—সে-কথা আরেকদিন হবে। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, বিপদে পড়েছে আমাকে নিয়ে। ছেলেমানুষ হোক আর যাই হোক একটা লোককে হুট করে বিদায় দেয় কি করে? ওদিকে আমিও যে এগোতে পারলে বাঁচি সেটা বোঝাতে গেলে ওরা যদি কষ্ট পায়।

গোবেচারী মনে হয়েছিল বটে, কিন্তু এখন দেখলুম, যার দলপতি সাজবার কথা সে ছেলেটা অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা করে। শুধালে, 'তুমি লাঞ্চ খেয়েছো?' আমার সত্য ধর্ম ছিল মিথ্যা বলার, অর্থাৎ হ্যাঁ, কিন্তু আমার ভিতরকার শয়তান আমাকে বিপদে ফেলার জন্য হামেহাল তৈরী। সে-ই সত্যভাষণ করে বললে, 'না, কিন্তু—'

কয়েকজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে চেঁচিয়ে বললে, 'আমার বাড়ি চলো।'

মেলা হট্টগোল। আমি বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, বাছারা, কিন্তু তোমাদের বাপ-মা একটা ট্র্যাম্পকে—?'

মারিয়ানা মেয়েটা একদিন জর্মনির রানী হবে যদি না কৈলাস থেকে হুলিয়া বেরোয়। বলা-নেই-কওয়া-নেই খপ করে তার ছোট্ট হাত দিয়ে আমার হাতখানা ধরে বললে, 'চলো আমার বাড়ি। আমাতে ঠাকুমাতে থাকি। কেউ কিচ্ছু বলবে না। ঠাকুমা আমায় বড্ড ভালোবাসে।' তারপর ফিস্‌ফিস্ করে কানে কানে বললে— যদিও আমার বিশ্বাস সবাই শুনতে পেলে—'ঠাকুরমা চোখে দেখতে পায় না।'

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বিস্তর হ্যাণ্ড-শেক, বিস্তর চকলেট বদলাবদলি হল। মারিয়ানা বললে 'চলো। আমাদের বাড়ি গ্রামের সর্বশেষে। তুমি যেদিকে চলছিলে সেই দিকেই। খামোখা উল্টো পথে যেতে হবে না।'

আজ স্বীকার করছি, তখনো আমি উজবুক ছিলুম। কাকে কি জিজ্ঞেস করতে হয়, না হয়, জানতুম না। কিংবা হয়তো, কিছুদিন

পূর্বেই কাবুলে ছিলুম বলে সেখানকার রেওয়াজের জের টানছিলুম—সেখানে অনেকক্ষণ ধরে ইনিয়ে-বিনিয়ে হরেকরকমের ব্যক্তিগত প্রশ্ন শোধানো হ'ল ভদ্রতার প্রথম চিহ্ন। জিজ্ঞেস করে বসেছি, 'তোমার বাপ মা ?'

অত্যন্ত সহজ কণ্ঠে উত্তর দিলে, 'বাবা ? তাকে আমি কখনো দেখিনি। আমার জন্মের পূর্বেই লড়াইয়ে মারা যায়। আর মা ? তাকেও দেখিনি। দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোনো স্মরণ নেই। সে গেল, আমার যখন বয়েস এক মাস।'

ইচ্ছে করে এরকম প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদে পড়া আহাম্মুখিই। লড়াই লড়াই, লড়াই ! হে ভগবান ! তুমি সব পারো, শুধু এইটে বন্ধ করতে পাবো না ?

ভাবলুম, কোন্ ব্যামোতে মা মারা গেল সেইটে শুধোলো হয়তো আলাপটা অন্য মোড় নেবে। শুধালুম, 'মা গেল কিসে ?'

বারো, জোর তেরো বছরের মেয়ে। কিন্তু যা উত্তর দিলো তাতে আমি বুঝলুম, আহাম্মুকের মত এক প্রশ্ন শুধিয়ে বিপদ এড়াবার জন্য অন্য প্রশ্ন শুধোতে নেই। বললে, 'আমাদের গাঁয়ে ডাক্তার নেই। বন্ শহরের ডাক্তার বলে, মা গেছে হার্টে। ঠাকুরমা বলে অন্য হার্টে। মা নাকি বাবাকে বড্ড ভালোবাসতো। সবে নাকি তাদের বিয়ে হয়েছিল।'

*　　　　*　　　　*

নির্জন পথ চিত্রিতবৎ সাড়া নেই সারা দেশে
রাজার দুয়ারে দুইটি প্রহরী ঢুলিছে নিদ্রাবেশে

তার বদলে একটি সিঁড়ির উপর পাশাপাশি বসে দুটি বুড়ী ঢুলছে।

আর খোলা জানলা দিয়ে আসছে ক্যানারি পাখির গিটকিরিওলা হুইসেলের মিষ্টি মধুর সঙ্গীত। মারিয়ানা বললে, 'দুই দুই বুড়ীর ঐ এক সঙ্গী—পাখিটি।'

(৬)

গ্রামের ঐ একটিমাত্র সদর-রাস্তা পেরিয়ে যাওয়ার পর দু'দিকের বাড়িগুলো রাস্তা থেকে বেশ একটুখানি দূরে অর্থাৎ গেট খুলে বাগান পেরিয়ে গিয়ে ঘরে উঠতে হয়।

'বাগান' বললুম বটে, কিন্তু সেটাকে ঠিক কি নাম দিলে পাঠকের চোখের সামনে ছবিটি ফুটে উঠবে, ভেবে পাচ্ছিনে।

ঢুকতেই কম্পাউণ্ডের বাঁদিকে একটা ডোবাতে অনেকগুলো রাজহাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করছে। টলটল স্বচ্ছ সরোবর তরতর করে রাজহাঁস মরাল-সন্তরণে ভেসে যাওয়ার শৌখিন ছবি নয়—এ নিছক ডোবা, এদিকে-ওদিকে ভাঙা, ধসে-যাওয়া পাড়, জল ঘোলা এবং কিছু কিছু শুকনো পাতা এদিক-ওদিক ভাসছে। সোজা বাঙলায়, এখানে রাজহাঁসের চাষ হচ্ছে, বাগানের নয়নাভিরাম দৃশ্য হিসেবে এটাকে তৈরী করা হয়নি।

মারিয়ানার গন্ধ পেয়েই রাজহাঁসগুলো একজোটে ডোবা ছেড়ে তার চতুর্দিকে জড়ো হল। আমি লাফ দিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালুম। রাজহাঁস, ময়ূর, এরা মোটেই নিরীহ প্রাণী নয়—যে যাই বলুন। মারিয়ানাও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শুধু বললে, 'বাপরে বাপ, জানোয়ারগুলোর কি খাঁই! এই সকালবেলা উঠেই গাদাগুচ্ছের খাইয়ে গিয়েছি, ডোবাতেও এতক্ষণ এটা-সেটা খেয়েছে, আবার দেখো, কি রকম লেগেছে! এদের পুষে যে কী লাভ, ভগবান জানেন।'

ইতিমধ্যে দেখি আরেক দল মোর্গা-মুর্গী এসে জুটেছে।

ঘরে ঢোকার আগে দেখি বাড়ির পিছনে এক কোণে জালের বেড়ার ভিতর গোটাতিনেক শুয়োর।

আমি অবাক হয়ে মারিয়ানাকে শুধালুম, 'এই সব-কিছুর দেখ-ভাল তুমিই করো? তোমার ঠাকুরমা না—?'

ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, 'আমি করি কোথায়? করে তো কার্ল?'

আমি শুধালুম, 'সে আবার কে? তুমি না বললে, তোমরা মাত্র দু'জনা?'

ইতিমধ্যে কার্ল এসে জুটেছে। মাঝারি সাইজের এলসেশিয়ান হলেও এলসেশিয়ান তো বটে—জর্মনরা বলে শেপার্ড ডগ, অর্থাৎ রাখাল-কুকুর—কাজেই একদিকে রাজহাঁস, অন্যদিকে কুকুর, এ নিয়ে বিব্রত হওয়া বিচিত্র নয়। কিন্তু দেখলুম, কার্ল স্থানা হলে, আমাকে একবার শুঁকেই মনস্থির করে ফেলেছে, আমি মিত্রপক্ষ।

মারিয়ানা বললে, 'আমি ওদের খাওয়াই-টাওয়াই। কার্লই দেখা-শোনা করে। তোমার মত ট্র্যাম্প কিংবা জিপসি সুযোগ পেলেই কপ্ করে একটা মুরগী ইস্তেক হাঁসের গলা মটকে পকেটে পুরে হাওয়া হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'মনে রইল। এবারে সুযোগ পেলে ছাড়ব না।'

ভয় পেয়ে বললে, 'এমন কম্মটি করতে যেয়ো না, লক্ষ্মীটি। অনেকেরই কার্লের চেয়েও বিরাট দু-আঁসলা শেপার্ড ডগ রয়েছে। সেগুলো বড্ড বদ্‌মেজাজী হয়।'

আমি অবাক হয়ে ভাবছি, এই বারো বছরের মেয়ে দু-আঁসলা, এক-আঁসলা ক্রস-ব্রীডের কি বোঝে?

মারিয়ানাই বুঝিয়ে বললে, 'খাঁটি আলসেশিয়ান কার্লের চেয়ে বড় সাইজের হয় না। আলসেশিয়ানকে আরো তাগড়াই করার জন্য কোনো কোনো আহম্মুক আরো বড় কুকুরের সঙ্গে ক্রস করায়। সেগুলো সত্যিকার দু-আঁসলা, বদ্‌মেজাজী আর খায়ও কয়লার ইঞ্জিনের মত।'

এর অনেক পরে এক ডাক্তার আমায় বুঝিয়ে বলেছিলেন, গরু-

ভেড়া-ছাগল-মুরগী নিয়ে গ্রামের সকলেরই কারবার বলে কাচ্চা-বাচ্চারা অল্প বয়সেই ব্রীডিং বুল, 'বীচি'র মোরগ কি বুঝে যায়। তাই শহুরেদের তুলনায় এ-বিষয়ে ওদের সুস্থ স্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গি জন্মায়, এবং পরিণত বয়েসে যৌন-জীবনে শহুরেদের তুলনায় এদের আচরণ অনেক বেশী স্বাভাবিক ও বেহাঙ্গামা হয়।

থাক্ সে কথা। তবে এইবেলা এ কথাটি বলে রাখি, এই গ্রামাঞ্চলে ঘোরাঘুরির ফলে মানুষের জীবনধারা সম্বন্ধে যে জ্ঞান সঞ্চয় করেছি, শহরের বহু ড্রয়িং-রুম, বার-রেস্তোরাঁর পাকা জউরি হয়েও তার সিকির সিকিও হয়নি।

*   *   *

'ঠাকুরমা, আমি অতিথি নিয়ে এসেছি।'

আমি বললুম, 'গ্র্যুস গট্ ঠাকুরমা। আমি বিদেশী।'

ঠাকুরমা সেই প্রাচীন যুগের লোক। গ্র্যুস্ গট্ বলাটাই হয়তো এখনো তাঁর অভ্যাস। তাই বলে বললেন, 'বসো।' মারিয়ানাকে বললেন, 'এত দেরি করলি যে। খেতে বস্। আর সানডে সেট বের কর। আর শোন, চীজ, চেরি-ব্র্যাণ্ডি ভুলিসনি।'

'হ্যাঁ, ঠাকুরমা, নিশ্চয়ই ঠাকুরমা—' বলতে বলতে আমার দিকে তাকিয়ে একটুখানি চোখ টিপে হাসলে। বিশেষ করে দেরাজের উপরের থাকের চেরি-ব্র্যাণ্ডির বোতল দেখিয়ে। অর্থাৎ অতিথি-সৎকার হচ্ছে। সচরাচর এগুলো তোলাই থাকে।

এবং এটাও বোঝা গেল, নিতান্ত ঠাকুরমা নাতনী ছাড়া আর কেউ নেই বলে রবিবার দিনও সানডে সেটের কাপ-প্লেট বের করা হয় না।

মারিয়ানা টেবিল সাজাচ্ছে। আমি ঠাকুরমাকে শুধালুম, 'আপনার স্বাস্থ্য কিরকম যাচ্ছে?'

ঠাকুরমা উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তুমি তো আমার মত কথা বলো, আমার নাতনীর মত বলো না।'

আমি শুধালুম, 'একটু বুঝিয়ে বলুন।'

ঠাকুরমা বললেন, 'আমি হানোফারের মেয়ে। সেই ভাষাতেই কথা বলি। সে-ভাষা বড় মিষ্টি। আমি ছাড়বো কেন? আর নাতনীর বাপ-ঠাকুর্দা রাইনল্যাণ্ডের লোক। এরা সবাই রাইনিশ বলে। তুমি তো হানোফারের কথা বলছো।'

মারিয়ানা বলে উঠলো, 'ওঃ, কত না মিষ্টি। শি্পৎসে, শ্টাইন বলতে পারে না; বলে স্পিৎসে, স্টাইন।'

(অর্থাৎ 'শ, স'-এ তফাত করতে পারে না; আমরা যে রকম 'সাম-বাজারের সসিবাবুর সসা খেয়ে খেয়ে সগ্গারোন' নিয়ে ঠাট্টা করি।)

ঠাকুরমা কণামাত্র বিচলিত না হয়ে বললেন, 'আর তোরা ত কির্শে, কির্ষেতে তফাত করতে পারিসনে।'

(এ দুটো উচ্চারণের পার্থক্য বাঙলা হরফ দিয়ে বোঝানো অসম্ভব। তবে এক উচ্চারণ করলে ফলে দাঁড়ায় 'আমি গির্জেটা (কির্যে) খেলুম (!), এবং তারপর চেরি ফলে (কির্শে) ঢুকলুম (!)'—যেখানে উচ্চারণে ঠিক ঠিক পার্থক্য করলে সত্যকার বক্তব্য প্রকাশ হবে, 'আমি চেরিফল খেয়ে গির্জেয় ঢুকলুম।')

আমি বাঙাল-ঘটি যে-রকম উচ্চারণ নিয়ে তর্ক করে, সে ধরনের কাজিয়ার বাড়াবাড়ি থামাবার জন্য বললুম, 'আমার গুরু ছিলেন হানোফারের লোক।'

(৭)

"ধন্য হে জননী মেরী, তুমি মা করুণাময়ী। তুমি প্রভুর সান্নিধ্য লাভ করেছ। রমণীজাতির মধ্যে তুমিই ধন্য, আর ধন্য তোমার দেহজাত সন্তান যীশু। মহিমাময়ী মা মেরি, এই পাপীতাপীদের তুমি দয়া করো, আর দয়া করো যেদিন মরণের ছায়া আমাদের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসবে।"

এই 'আভে মারিয়া' বা 'মেরি-আবাহন-মন্ত্র' উচ্চারণ না করে সাধারণত ক্যাথলিকরা খেতে বসে না—আর গ্রামাঞ্চলে তো কথাই নেই। অনেকটা হিন্দুদের গণ্ডূষের মত। আর প্রটেস্টান্টরা সাধারণত 'হে আমাদের দ্যুলোকের পিতা' (পাতের নস্তের) মন্ত্র পাঠ করে। কোনো কোনো পরিবারে উপাসনাটা অতি ক্ষুদ্র :

'এস হে যীশু।
আমাদের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো।
আমাদের যা দিয়েছো তার উপর
তোমার আশীর্বাদ রাখো।
'কমে য়েজু, জাই উনজের গাস্ট্।
উন্ট্ জেগনে ভাস ডু
উন্স্ বেশের্ট্ হাস্ট্॥'[১]

১ বিলাতের কোনো এক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভোজনগৃহে এই মন্ত্রপাঠ করার সময় জনৈক ভারতীয় ভোজনালয় ত্যাগ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সেটি ফলাও করে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে বর্ণনা দেন। নাস্তিকের এই 'সৎ-সাহসের' কর্মটি তিনি যদি ইন্‌কুইজিশন যুগে করতেন তবু না হয় তার অর্থ বোঝা যেত। কিন্তু তাঁর এই আচরণ থেকে ধরে নিতে হবে, হয় ভারতীয়রা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণু, অথবা ঐ লেখক ভারতীয় নন। জানি, একজন

মুসলমানদের উপাসনাটিও ক্ষুদ্র: 'আমি সেই খুদার নামে আরম্ভ করি যিনি দয়াময়, করুণাময়।'

এদের এই মন্ত্রপাঠে একটি আচার আমার বড় ভালো লাগে; পরিবারের সর্ব-কনিষ্ঠ—যে সবে আধো আধো মন্ত্রোচ্চারণ করতে শিখেছে—তাকেই সর্বজ্যেষ্ঠ আদেশ দেন, উপাসনা আরম্ভ করতে।

ঠাকুরমা আদেশ করলেন, 'মারিয়ানা, ফাঙেমাল্ আন— আরম্ভ কর।'

প্রাগোক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-বিবেকমণ্ডিত 'নাস্তিক' ভ্রমণকাহিনী লেখক আমি নই। (ভ্রমণকাহিনী যদিও লিখেছি তবু তাঁর মত খ্যাতি লাভ করতে পারিনি)। তাই আমি হস্তী দ্বারা তাড্যমানের ন্যায় খৃষ্টানের গৃহ ত্যাগ করলুম না।

মারিয়ানার কিন্তু তখনো খাবার সাজানো হয়নি—রোববারের বাসন-কোসন বের করতে একটু সময় লেগেছে বই কি, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। সুপ্, স্যালাড আনতে আনতেই, সেই সদা-প্রসন্ন তরুণ মুখটিতে কণামাত্র গাম্ভীর্য না এনে সহজ সরল কণ্ঠে বলে উঠলো,

'ধন্য হে জননী মেরি, তুমি মা
করুণাময়।—'

বাচ্চাদের উপাসনা আমার সব সময়েই বড় ভালো লাগে। বড়দের কথায় বিশ্বাস করে তারা সরল চিত্তে ধবে নিয়েছে ভগবান

ভারতীয়ের আচরণ থেকে তাবৎ ভারতীয় সম্বন্ধে কোনো অভিমত নির্মাণ করা অযৌক্তিক কিন্তু দেশ-বিদেশে সর্বত্রই তাই করা হয়।

পক্ষান্তরে খাঁটি নাস্তিক আনাতোল ফ্রাঁস যখন একবার শুনতে পান, ফরাসী সরকার যে-পুস্তকে ভগবানের নাম উল্লেখ থাকে সে-পুস্তক স্কুল-লাইব্রেরীর জন্য কিনতে দেয় না, তখন তিনি ক্রুদ্ধকণ্ঠে বলেছিলেন, 'তাহলে ফরাসী বিদ্রোহে এত রক্তপাত করে পেলুম আমরা কী সে স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতা আস্তিককে তার ধর্মবিশ্বাস প্রচার করতে দেয় না?'

সামনেই রয়েছেন। ফলে তাদের মন্ত্রোচ্চারণের সময় মনে হয় তারা যেন তাঁর সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা কইছে—যেন ঠাকুরমার সঙ্গে কথা না বলে ভগবানের সঙ্গে কথা বলছে। আর আমরা, বয়স্করা, কখনো উপরের দিকে, কখনো মাথা নিচু করে 'উপাসনা করি'—তাঁর সঙ্গে কথা বলিনে।

গ্রামের লোক হাতী ঘোড়া খায় না। শহুরেদের মত আটপদী নিরতিশয় ব্যালানস্‌ড্‌ ফুড—ফলে স্বভাবতই আন-ব্যালান্‌স্‌ড্‌!—খায় না বলেই শুনেছি তাদের নাকি থ্রম্বোসিস কম হয়।

স্যুপ।

আপনারা সায়েবী রেস্তোরাঁয় যে আড়াই ফোঁটা পোশাকী স্যুপ খেয়ে ন্যাপকিন দিয়ে তার দেড় ফোঁটা ঠোঁট থেকে ব্লট করেন এ সে বস্তু নয়। তার থাকে তনু, এর আছে বপু।

হেন বস্তু নেই যা এ স্যুপে পাবেন না।

মাংস, মজ্জাসুদ্ধ হাড়, চর্ব্বি সেদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে কাল সন্ধ্যা থেকে, না আজ সকাল থেকে বলতে পারবো না। তারপর তাতে এসেছে, বাঁধাকপি, ফুলকপি, ব্রাসেল স্প্রাউটস্, দু-এক টুকরো আলু, এবং প্রচুর পরিমাণে মটরশুঁটি। মাংসের টুকরো তো আছেই—তার কিছুটা গলে গিয়ে ক্বাথ হয়ে গিয়েছে, বাকিটা অর্ধ-বিগলিতালিঙ্গনে তরকারির টুকরোগুলোকে জড়িয়ে ধরেছে। এবং সর্বোপরি হেথা হোথা হাবুডুবু খাচ্ছে অতিশয় মোলায়েম চাক্তি চাক্তি ফ্রাঙ্কফুর্টার সসিজ। চর্বিঘন-মাংসবহুল-তরকারি সংবলিত=মজ্জামণ্ডিত এই স্যুপের পৌরুষ দার্ঢ্যের সঙ্গে ফেনসি রেস্তোরাঁর নমনীয় কমনীয় রুচিসংসদ ভোজ্য স্যুপ নামে পরিচিত তরল পদার্থের কোনো তুলনাই হয় না।

এর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এদেশের ভাষায় বলতে গেলে বলবো, মা মাসীদের ভুলিয়ে-ভাল্গিয়ে কোনো গতিকে পিকনিকে নিয়ে যেতে পারলে তাঁরা সাড়ে বত্রিশ উপকরণ দিয়ে যে খিচুড়ি রাঁধেন, ধর্মে-গোত্রে এ যেন তাই। খেয়েই যাচ্ছি, খেয়েই যাচ্ছি, শুধুমাত্র

খিচুড়িই খেয়ে যাচ্ছি—শেষটায় দেখি, ওমা, বেগুন ভাজা মমলটে হাত পর্যন্ত দেওয়া হয়নি।

জর্মনির জনপদবাসী ঠিক সেই রকম সচরাচর ঐ একটিমাত্র সুপই খায়। তার সঙ্গে কেউ কেউ রুটি পর্যন্ত খায় না।

আজ রোববার, তাই ভিন্ন ব্যবস্থা। অতএব আছে, দ্বিতীয়ত, স্যালাড।

আবার বলছি, আপনাদের সেই 'ফিনসি' রেস্তোরাঁর উন্নাসিক 'সালাদ রুস্', 'সালাদ আলা মায়োনেজ', 'সালাদ ভারিয়ে-ও-পোয়াসোঁ' ওসব মাল বেবাক ভুলে যান।

সুপে যেমন ছিল দুনিয়ার সাকুল্যে সর্বকিছু, স্যালাডে ঠিক তার উল্টোটি। আছে মাত্র তিনটি বস্তু: লেটিসের পাতা, টমাটোর টুকরো, প্যাঁজের চাক্তি—ব্যস!

এগুলো মেশানো হয়েছে আরো তিনটি বস্তু দিয়ে। ভিনিগার, অলিভ ওয়েল এবং জলে-মিশিয়ে-নেওয়া সরষেবাটা। অবশ্য নুন আছে এবং গোলমরিচের গুঁড়ো থাকলে থাকতেও পারে। কিন্তু ঐ যে সিরকা, তেল, সর্ষে সেই তিন বস্তুর কতটা কতখানি দিতে হবে, কতক্ষণ মাখতে হবে—বেশী মাখলে স্যালাড জবুথবু হয়ে নেতিয়ে যাবে, কম মাখলে সর্বাঙ্গে সর্ব জিনিসের পরশন শিহরন জাগবে না—সেই হল গিয়ে স্যালাডের তমসাবৃত, সৃষ্টির নিগূঢ় রহস্য।

দম্ভভরে বলছি, আমি শঙ্কর কপিল পড়েছি, কাণ্ট হেগেল আমার কাছে অজানা নন। অলঙ্কার নব্যন্যায় খুঁচিয়ে দেখেছি, ভয় পাইনি। উপনিষদ, সুফীতত্ত্বও আমার কাছে বিভীষিকা নয়। আমার পরীক্ষা নিয়ে সত্যেন বোসের এক সহকর্মী আমাকে বলেছিলেন, তিন বছরে তিনি আমায় রিলেটিভিটি কলকাতার দুগ্ধবত্তরলম্ করে দিতে পারবেন। পুনরপি দম্ভভরে বলছি, জ্ঞানবিজ্ঞানের হেন বস্তু নেই যার সামনে দাঁড়িয়ে হকচকিয়ে বলেছি, এ জিনিস? না, এ জিনিস আমাদ্বারা কক্খনো হবে না। আপ্রাণ চেষ্টা করলেও হবে না।

কিন্তু ভগ্নদূতের মত নতমস্তকে বার-বার স্বীকার করছি ঐ স্যালাড মেশানোর বিদ্যেটা আমি আজো রপ্ত করে উঠতে পারিনি। অথচ বন্ধুমহলে—বোম্বায়ের শচীন চৌধুরী থেকে আরম্ভ করে কলকাতার ডাক্তার ঘোষ পর্যন্ত—স্যালাড মেশানো ব্যাপারে আমার রীতিমত খ্যাতি আছে। তাঁরা যখন আমার তৈরী স্যালাড খেয়ে 'আ মরি, আ মরি' করেন, আমি তখন ঠাকুরমার সেই স্যালাডের স্মরণে জানালা দিয়ে হঠাৎ কখনো বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করতে থাকি, কখনো বা মাথা নিচু করে বসে থাকি।

বাঙলা কথায় তুলনা দিয়ে বলতে হলে, শুধোই তেলমুড়ি আপনি মাখাতে পারেন, আম্মো পারি, কিন্তু পারেন ঠাকুরমার মত? ধনে পাতার চাটনিতে কীই বা এমন কেরদানী! কিন্তু পারেন পদি পিসি পারা পিষতে?

* * * *

'গুটন্ আপেটিট'—গুড্ এপিটাইট!

এর ঠিক বাঙলা নেই। উপাসনার পর একে অন্যের দিকে তাকিয়ে সবাই বলে, 'আশা করি তোমার যেন বেশ ক্ষুধার উদ্রেক হয়, আর তুমি তৃপ্তির সঙ্গে খেতে পারো।' ইংরিজির মত জর্মনেও 'হাঙার' (হুঙার) ও 'এপিটাইট' ('আপেটিট') দুটো শব্দ আছে। 'এপি-টাইটের' ঠিক বাঙলা প্রতিশব্দ নেই। 'খাওয়ার রুচি, বাসনা অনেক কিছু দিয়ে মোটামুটি বোঝানো চলে কিন্তু ঠিক অর্থটি বেরোয় না। যেমন ইংরিজিতে বলা চলে 'আই এম্ হাঙরি বাট হ্যাভ নো এপিটাইট' —'আমার ক্ষুধা আছে কিন্তু খাবার প্রবৃত্তি নেই', কিংবা 'মুখে রুচছে না।' আবার পেটুক ছেলে যখন খাই খাই করে তখন অনেকেই বলে, 'দি বয় হ্যাজ এপিটাইট বাট্ হি ইজ নট হাঙরি এট অল।' এস্থলে 'এপিটাইট' তাহলে দাঁড়ায় 'চোখের ক্ষিধে'। আমার অবশ্য, দুইই ছিল।

আইনানুযায়ী আমার মাঝখানে বসার কথা, কিন্তু আমি একরকম

জোর করে মারিয়ানাকে মাঝখানে বসিয়ে দিলুম। ঠাকুরমার কখন কি দরকার হয় আমি তো জানিনে। মারিয়ানা কাছে থাকলে ওঁকে সাহায্য করতে পারবে।

বিরাট গোল এক চামচ দিয়ে স্থপের বড় বোল্ থেকে আমার গভীর স্থপ-প্লেটে মারিয়ানা চালান করতে লাগল লিটার লিটার স্থপ। আমি যতই বাধা দিই, কোনো কথা শোনে না। শুধু মাঝে মাঝে পাকা গিন্নীর মত বলে, 'ম্যান্ জল্ অর্ডনট্লিষ এসেন্—ভালো করে খেতে হয়, ভালো করে খেতে হয়।'

ঠাকুরমা দেখি তখনো কি যেন বিড়বিড় করছেন। হয়তো নিত্য মন্ত্রের উপর তাঁর কোনো ইষ্টমন্ত্র আছে,—সেইটেই জপ করছেন।

আমার মা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বোকা বলে মনে হয়, আমি ততটা বোকা নই; আর বড়দা বলতো, আমাকে দেখলে যতটা বুদ্ধিমান বলে মনে হয়, আমি ততটা বুদ্ধিমান নই। কোন্‌টা ঠিক জানিনে, তবে আমার স্মৃতিশক্তিটি ভালো সে-কথাটা উভয়েই স্বীকার করতেন। আমার মনে পড়ে গেল, আমার শহুরে বন্ধু পাউল একবার আমাকে 'উপাসনার অত্যাচারে'র কথা শুনিয়েছিল। সমস্ত দিন খেটে খিদেয় হন্যে হয়ে চাষারা তাকিয়ে আছে স্থপপ্লেটের দিকে—ঝাঁপিয়ে পড়বে তার উপর—আর পাদ্রীসায়েব, তিনি সমস্তদিন 'প্রভুকে স্মরণ করেছেন বলে' তাঁর হাঙার এপিটাইট কিছুই নেই—পাদ্রীসায়েবের উপাসনার আর অন্ত নেই।

আমি অনুমান করলুম, আমি বিদেশী বলে হয়তো মারিয়ানা মন্ত্রোচ্চারণে কিছু কিছু কাট-ছাঁট করেছে। ফিস্‌ফিস্ করে সে-কথা শোধাতে তার সর্বমুখ শুধু নয়, যেন ব্লণ্ড চুলের গোড়াগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে গেল। অপরাধ স্বীকার করে বললে, খাওয়ার পরের উপাসনা পুরোপুরি করে দেবে।

ঠাকুরমার প্লেটে মারিয়ানা স্থপ ঢেলেছিল অল্পই। তিনি প্রথম চামচ মুখে দেওয়ার পর আমরাও খেতে আরম্ভ করলুম। সঙ্গে সঙ্গে

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে শুধোলে, 'শ্মেক্ট্ এস্ ?' অর্থাৎ 'খেতে ভালো লাগছে তো ?' এটা হল এদেশের ছু-নম্বরের টেবিল এটিকেট। আমি বললুম, 'ধন্যবাদ !' অপূর্ব ! রাজসিক !' জর্মনে কথাটা 'হ্যারলিষ'—তার বাঙলা 'রাজকীয়' 'রাজসিক'।

আমি বললুম, 'ঠাকুরমা, আপনাদের এই রবিবারের সেটটি ভারী চমৎকার।'

ঠাকুরমা বললেন, 'এ বাড়িতে কিন্তু মোটেই খাপ খায় না। তা কি করবো বলো। আমার মামা কাজ করতেন এক পর্সেলিন কারখানায়। তিনি আমাকে এটা দেন। সে কতকালের কথা—এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের।'

মারিয়ানা বললে, 'চেপে যেও না, ঠাকুরমা ! তোমার বিয়ের সময় উপহার পেয়েছিলে সেটা বললে কোনো অপরাধ হবে না। ফের "এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের" বলে আরম্ভ করো না।'

আমি শুধালুম, 'এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের—সে আবার কি ?'

উৎসাহের সঙ্গে মারিয়ানা বললে, 'বুঝিয়ে বলছি, শোনো। ঠাকুমা যখনই আমাকে ধমক দিতে চায়, তখন হঠাৎ তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। "তোর বাপ এ-পরবের সময় এরকম ধারা করতো না, তুই কেন করছিস ? তোর মা তার সাংবৎসরিক পরবের দিনে (নামেনস্টাখ্) ভোরবেলা চার্চে গিয়েছিল, আর তুই ন'টা অবধি ভস্‌ভস্ করে নাক ডাকালি।" কে কবে হেসেছিল, কে কবে কেশেছিল টায়-টায় মনে গাঁথা আছে। আবার দেখো শীতকালে যখন দিনভর রাতভর দিনের পর দিন বরফ পড়ে, বাড়ি থেকে বেরনো যায় না, তখন যদি সময় কাটাবার জন্য ঠাকুরমাকে জিজ্ঞেস করি, 'হ্যাঁ, ঠাকুমা বলো তো ভাই, লক্ষ্মীটি, ঠাকুরদা কিভাবে তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল। এক হাঁটু গেড়ে আরেক হাঁটু মুড়ে, ফুলের তোড়া বাঁ-হাতে নিয়ে এগিয়ে দিয়ে, ডান হাত বুকের উপর চেপে নিয়ে—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'অবাক করলি! তুই এসব শিখলি কোথায়? তোর কাছে কেউ বিয়ের প্রস্তাব পেড়েছিল নাকি?'

এইবারে ঠাকুরমার ঠোঁট খুললো। বললেন, 'বেশ হয়েছে।'

মারিয়ানা মুখ আবার লাল করে বললে, 'ছ্যৎ! সিনেমাতে দেখেছি। উইলহেলম বুশের আঁকা ছবিতে দেখেছি।[২] তা সে যাকগে, আমার কথা শোনো। ঐসব বিয়ের প্রস্তাব, বিয়ের পর পয়লা ঝগড়া, ঠাকুরদা যখন লড়াইয়ে চলে গেল তখনকার কথা, এসব কথা জিজ্ঞেস করলে হঠাৎ ঠাকুরমার স্মৃতিশক্তি একদম লোপ পায়। আমাদের ঐ কার্ল কুকুরটা যেরকম পূর্ণচন্দ্রের দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে আর্তরব ছাড়ে ঠিক সেই গলায় ককিয়ে ককিয়ে বলে,—সেই এক কথা—"এস্ ইস্ট্ সো লাঙে হের", "সে কত প্রাচীন দিনের কথা সে সব কি আর আমার মনে আছে।" ধমকের বেলা সব মনে থাকে —তখন আর "লাঙে হের, লাঙে হের" নয়।'

আমি বললুম, 'আলবাৎ, আলবাৎ।'

তার থেকে অবশ্য বোঝা গেল না আমি কোন্ পক্ষ নিলুম। পরে বিপদে পড়লে যেদিকে খুশী ঘুরিয়ে নেব। অবশ্য আমি কালো, কৃষ্ণপক্ষ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষেই থাকার চেষ্টা করি।

ইতিমধ্যে আমি মারিয়ানার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘরটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছি।

ঘরের উত্তর-পূব কোণে দুই দেয়ালের সঙ্গে মিলে সিন্‌ক্—জর্মনে বলে শ্‌প্যুল-স্টাইন।

দেয়ালে গাঁথা ওয়াশস্টেণ্ডের মত, ছোট্ট চৌবাচ্চা-পানা—দেয়ালে গাঁথা বলে যেন হাওয়ায় দুলছে—মাটি পর্যন্ত নেবে আসেনি। সেখানে ট্যাপে বাসন-কোসন মাজা হয়, মাছ-মাংস ধোওয়া হয়—

---

২ জর্মনদের সুকুমার রায়। ওঁরই মত নিজের কবিতার ছবি নিজেই আঁকতেন। তবে সুকুমারের মত 'প্যোর ননসেন্স' লেখেননি। ওঁর বেশীর ভাগই ইলাসট্রেটেড্ গল্প।

তাই রান্নাঘরে, কিংবা দাওয়ায় (অবশ্য এই শীতের দেশে দাওয়া জিনিসটাই নেই) ঘড়া ঘড়া জল রাখতে হয় না। খাওয়া-দাওয়ার পর তাবৎ বাসন-বর্তন, হাঁড়ি-কুড়ি ঐটেতে রেখে সেটাকে জলভর্তি করা হয়। তারই উপরে বাঁদিকের দেয়ালে কয়েকটা হুকে ঝুলছে ধুঁধুলের জালের পরিবর্তে ওয়েস্ট কটন, অতি সূক্ষ্ম তারের জালের স্পঞ্জ, খান দুই ঝাড়ন। আর তার নিচে দেয়ালে গাঁথা শেল্‌ফের উপর ভিমজাতীয় (ওদের বোধ হয় 'পের্জিল') গুঁড়োর চোঙা, সাবান, আর দু-একটা টুকিটাকি যেগুলো আমি চিনিনে। আমি তো আর জর্মন রান্নাঘরে ছেলেবেলা কাটাইনি। ডানদিকের দেয়ালে গাঁথা, কিংবা ঝোলানো একটা বেশ বড় খোলা শেল্‌ফ। সিন্‌কে হয়তো দু-চার কাৎলি গরম জলও ঢেলে দেওয়া হয়েছে—রান্না শেষ হওয়ার পর যে-টুকু আগুন বেঁচে থাকে, সেটা যাতে করে খামকা নষ্ট না হয়, তাই তখন তার উপর কাৎলি চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং সেই গরম জলে বাসন-কোসনের চর্বি গলাবার জন্যে সিন্‌কে ঢেলে দেওয়া হয়, আর ইতিমধ্যে কেউ কফি বা চা খেতে চাইলে তো কথাই নেই। সিন্‌কের সামনে দেয়ালমুখো হয়ে দাঁড়িয়ে উপর থেকে ভিম্, স্পঞ্জ পেড়ে নিয়ে এক একটা করে হাঁড়ি মাজবে, ঝাড়ন দিয়ে সেটা শুকোবে, তারপর ডান দিকের শেল্‌ফে রাখবে। ভালো হয় যদি একজন মাজে আর অন্যজন ঝাড়ন দিয়ে পোঁছে।

সিন্‌কের ডান দিকে পূবের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে একটি প্রমাণ সাইজের মোক্ষম টেবিল। উপরের তক্তাখানা অন্তত দু ইঞ্চি পুরু হবে। এর উপরেই মাছমাংস-তরকারি কাটাকুটি হয়। তাই তার সর্ব-পৃষ্ঠে ক্রিস্-ক্রস্ ছোট-বড় সব রকম কাটার দাগ। পোয়া ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা বেরবে না যেখানে কোনো দাগ নেই। টেবিলের একপাশে মাংস কোফ্‌তা করার জন্য একটা কল লাগানো আছে। টেবিলের সামনে একটি টুল—কিন্তু জর্মন মেয়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই রান্নার কাজ করতে ভালোবাসে।

সিন্‌কের বাঁদিকে উত্তরের দেয়ালের সঙ্গে গা ঘেঁষে হার্থ, উনুন, যা খুশী বলতে পারেন। প্রায় টেবিল সাইজের একটা লোহার বাক্স। উপরে চারটে উনুনের মুখ। নিচের দরজা খুলে কয়লা পোরা হয়। ভাঙা টুকরো টুকরো পাথুরে কয়লা ছাড়া এরা ব্যবহার করে ব্রিকেট। কয়লা গুঁড়ো করে ইঁটের (ব্রিক্) সাইজে বানানো হয় বলে এগুলোর নাম ব্রিকেট। হাত ময়লা না করে সাঁড়াশি দিয়ে তোলা যায়, আগুনও ধরে খুব তাড়াতাড়ি আর ধুঁয়োও দেয় অত্যল্প। উনুনের পাশে একটা বালতিতে কয়লা, অন্য বালতিতে চিমটেসুদ্ধ একগাদা ব্রিকেট। উনুন থেকে ধুঁয়ো নিকাশের চোঙা বেরিয়ে যেখানে দেয়ালে গিয়ে ঢুকেছে তারই ডান পাশে দেয়ালে গাঁথা আরেকটা শেল্‌ফ। তাতে বড় বড় জার্। কোনোটাতে লেখা 'মেল'—ময়দা, কোনোটাতে 'ৎসুকার'—চিনি, কোনোটাতে 'জাল্‌ৎস্'—নুন। তামচীনির (স্টোন-ওয়েয়ার) জারগুলো পোড়াবার আগেই কথাগুলো লেখা হয়েছিলো বলে ওগুলো কখনো মুছে যাবে না[৩]। তারপর বোতল বোতল তেল, সিরকা ইত্যাদি তরল পদার্থ। সর্বশেষে মার্গরীন, মাখন আরো কি সব।

ঘরের মাঝখানে খাবার টেবিল।

ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে—অর্থাৎ সিন্‌কের তির্যক্ কোণে—একখানা পুরনো নিচু আর্ম-চেয়ার। দক্ষিণ থেকে ঘরে ঢুকতেই বাঁদিকে পড়ে। এ-চেয়ারে ঠাকুরমা বসে বসে ঢোলেন। সামনের ছোট ফুটস্টুল বা পাদপীঠর উপর পা রেখে।

এদের ড্রইং-রুম-কম্-ডাইনিং রুম আছে। কিন্তু তার ব্যবহার বড় একটা হয় না। সেটা যেন বড্ড পোশাকী। বসে সুখ পাওয়া যায়

---

৩ 'স্টোন-ওয়েয়ার' শব্দ বাংলা অভিধানে 'পাথরের বাসন' বলা হয়। আসলে ওটা সবচেয়ে নিরেস পর্সেলিন বা 'গ্লেজড্ পটারি' বলা যেতে পারে। তাম্রবর্ণের চীনমাটি বলে এ সব জারকে পূববাঙলায় তাম্-চীনি বলে। উভয় বাঙলায়ই এগুলো ব্যবহার হয় প্রধানত আচার রাখার জন্য।

না, কথাবার্তা কেমন যেন জমে না। বন্ধ ঘরের কেমন যেন একটা ভ্যাপসা গন্ধ।

আর এ-ঘরে কেমন যেন একটা স্বচ্ছতা, খোলাখুলি ভাব। কেউ যেন কারো পর নয়।

(৮)

কুকু-কুকু, কুকু-কুকু, কুকু-কুকু!

এ কি?

এত যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রান্নাঘরের বর্ণনা দিলুম, ঘড়িটা গিয়েছি বিলকুল ভুলে। লক্ষ্যই করিনি। পর্যবেক্ষণ শক্তি আমার বিলক্ষণ অক্ষম বলে ছেলেবেলায়ই আমার গুরুমশাই আমাকে 'রাত্র্যন্ধ, দিবান্ধ' ইত্যাদি উত্তম উত্তম খেতাবে বিভূষিত করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, আমাদ্বারা আর যা হোক হোক সাহিত্যিক হওয়া হবে না। আমার দোষের মধ্যে, লাটসায়েবের কুকুরের যে একটা ঠ্যাঙ নেই, সেটা আমি লক্ষ্য করিনি। এবার সেটা পুনরায় সপ্রমাণ হল। অবশ্য আমার একমাত্র সান্ত্বনা, মারিয়ানা আমার চেয়ে একমাথা খাটো বলে দেয়াল ঘড়িটা ঠিক আই-লেভেলে ঝোলানো হয়নি।

এসব ঘড়ি সস্তা হলেও এ দেশে বড় একটা আসে না। ছোট্ট একটি বাক্সের উপর ডায়েল লাগানো কিন্তু কাঁচের আবরণ নেই। বাক্সের উপর ছোট্ট একটি কুটিরের মডেল—ব্ল্যাক ফরেস্ট (শুয়ার্ৎর্স্ ভাল্ট—কালো বন) অঞ্চল যে-রকম সচরাচর হয়ে থাকে, এবং কুটিরটি দেখা যাচ্ছে যেন তার পাশ থেকে, কারণ কোনো দরজা সেখানে নেই, আছে একটি হলদে রঙের জানলা—কুটিরটি সবুজ রঙের। প্রতি ঘণ্টায় ফটাস্ করে জানলার দুটি পাট খুলে যায় আর ভিতর থেকে লাফ দিয়ে তার চৌকাঠে বসে একটি ছোট্ট পাখি মাথা দোলাতে দোলাতে কু-কু করে জানিয়ে দেয় কটা বেজেছে।

তারপর সে ভিতরে ডুব মারে আর সঙ্গে সঙ্গে জানলার দুটি পাট কটাস্ করে বন্ধ হয়ে যায়।

ব্ল্যাক ফরেস্টের কুটিরশিল্প। এ দেশে রপ্তানি হতে শুনিনি। হলেও বেকার হবে। এতটুকু কাঁচের আবরণ যে ঘড়ির কোথাও নেই সে ঘড়ি এই ধুলো-বালির দেশে দু দিনেই ধূলিশয্যা গ্রহণ করবে।

আমি চমকে উঠে বললুম, 'সর্বনাশ! তিনটে বেজে গেছে। আমাকে যে এগুতে হবে।'

আমাদের তখন সবেমাত্র স্যুপ্ পর্ব সমাধান হয়েছে। ঠাকুরমা স্যুপ শেষ করে চুপচাপ বসে আছেন।

মারিয়ানা বললে, 'এগুতে হবে মানে? খাবার শেষ করে তো যাবে। আজ যে রোববারের লাঞ্চ—তার উপর রয়েছে রে রাগু।'

'রাগু' কথাটা ফরাসী। অর্থাৎ কোফ্‌তা-কাটা মাংস। আর 'রে' মানে হরিণ।

তার সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটা থাকে ব্যাঙের ছাতা (এ দেশে মেদিনীপুর বাঁকুড়ার লোক এর তত্ত্ব কিছু কিছু জানে, কাশ্মীরীরা ভালো করেই জানে এবং টিনে করে রপ্তানি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে), প্যাঁজ আর ট্রাফ্‌ল্—অবশ্য যদি এই শেষোক্ত বস্তুটি পাওয়া যায়।[১] রীতিমত রাজভোগ!

---

১ ট্রাফ্‌ল্ নামক সব্জিটি জন্মায় মাটির কয়েক ইঞ্চি নিচে, প্রধানত ফ্রান্সেই। একমাত্র কুকুর আর শুয়োরই মাটির উপর থেকে গন্ধ পেয়ে এটা খুঁড়ে বের করতে পারে—যদি ট্রাফ্‌ল্ কুকুরের খাদ্য নয়। এ জিনিস বের করার জন্যে মাংসের টুকরোর লোভ দেখিয়ে দেখিয়ে কুকুরকে ট্রেন করতে হয়। বেচারী কুকুরগুলোকে স্বার্থপর মানুষ অত্যন্ত কম খাইয়ে খাইয়ে রাখে—না হলে তারা ট্রাফ্‌লের সন্ধান করে না। আর কুকুরগুলোকে ট্রাফ্‌ল্ শিকারী খোঁজবার সময় যে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে সে শোনবার মত—'ও জাদু, ও বাছা, ও আমার সোনার খনি! এগো না বাবা, খোঁজ না ধন!' —আরো কত কী! শেষের দিকে বেচারী কুকুরকে মাংসের পরিবর্তে বাসী রুটির ছোট ছোট টুকরো দিয়ে ভোলানো হয়। ট্রাফ্‌লের নাকি এফ্রোডিসিয়াক গুণ আছে। ফ্রান্স ঐ দিয়ে বছরে লক্ষ লক্ষ টাকা কামায়।

আমি শুধালুম, 'হরিণের মাংস পেলে কোথায় ?'

বললে, 'দাঁড়াও, রাগুটা নিয়ে আসি।'

আমার আর মারিয়ানার স্যুপ প্লেটের নিচে আগের থেকেই মারিয়ানা প্রধান খাদ্যের প্লেট সাজিয়ে রেখেছিল। এখন শুধু স্যুপ প্লেটই উপর থেকে সরাতে হল। শুনেছি রাশাতে চার পদের লাঞ্চ ডিনার হলে এরকম ধারা চার চারখানা প্লেট একটার উপর আরেকটা সাজানো হয়। যেমন যেমন এক এক পদ খাওয়া শেষ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে সেই প্লেট সরানো হয়—প্রতিবারে নূতন করে পরের পদের জন্যে প্লেট সাজাতে হয় না। একথা আমি শুনেছি, কারণ একাধিক রাশানের বাড়িতে আমি খেয়েছি—বলশী এবং জারিস্ট দুই সম্প্রদায়েরই, কিন্তু এ-ব্যবস্থা দেখিনি। একখানা প্লেটের উপর স্যুপ প্লেট রাখলে উচ্চতায় বিশেষ কিছু হের-ফের হয় না, কিন্তু চারখানা প্লেটের উপর স্যুপ প্লেট রাখলে সে তো নাকের ডগায় পৌঁছে যাবে।

আভ্‌ন্‌ খুলে মারিয়ানা রে রাগু নিয়ে এল।

আমি ঠাকুমার দিকে তাকিয়ে মারিয়ানাকে চোখের ইশারা করলুম।

মারিয়ানা বললে, 'ঠাকুরমা এক স্যুপ ভিন্ন অন্য কিছু খায় না। আমিও না। কিন্তু ঐ না জিজ্ঞেস করলে হরিণের মাংস কোথায় পেলুম ? আমাদের গ্রাম থেকে বেরলে দূরে দক্ষিণে দেখতে পাবে আরেকটা গ্রাম—তার নাম মুফেন্‌-ডর্ফ। তারপর পুরো একটা ক্ষেত পেরিয়ে রুাংঙস্‌-ডর্ফ। তার শেষে নাম করা হোটেল ড্রেজেন—রাইনের পাড়ে। সেখানে কিন্তু ওপারে যাবার খেয়া নেই। তাই কিছুটা দক্ষিণে গিয়ে মেলেম্‌ খেয়াঘাট। ওপারে ক্যোনিগ্‌স্‌-ভিন্টার। সেটা সীবেন-গেবির্গের (সপ্তকুলাচলের) অংশ। তার আরো অনেক দক্ষিণে গিয়ে লরেলাই। ঐ যে তোমার পকেটে রয়েছে হাইনের কবিতার বই তাতে আছে লরেলাই সম্বন্ধে কবিতা।'[২]

---

২ অধুনা প্রকাশিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা' ('দীপায়ন প্রকাশনা'। 'দেশ' ১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৮ সংখ্যা, পৃ ৪১৮ দ্রঃ) পুস্তিকার ৮৬ ও ৮৭ পৃ পশ্য।

মারিয়ানা ইস্কুল মাস্টারের মত আমাকে বেশ কিছুটা ভূগোল-জ্ঞান দান করে বললে, 'হ্যাঁ, হরিণের মাংসের কথা হচ্ছিল। ঐ যে মুফেন্ ডর্ফ (ডর্ফ = গ্রাম) সেটা এমনি অজ যে আমরা ওটাকে ডাকি মুফ্রিকা—আফ্রিকার মত সভ্যতা থেকে অনেক দূরে আছে বলে আফ্রিকার 'ফ্রিকা'টি জুড়ে নিয়ে। আর আফ্রিকাবাসীকে যেমন জর্মনে বলা হয় 'আফ্রিকানার' ঠিক তেমনি ওদের আমরা ডাকি 'মুফিকানার'।'

আমি হেসে বললুম, 'তোমাদের রসবোধ আছে।'

মারিয়ানা বললে, 'ঐ মুফ্রিকার কাকা হান্স্ বাবার বন্ধু। আসলে অবশ্য বাবার বন্ধু বলেই ওঁকে ডাকি অঙ্কল্ হান্স। দুজনাতে প্রতি শনিবারে শিকারে যেত। যতদিন বাবা বেঁচেছিল। এখন একা যায়। যেদিন ভালো শিকার জোটে সেদিন মাংসের খানিকটে আমায় দিয়ে যায়। ব্যাঙের ছাতা আমি নিজে বন থেকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি আর প্যাঁজ তো ঘরে আছেই।'

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, লক্ষ্মী মেয়ে, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

ঠাকুরমার স্যুপপ্লেট সরানোর পর তিনি হাত দুটি একজোড় করে অতি শান্তভাবে আমাদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিলেন। মাঝে মাঝে অল্প মৃদু হাস্য করলে গাল দুটি টুকটুকে লাল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সর্ব শরীরের রক্ত ছুটে লাল গাল দুটিতে আশ্রয় নিচ্ছিল—হায়, বুড়িদের গায়ে ক' ফোঁটা রক্তই বা থাকে!

এবার তিনি মুখ খুলে বললেন, 'মারিয়ানা না বললো তুমি পায়ে হেঁটে হাইকিঙে বেরিয়েছো, তবে তোমার তাড়া কিসের? এ গ্রাম যা, সামনের গ্রামও তা। গ্রামে গ্রামে তফাত কোথায়? শহরে শহরে থাকে। কারণ ভগবান বানিয়েছেন গ্রাম, আর মানুষ বানিয়েছে শহর।'

এক লম্ফে চেয়ার ছেড়ে মারিয়ানা ঠাকুরমার কাছে গিয়ে দুহাতে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে গালে ঝপাঝপ গণ্ডা তিনেক চুমো খেলে। আর সঙ্গে সঙ্গে 'ও'! তুমি কি লক্ষ্মীটি ঠাকুরমা! তোমার মত মেয়ে

হয় না ঠাকুরমা ! আমার কথা শুনতে যাবে কেন ঐ ভবঘুরেটা। দেখা হয়েছে অবধি শুধু পালাই পালাই করছে।'

ঠাকুরমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'হয়েছে, হয়েছে। তুই খাওয়া শেষ কর।'

রে রাগুর সঙ্গে নোনা জলে সেদ্ধ করা আলু আর জাওয়ার ক্রাউট।

ঠাকুরমা ব্যতিব্যস্ত না হয়ে বললেন, 'ক্রাউট খেতে ভালোবাসো ? আমি তো শুনেছি, বিদেশীরা ও জিনিসটা বড় একটা পছন্দ করে না।'

আমি বললুম, 'জিনিসটা যে বাঁধাকপির টক আচার। সত্যি বলতে কি, প্রথম দিন আমার ভালো লাগেনি। এখন সপ্তাহে নিদেন তিন দিন আমার চাই-ই চাই। জানেন, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী পিয়েল লাভাল যখন একবার বার্লিনে আসেন তখন তাঁর দেশবাসী কে যেন তাঁকে বলেছিল জর্মনদের মত জাওয়ার ক্রাউট কেউ বানাতে পারে না। সে কথা তাঁর মনে পড়ল যেদিন ভোরে তিনি চলে যাবেন তার আগের রাত্রে আড়াইটার সময়। রেস্তোরাঁ তখন বন্ধ ; হলে কি হয় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী, তিনি খাবেন জাওয়ার ক্রাউট—যোগাড় করতেই হল।

সেই রাত সাড়ে চৌদ্দটার সময় ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী সোল্লাসে খেলেন জাওয়ার ক্রাউট।'

আমি যে এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা পছন্দ করি না তার প্রধান কারণ ঐ খাদ্যটি সম্বন্ধে তিনি অচেতন।

* * * *

জাওয়ার ক্রাউট নিয়ে বড্ড বেশী বাগাড়ম্বর করার বাসনা নেই। আমাদের কাসুন্দোর মত ওতে বড্ড বয়নাক্কার খটিনটি। তার কারণ সমস্যা দু'জনারই এক। তেল, নুন, সিরকা, চিনি এসব কোনো সংরক্ষণকারী বস্তু অর্থাৎ প্রিজারভেটিভ ব্যবহার না করে কিংবা যতদূর সম্ভব অল্প ব্যবহার করে কি প্রকারে খাদ্যবস্তু বহুকাল ধরে আহারোপযোগী করে রাখা যায়, কাসুন্দো ও জাওয়ার ক্রাউটের

এই নিয়ে একই শিরঃপীড়া। সেই কারণেই বোধ হয় কাসুন্দো বানাবার 'আস্থ' পূব বাঙলায় বেশী পরিবারে নেই। মুসলমানরা আদপেই কাসুন্দো বানাতে পারে না বলে কাসুন্দো বানাবার সময় অক্ষয় তৃতীয়ায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বড্ড বেড়ে যায়। বানাবার 'আস্থ' না থাকলেও সহাস্য বদনে খাবার 'আস্থ' সকলেরই আছে।

পশ্চিমের উপর খুদাতালার মেহেরবানিও অত্যধিক। ওদের তরি-তরকারি ফলমূল বেবাক তৈরী হয়ে ওঠে গ্রীষ্মের শেষে। তার পরেই শীত এসে খাদ্যবস্তু সংরক্ষণে সাহায্য করে। আমাদের উত্তমে উত্তম তরি-তরকারি তৈরী হয় শীতের শেষে—তার পরই আসে গ্রীষ্মকাল—সংরক্ষণকর্মে প্রকৃতির কোনোই সহায়তা পাইনে। ফল পাকে গ্রীষ্মকালে—তার পরই এসে যায় ভ্যাপসা বর্ষা—মসনে-ছাতি পড়ে সব-কুছ বরবাদ। পচা বর্ষার শেষের দিকে দুই নয়া পয়সার রোদ্দুর ওঠা মাত্রই গিন্নীমা'রা আচারের বোয়াম নিয়ে টাট্টুঘোড়ার বেগে বেরন ঘর থেকে। ফের পইন্ট জিরো ইলশে গুঁড়ি নাবামাত্র তাঁরা 'ঐয্‌যা, গেল গেল, ধর ধর' বলে বেরন রকেট-পারা। আর বাইবেলী ভাষায় 'ধন্য যাহারা সরল হৃদয়'—অর্থাৎ ভোলা-মন, তাদের তো সর্বনাশ।

জানি, তেলে টইটম্বুর করে রাখলে মসনে পড়ে না, কিন্তু বড্ড বেশী তেল চিটচিটে আচার খেয়ে সুখ নেই। তদুপরি ভেজাল তেলের ঠেলায় এ গ্রীষ্মে মোক্ষম মার খেয়ে আমি আচারের মাথায় ঘোল ঢেলে দিয়ে বিদায় দিয়েছি। এখন রইলেন শুধু জারক নেবু, আর বাজারের ওঁচা আচার!

আমি বললুম, 'মারিয়ানা, ঠাকুমার সেই "লাঙে হের, লাঙে হের"-পুরনো দিনের গল্প বলো না?'

অপরাহ্নের ট্যারচা সোনালী রোদ এসে পড়েছে ঠাকুরমার নীল সাদা সেটের উপর আর মারিয়ানার ব্লণ্ড চুলের উপর। চেরী ব্র্যাণ্ডির বেগনী রঙের সঙ্গে সে আলো মিশে গিয়ে ধরেছে এক অদ্ভুত নূতন

রঙ। ডাবরের স্থপের কৌটা কৌটা চর্বির উপর আলো যেন স্থান না পেয়ে ঠিকরে পড়ছে। সে রোদে ঠাকুরমার বরফের মত সাদা চুল যেন সোনালী হয়ে উঠলো। তার পিঠের কালো জামার উপর সে আলো যেন আদর করে হাত বুলোচ্ছে। জানলার পরদা যেমন যেমন হাওয়ায় দুলছে সঙ্গে সঙ্গে আলোর নাচ আরম্ভ হয় ঝকঝকে বাসন-কোসনের উপর, গেলাসের তরল দ্রব্যের উপর আর ঠাকুরমা নাতনীর চুলের উপর।

অনেককাল পর গ্রামাঞ্চলে এসেছি বলে খেতে খেতে শুনছি, রকম-বেরকম পাখির মধুর কূজন। এদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। এরা আর বেশীদিন এখানে থাকবে না। শীত এলে দক্ষিণের দিকে পাড়ি দেবে। তখন গ্রাম শহরের তফাত ঘুচে যাবে।

আসবার সময় এক সারি পপলার গাছের নিচু দিয়ে ছায়ায় ছায়ায় বাড়ি পৌঁছেছিলুম। রবিবারের অপরাহ্ণ বলে এখনো সমস্ত গ্রাম সুষুপ্ত—শুধু ঐ চিনারের মগডালের ভিতর দিয়ে বাতাস চলার সামান্য গুঞ্জরণ ধ্বনি কানে আসছে, কিংবা কি এদেরই ডোবার পাড়ে যে নুয়ে পড়া উইপিং উইলো দেখেছি তারই ভিতর দিয়ে বাতাস ঘুরে ফিরে বেরবার পথ পাচ্ছে না? এ গাছের জলের উপর লুটিয়ে-পড়া, মাথার সমস্ত চুল এলোমেলো করে দিয়ে সদ্য-বিধবার মত গুমরে গুমরে যেন কান্নার ক্ষীণ রব ছাড়া—এগুলো আমার মনকে বড় বেদনায় ভরে দেয়। দেশের শিউলি ফুলের কথা মনে পড়ে। তার নামও কেউ কেউ ইংরিজীতে দিয়েছে 'সরো ফ্লাওয়ার' বিষাদ-কুসুম।

ঠাকুরমা ঢুলতে ঢুলতে হঠাৎ জেগে উঠলেন। জানিনে, বোধহয় 'লাণ্ডে হেরের' ফাঁড়া কাটাবার জন্য মারিয়ানাকে শুধোলেন, 'কাল হের হান্‌সের সঙ্গে কি কথাবার্তা হল?'

মারিয়ানা আমার দিকে তাকিয়ে দুষ্ট হাসি হেসে বললে, 'দেখলে? তা সে যাক্‌। কিন্তু জানো, হান্‌স্ কাকা বড় মজার

লোক। যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলে—কোন্‌টা যে সত্যি, কোন্‌টা যে তার বানানো কিচ্ছুটি বোঝার উপায় নেই। কাল বলছিল, একবার হান্‌স্‌ কাকা আর বাবা নাকি লড়াইয়ের ছুটি পেয়ে ত্বজনা শিকারে গেছে—তখন লড়াইয়ের সময় বলে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে বড্ড কড়াক্কড়ি। হঠাৎ একটা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়েছে পুলিস, দেখতে চেয়েছে লাইসেন্স। পুলিসকে যেই না দেখা অমনি হান্‌স্‌ কাকা বাবাকে ফেলে দিয়ে চোঁ চাঁ ছুট। পুলিসও ধরবে বলে ছুটেছে পিছনে। ওদিকে হান্‌স কাকা মোটা-সোটা গান্দা-গোন্দা মানুষ। আধ মাইল যেতে না যেতেই পুলিস তাকে ধরে ফেলেছে। কাকা বললে, পুলিস নাকি হুঙ্কার দিয়ে লাইসেন্স চাইলে। কাকাও নাকি ভালো মানুষের মত গোবেচারী মুখ করে পকেট থেকে লাইসেন্স বের করে দেখালে।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'লাইসেন্স ছিল তবে ওরকম পাগলের মত ছুটলো কেন?'

মারিয়ানা বললে, 'আহ্‌, শোনোই না। তোমার কিছুতেই সবুর সয় না। পুলিসও তোমারই মত বেকুব বনে ঐ প্রশ্নই শুধালে। তখন হান্‌স্‌ কাকা নাকি হাসতে হাসতে গড়াগড়ি দিয়ে বললে, "আমার লাইসেন্স আছে, কিন্তু আমার বন্ধুর নেই। সে এতক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে।" পুলিস নাকি প্রায় তাকে মারতে তাড়া করেছিল।'

আমি হাসতে হাসতে বললুম, 'খাসা গল্প। পুলিসের তখনকার মুখের ভাবটা দেখবার আমার বড় ইচ্ছে হচ্ছে। জানো আমাকেও একবার পুলিস তাড়া করেছিল। ওরে বাপ রে বাপ! সে কী ছুট, কী ছুট, কিন্তু ধরতে পারেনি।'

মারিয়ানার কচি মুখ ভয়ে শুকিয়ে গিয়েছে। হোঁচট খেতে খেতে শুধোলে, 'কেন, কি হয়েছিলো?'

আমি বললুম, 'কি আর হবে, যা আকছারই হয়ে থাকে। পুলিসে স্টুডেন্টে পাল্লা।'

মারিয়ানা নির্বাক ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

আমি শুধালুম, 'কি হল? আমার মাথার পিছনে ভূত এসে দাঁড়িয়েছে নাকি?'

তোৎলাতে তোৎলাতে শুধোলে, 'তুমি য়ুনিভার্সিটির স্টুডেন্ট!'

আমার তখনো জানা ছিল না, এ দেশের গ্রামাঞ্চলের লোক বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় একটা যায় না। কাজেই এখানে তাদের বড় সম্মান, রীতিমত সমীহ করে চলা হয়। তাই আমি আমার সফরের শেষের দিকে কথাটা বেবাক চেপে যেতুম। আমি ট্র্যাম্প, ট্র্যাম্পই সই। কী হবে ভদ্রলোক সেজে।

মারিয়ানা বললে, 'তাই বলো। আমিও ভাবছি, ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে নখের ভিতর দু'ইঞ্চি ময়লা নেই কেন? ট্র্যাম্পই যদি হবে তবে গোগ্রাসে গিলছে না কেন? খেতে খেতে অন্তত বার তিনেক ছুরিটা মুখে পুরলো কেন?'

আমি অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে বললুম, 'ভুলগুলো মেরামত করে নেব।'

'ধ্যৎ! ওগুলো নোংরামি। শিখতে হয় নাকি?'

আমি বললুম, 'কোথায় স্টুডেন্ট বলে পরিচয় দিলে লাভ, আর কোথায় ট্র্যাম্প সাজলে লাভ এখনো ঠিক ঠাহর করে উঠতে পারিনি। যখন যেটা কাজে লাগে সেইটে করতে হবে তো। এই তো যেমন তুমি। মনে হচ্ছে ট্র্যাম্পের কদরই তোমার কাছে বেশী।'

এইটুকু মেয়ে। কি বা জানে, কীই বা বোঝে। তবু তার মুখে বেদনার ছায়া পড়লো। বড় বড় দুই চোখ মেলে নিঃসঙ্কোচে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমাকে আমার ভালো লাগে, তা তুমি ট্র্যাম্পই হও, আর স্টুডেন্টই হও।'

পঞ্চদশীর স্মরণে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'অকারণ বেদনার ছায়া ঘনায় মনের দিগন্তে, ছল ছল জল এনে দেয় নয়নপাতে।' এ মেয়ে

একদিন বড় হবে। ভালোবাসতে শিখবে। সেইদিনের আগমনী আজকের দিনের এই 'ক্বচিৎ জাগরিত বিহঙ্গ-কাকলীতে।'

(৯)

এবারে কিন্তু মারিয়ানা সেয়ানা। আহারান্তে উপাসনা আরম্ভ করলে, 'তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানাই, হে প্রভু সর্বশক্তিমান' দিয়ে এবং শেষ করলো পরলোকগত খৃষ্টাত্মাদের স্মরণে।

এসব প্রার্থনার সুন্দর অনুবাদ করা প্রায় অসম্ভব। সর্ব ভাষার সর্ব প্রার্থনার বেলাই তাই। প্রণব কিংবা 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণম্ মুখম তেন মাহম্পাহি নিত্যম্'-এর বাঙলা অনুবাদ হয় না। আমি বহু বৎসর ধরে মুসলমানের প্রধান উপাসনা, 'ফাতিহা' অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। আজ পর্যন্ত কোনো অনুবাদই মনকে প্রসন্ন করতে পারেনি। 'আভে মারিয়া' মন্ত্রটি অতি ক্ষুদ্র। ট্রামে-বাসে ঘরে-বাইরে বারবার মনে মনে এটির অনুবাদ করেছি—আঠারো বছর ধরে, এবং এখনো করছি—কোনোটাই মনঃপূত হয় না। দেশের ট্রেনে আমার পরিচিত এক ক্যাথলিক পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে আমার অনেকক্ষণ ধরে ঐ 'আভে মারিয়া'র দুটি শব্দ নিয়ে আলোচনা হয়। ঐ মন্ত্রে মা-মেরির বিশেষণে লাতিনে আছে, 'গ্রাৎসিয়া প্লেন', ইংরিজীতে ফুল অব গ্রেস', জর্মানে 'ফল্ ডের গ্নাডে'! আমি বাংলা করেছিলুম 'করুণাময়ী'। পাদ্রীসায়েবের সেটা জানা ছিল। শব্দটা আমার মনঃপূত হয়নি, কিন্তু দুজনাতে বহু চেষ্টা করেও পছন্দসই শব্দ বের করতে পারলুম না।

কাজেই মারিয়ানার প্রার্থনাগুলোর বাঙলা অনুবাদ উপস্থিত মুলতুবি থাক।

মারিয়ানা বাসন-কোসন হাঁড়ি-বর্তন সিন্কে ফেলেছে।

আমি উঠে গিয়ে সিন্কের সামনে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আমি মাজি: তুমি পোঁছো।'

জুতো দিয়ে কাঠের মেঝেতে ঠোক্কর মেরে মারিয়ানা বললে, 'একদম অসম্ভব! তার চেয়ে তুমি ঐ টুলটার উপরে বসে আমাকে ইণ্ডিয়ার গল্প বলো।'

এ স্থলে আমার পাঠকদের বলে রাখা ভালো, যে এ-কাহিনীতে অনেক কিছু কাট-ছাঁট বাদ-সাদ দিয়েই আমি লিখছি। কারণ ভারতবর্ষ কত বড় দেশ, পাহাড় নদী আছে কি না, লোকে কি খায়, মেয়েদের বিয়ে ক'বছর বয়সে হয়, এসব জানবার কৌতূহল বাঙালী পাঠকের হওয়ার কথা নয়, আর হলেও জর্মনির গ্রামাঞ্চলে হাইকিঙের বর্ণনায় সেগুলো নিশ্চয়ই অবান্তর ঠেকবে। অথচ জর্মনরা ঐসব প্রশ্নই বারবার জিজ্ঞেস করে বলে কথাবার্তার বারো আনা পরিমাণই ভারতবর্ষ নিয়ে। তাই পাঠক ভাববেন না, জর্মন জনপদবাসী আমার সামনে আপন দেশ নিয়েই বড়ফাট্টাই করেছে, আর-কিছু শুনতে চায়নি।

আমি বললুম, 'দেখো মারিয়ানা, তুমি যে বললে, আমাকে তোমার ভালো লাগে, সেটা নিছক মুখের কথা। আমাকে খাইয়েছো ব'লে আমাকে দিয়ে বাসন মাজিয়ে নিতে চাও না—কারণ তা হলে খাওয়ানোটা মজুরি হয়ে দাঁড়ায়। এসব হিসেব লোকে করে, যে-জন আপন নয়, তার সঙ্গে। আপনজনকে মানুষ সব কর্ম অকর্মের অংশীদার করে।' এইটুকু বলে, রাস্তার নাসপাতিওলা যে আমাকে শেষ পর্যন্ত তার গাড়ি ঠেলতে দিয়েছিল সে-কথাও বললুম।

এ-কথাটা বলা হয়তো আমার উচিত হয় নি। টম্-বয়্ হোক, আর হন্টরওয়ালীই হোক, মেয়েছেলে তো মেয়েছেলে। দেখি, মারিয়ানার চোখ টলটল করছে। আমাদের দেশে মানুষের নীল চোখ হয় না, আকাশের হয়। তাই রবীন্দ্রনাথ গেয়েছেন 'জল ভরেছে ঐ গগনের নীল-নয়নের কোণে—।' দেশে যে জিনিস আকাশে দেখেছি, এখানে সেটা মানুষের চোখে দেখলুম। অবশ্য এদেশের আকাশ কিন্তু আমাদের আকাশের মত ঘন নীল, ফিরোজা নীল হয় না।

আমি তাড়াতাড়ি এই সজল সংকট কাটাবার জন্যে ঝাড়ন নিয়ে মারিয়ানার পাশে দাঁড়ালুম। সে কিছু না বলে একখানা প্লেট আমার দিকে এগিয়ে দিলে।

আমি সংকটের সম্পূর্ণ অবসান করার জন্য মাজার গুঁড়ো একটা হাঁড়ির উপর ছড়াতে ছড়াতে শুধালুম, 'ঠাকুরমা দুপুরবেলা ঘুমোয় না?'

'ঐ চেয়ারেই। দিন রাতের আঠারো ঘণ্টা ওরই উপরে কাটায়, রাত্রেও অনেক বলে কয়ে তাকে শোবার ঘরে নিয়ে যাই। মাঝে মাঝে কার্ল অবশ্য ওকে বেড়াতে নিয়ে যায়।'

আমি শুধালুম, 'কার্ল? কুকুরটা? তুমি নিয়ে যাও না?'

'ঠাকুরমা কার্লের সঙ্গে যেতেই পছন্দ করে। লীশে ঢিল পড়লেই ঠাকুরমা থেমে যায়, টান পড়তেই আস্তে আস্তে এগোয়। ঠাকুরমা বলে, ওতেই নাকি তার সুবিধে বেশী। জানো, লোকে আমার কথা বিশ্বাস করে না, যখন বলি, কার্ল ঠিক বুঝতে পারে কখন বৃষ্টি নামবে। তার সম্ভাবনা দেখতে পেলেই সে ঠাকুরমাকে বাড়ি ফেরত নিয়ে আসে।'

হঠাৎ কার্লের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, 'ঠাকুরমাকে বেড়াতে নিয়ে যাবিনে?'

সঙ্গে সঙ্গে কার্ল পাশের ঘরে গিয়ে তার কলার লীশ মুখে করে নিয়ে এসে ঠাকুরমার কোলে রাখল। তিনি চমকে উঠে বললেন—হয়তো বা ইতিমধ্যে তাঁর তন্দ্রা এসে গিয়েছিল—'আমি এখন বেড়াতে যাবো কি করে?'

মারিয়ানা হেসে বললে, 'না ঠাকুরমা, আমি শুধু ওকে দেখাচ্ছিলুম কার্ল কি রকম চালাক।' তারপর কার্লকে বললে, 'যাও কার্ল! আজ ঠাকুরমা বেরবে না।' স্পষ্ট বোঝা গেল, কার্ল সাতিশয় ক্ষুণ্ণ মনে লীশ কলার মুখে তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। এবং খুব সম্ভব, অভিমান করে ফিরে এল না।

আমি শুধালুম, 'ঠাকুরমা কারো বাড়িতে যায়?'

মারিয়ানা বললে, 'রোববার দিন গির্জেয়। অন্যদিন হলে পাদ্রী-সায়েবের বাড়ি। আর মাঝে মাঝে আমাকে নিয়ে গোরস্তান যায়। আমার কিন্তু খুব ভালো লাগে না। বাবা তো সেখানে নেই, শুধু মা আছে। তাকেও চিনিনে।'

ওর বলার ধরনটা এমনই সরল আর স্বাভাবিক যে আমার চোখে জল এসে গেছে। পাছে সে সেটা দেখে ফেলে তাই শেল্‌ফটার কাছে গিয়ে শুকনো বাসনগুলো একপাশে সরাতে লাগলুম। তাতেও দেখলুম, কোনো কাজ হয় না। তখন বুঝলুম, এ বোঝা নামিয়ে ফেলাই ভালো।

ফের মারিয়ানার কাছে এসে বললুম, 'আমাদের দেশের কবির একটি কবিতা শুনবে?'

উৎসাহের সঙ্গে বললে, 'নিশ্চয়ই!'

আমি বললুম, 'অনুবাদে কিন্তু অনেকখানি রস মারা যায়। তবু শোনো :

"মনে পড়া মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু কখন খেলতে গিয়ে
হঠাৎ অকারণে
একটা কী সুর গুনগুনিয়ে
কানে আমার বাজে,
মায়ের কথা মিলায় যেন
আমার খেলার মাঝে।
মা বুঝি গান গাইত, আমার
দোলনা ঠেলে ঠেলে ;
মা গিয়েছে যেতে যেতে
গানটি গেছে ফেলে।
মাকে আমার পড়ে না মনে।
শুধু যখন বসি গিয়ে

শোবার ঘরের কোণে,
জানলা থেকে তাকাই দূরে
নীল আকাশের দিকে
মনে হয়, মা আমার পানে
চাইছে অনিমিখে।
কোলের 'পরে ধ'রে কবে
দেখতো আমায় চেয়ে,
সেই চাউনি রেখে গেছে
সারা আকাশ ছেয়ে !!"

এ কবিতার অনুবাদ যত কাঁচা জর্মনে যে কেউ করুক-না কেন, মা-হারা কচি হৃদয়কে নাড়া দেবেই দেবে। হয়তো এ কবিতাটি মারিয়ানাকে শোনানো আমার উচিত হয়নি, কিন্তু ইয়োরোপীয় সাহিত্যে মাকে নিয়ে কবিতা এত কম, এবং আমার দেশের কবির এত সুন্দর একটি কবিতা—এ প্রলোভন আমি সংবরণ করতে পারিনি বললে ভুল বলা হবে—আমি কেমন যেন আপন অজানাতেই কবিতাটি আবৃত্তি করে ফেলেছি।

রবীন্দ্রনাথ 'পলাতকা' লেখার পর প্রায় চার বছর কোনো কবিতাই লেখেননি কিংবা অতি অল্পই লিখেছিলেন। তারপর কয়েক-দিনের ভিতর অনেকগুলি কবিতা লিখে আমাদের ডেকে পাঠিয়ে সেগুলি পড়ে শোনালেন। 'মাকে আমার পড়ে না মনে' তারই একটি। এ কবিতাটি শুনে আমরা সবাই যেন অবশ হয়ে গিয়ে-ছিলুম। শেষটায় কে একজন যেন গুরুদেবকে শুধালে, ঠিক এই ধরনের কবিতা তিনি আরো রচনা করেন না কেন? তিনি বললেন, মা-হারা শিশু তাঁর কাছে এমনই ট্রাজেডি বলে মনে হয় যে, ঐ নিয়ে কবিতা লিখতে তাঁর মন যায় না।

আমার দৃঢ়বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথ যদি সেদিন মারিয়ানার মুখচ্ছবি দেখতেন তবে তিনি এ-কবিতাটি তাঁর কাব্য থেকে সরিয়ে ফেলতেন,

এবং আমাদের উপর হুকুম করতেন, আমরা যেন কখনো আর এটি আবৃত্তি না করি।

'ভেজা চোখেই মারিয়ানা শুধালো, 'তোমার নিশ্চয়ই মা আছে, আর তুমি তাকে খুব ভালোবাসো?'

আমি আশ্চর্য হয়ে শুধালুম, 'তুমি কি করে জানলে?'

বললে, 'এ কবিতাটি তারই হৃদয় খুব স্পর্শ করাব যার মা নেই, আর যে মাকে খুব ভালোবাসে। আর আমার মনে হচ্ছিল, তোমার মা না থাকলে তুমি এ কবিতাটি আমাকে শোনাতে না।'

আমি বিস্ময়ে হতবাক। এইটুকু মেয়ে কি করে এতখানি বুঝলো। এতখানি হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারলো। তখন আবার নূতন করে আমি সচেতন হলুম, ছোটদের আমরা যতখানি ছোট মনে করি ওরা অতখানি ছোট নয়। বিশেষ করে অনুভূতির ক্ষেত্রে। এবং সেখানেও যদি বাচ্চাটি মা-হারা হয় তবে তার বেদনা-কাতরতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তার সঙ্গে কথা কইতে হয় বেশ ভেবে-চিন্তে।

এবারে শুধালো শেষ মোক্ষম প্রশ্ন: 'তুমি যে এতদূর বিদেশে চলে এসেছো তাই নিয়ে তোমার মা কিছু বললে না? এই যে ঠাকুরমা সমস্ত দিনরাত ঐ দোরের পাশের চেয়ারটায় বসে থাকতে চায় কেন জানো? বাবা ঠিক সেটারই পাশের দরজা দিয়ে সব সময় বাড়ি ঢুকত—সদর দরজা দিয়ে নয়—অবশ্য আমার শোনা কথা। বাবা যেন সর্বপ্রথম ঠাকুরমাকে দেখতে পায়, ঠাকুরমাই যেন বাবাকে দেখতে পায়। লড়াইয়ের সময়েই সেটা আরম্ভ হল। বাবা যে কখন ছুটি পাবে, কখন বাড়ি পৌঁছবে তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ঠাকুরমা দিবারাত্তির ঐ চেয়ারটার উপর কাটাতো। এখনো সে অভ্যাস ছাড়তে পারে না।'

আমি মিনতি করে বললুম, 'আর থাক, মারিয়ানা।'

কান্না-হাসি হেসে বললে, 'আচ্ছা, তবে এ দিকটা থাক। এখন আমার কথার উত্তর দাও? তোমার মা কি বলে?'

আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললুম, 'মাকে ফেলে দূরে চলে আসাটাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ। কিন্তু কি করবো বলো। ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি, তার ইস্কুল-কলেজে পড়বো না—অবশ্য গাঁধীর আদেশে। বিদেশে না গিয়ে উপায় কি? কিন্তু মা কি সেটা বোঝে?'

এবারে মারিয়ানা হেসে উঠলো। বললে, 'তুমি ভারী বোকা। মারা সব বোঝে, সব মাপ করে দেয়।'

এর কথাই ঠিক। এ তো একদিন মা হবে।

আবার বললে, 'তোমার কিচ্ছুটি ভাববার নেই। দাঁড়াও, তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হল শেষ প্লেট। এটা পুঁছে নিয়ে বেশ করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নাও। এই যে বোতলে তরল সাবান আছে তাতে নেবুর খুশবাই মাখানো আছে। তোমাকে একটা কবিতা পড়ে শোনাবো—তুমি তোমারটা শোনালে না?'

আমি হাত ধুয়ে ঠাকুমার মুখোমুখি দেয়ালের চেয়ারে এসে বসলুম।

রবরের এপ্রন্ খুলতে খুলতে মারিয়ানা বললে, 'কই, দাও তোমার বইখানা। ঐ যাতে হাইনের কবিতা আছে। আশ্চর্য এই যোগাযোগ। মাত্র কয়েক দিন আগে আমরা ক্লাসে কবিতাটি পড়েছি।'

এক ঝটকায় কবিতাটি বের করে বেশ সুন্দর গলায়, সুস্পষ্ট উচ্চারণে পড়তে আরম্ভ করলো,

"আন্ মাইনে মুটার"—মাতার উদ্দেশে

'ইষ বিন্স্ গেভোন্ট্—'

সমস্ত কবিতাটি পড়ে শেষের কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলে একাধিকবার :—

''আজ ফিরিয়াছে মন ভবনে আপন,
যেথা মা গো, তুমি মোরে ডাকিছ সদাই।
আজ দেখিলাম যাহা দৃষ্টিতে তোমার,
সেই তো মমতা, চির আরাধ্য আমার।''[১]

আমি অস্বীকার করবো না, কবিতাটি আমার মনে অপূর্ব শান্তি এনে দিল। অন্য পরিবেশে হয়তো কবিতাটি আমার হৃদয়ের এতটা গভীরে প্রবেশ করতো না। বিশেষ করে ছাপাতে পড়া এক জিনিস আর একটি বারো তেরো বছরের মেয়ে—অবশ্য তার কবিতা পাঠ, তার রসবোধ দেখে তার হৃদয়-মনের বয়েস ষোল সতেরো বলতে কোনো আপত্তি নেই—তার 'মায়ের উদ্দেশে' কবিতা সুন্দর উচ্চারণে, দরদ দিয়ে পড়ে শোনাচ্ছে, সে একেবারে ভিন্ন জিনিস।

ঠাকুরমার গলা শোনা গেল। ক্ষীণ কণ্ঠে আমার উদ্দেশে বলছেন, 'তুমি কোনো চিন্তা করো না। তুমি তো কোনো অন্যায় করোনি। আর অন্যায় করলেও মা সব সময়েই মাপ করে দেয়। ছেলের অন্যায় করার শক্তি যতখানি, মায়ের মাপ করার শক্তি তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী। আর তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো সেইটেই সবচেয়ে বড় কথা। কাছ থেকে না-ভালোবাসার চেয়ে কি দূরে থেকে ভালোবাসা বেশী কাম্য নয়? এই যে মারিয়ানার বাপ আমার আগে চলে গেল। আমার একটি মাত্র ছেলে। কিন্তু আমি জানি, সে মা-মেরির চরণতলে আশ্রয় পেয়েও এই মায়ের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আমিও অনেক আগেই চলে যেতুম, কিন্তু এই তো রয়েছে আমার মারিয়ানা। আমি কি তার ঠাকুরমা? আমি তার মা। এ প্রথম মা হোক, তারপর আমি হেসে হেসে চলে যাবো। তুমি কোনো চিন্তা করো না। আপন কর্তব্য করে যাও।' ঠাকুরমা কথাগুলি বললেন অতিশয় ক্ষীণ কণ্ঠে কিন্তু তাঁর বাক্যে বিশ্বাসের কী কঠিন দার্ঢ্য।

আমি উঠে গিয়ে ঠাকুরমার হাত দুটিতে চুমো খেলুম। ফিরে এসে মারিয়ানার মস্তকাঘ্রাণ করলুম।

১ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ। পূর্বোল্লিখিত 'হাইনের শ্রেষ্ঠ কবিতা', পৃ ১৬ দ্রষ্টব্য।

জর্মন ভাষায় নবীন সাধকদের এস্থলে একটু সাবধান করে দি। ১৭ পৃষ্ঠায় মূল জর্মনে পঞ্চম ছত্র হবে চতুর্থ ছত্র, চতুর্থ ছত্র হবে পঞ্চম ছত্র।

(১০)

বিদায় নেওয়াটা খুব সহজ হয়নি। অল্পক্ষণের পরিচয়ের বন্ধু আর বহুকালের পরিচিত বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নেবার ভিতর পার্থক্য আছে সত্য, কিন্তু অনেক সময় অল্প পরিচয়ের লোকও সেই স্বল্প-সময়ের মধ্যেই এতখানি মোহাচ্ছন্ন করে দেয় যে, তার কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় মনে ক্ষোভ থেকে যায় যে, এর সঙ্গে দীর্ঘতর পরিচয় হলে কত না নূতন নূতন বাঁকে বাঁকে নূতন নূতন ভুবন দেখতে পেতুম।

দু বছরের বাচ্চা মারা গেলে মার যে শোক হয় সে কি পঞ্চাশ বছরের ছেলে মরে যাওয়ার চেয়ে কম ? আমার একটি ভাই দুই বছর বয়সে চলে যায়, কিন্তু থাক সে কথা—

*　　*　　*　　*

এ-দেশে গ্রীষ্মের দিন যে কত দীর্ঘ হতে পারে সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থাকলেও তার অভিজ্ঞতা না হওয়া পর্যন্ত সে-সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা হয় না। তুলনা দিয়ে বলতে পারি, পূর্ণচন্দ্র অমাবস্যায় কি পার্থক্য সেটা গ্রামের লোক যতখানি জানে চৌরঙ্গীর লোক কি ততখানি বোঝে ? আমিও এ-দেশের শহুরে ; গ্রামে এসে এই প্রথম 'নিদাঘের দীর্ঘদিন' কি সেটা প্রত্যক্ষ হৃদয়ঙ্গম হল।

সূর্য তখনো অস্ত যায়নি। হঠাৎ বেখেয়ালে ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখি রাত আটটা! কিন্তু 'রাত আটটা' কি ঠিক বলা হল ? আটটার সময় যদি দিবালোক থাকে তবে তো সেটা এ-দেশে সকালের আটটা, দিনের আটটা। তা সে যাক্। সেক্‌স্‌পীয়র ঠিকই বলেছেন, 'নামেতে কি করে ? সূর্যেরে যে নামে ডাকো আলোক বিতরে!'

মধুময় সে আলো। অনেকটা আমাদের কনে দেখার আলোর

মত। কোনো-কোনো গাছে, ক্ষেতে ইতিমধ্যেই পাক ধরেছে। তাদের পাতা দেখে মনে হয়, সমস্ত দিনের সোনালী রোদ খেয়ে খেয়ে সোনালী হয়ে গিয়ে এখন তারাও যেন সোনালী আলো বিকিরণ করছে। কীট্‌স না কার যেন কবিতায় পড়েছিলুম, পাকা আঙুর-গুলো সূর্যরশ্মির স্বর্ণসুধা পান করে করে টইটম্বুর হয়েই যাচ্ছে, হয়েই যাচ্ছে, আর তাদের মনে হচ্ছে এই নিদাঘ রৌদ্রের যেন আর অবসান নেই। আমিও এগোচ্ছি আর ভাবছি, এ-দিনের বুঝি আর শেষ নেই। এতক্ষণে বুঝতে পারলুম মারিয়ানা যখন আমাকে তাদের বাড়িতে রাতটা কাটাবার জন্য অনুরোধ করছিল তখন নানা আপত্তি দেখানো সত্ত্বেও এটা কেন বলেনি, রাতের অন্ধকারে আমি যাবো কি করে? আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলেও যেমন অতিথিকে ঠেকাবার জন্য শরৎ-পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় এ অজুহাত তোলা চলে না, রাতের অন্ধকারে পথ দেখবেন কি করে?

গ্রামের শেষ বাড়িটার চেহারা দেখে আমার কেমন যেন মনে হল এ-বাড়িটার বর্ণনা কে যেন আমায় দিয়েছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আমার যাত্রারম্ভের সেই প্রথম পরিচয়ের—কি যেন নাম, হ্যাঁ, টেরমের, হ্যাঁ, এটা সেই টেরমের, যার বউ নাকি খাণ্ডার, এটা তারই বাড়ি বটে নিশ্চয়।

সাদা রঙের বুক অবধি উঁচু ফালি ফালি কাঠের গেটের উপর দুই কনুই রেখে আবার একটি রমণী। কই, খাণ্ডারের মত চেহারা তো ঠিক নয়। আর এই অসময়ে এখানে দাঁড়িয়েই বা কেন? তবে কি টেরমের এখনো বাড়ি ফেরেনি?

আমার মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলল। দেখিই না পরখ করে। সত্যি খাণ্ডার, না, পথে যে সেই লড়াই-ফেরতা বলেছিল, একটু হিসিবী এই যা। খাণ্ডার হোক্ আর যাই হোক্, আমাকে তো আর চিবিয়ে খেয়ে ফেলতে পারবে না। আর খেলেও হজম করতে হবে না। এ-দেশে ভেজাল নেই। আমি নির্ভেজাল ভেজাল। ফুড-পইজনিঙে যা

কাৎরাতে কাৎরাতে মরবে সে আর দেখতে হবে না। সখা টেরমেরও নয়া শাদি করে সুখী হবেন, কিংবা—কিংবা আকছারই যা হয়, জাহ্নু টেরটি পাবেন, পয়লা বউটি কত না লক্ষ্মী মেয়ে ছিল—খাণ্ডার তো নয়, ছিল যেন গ্রীষ্মের তৃষ্ণায় কচি শসাটি। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আমার ভ্রাতা ইল্বল এখানে এসে ডাক ছাড়ে, "হে বাতাপে! তুমি নিষ্ক্রান্ত হও।" তা হলে তো কথাই নেই। আমিও—মহাভারতের ভাষাতেই বলি—খাণ্ডারিনীর "পার্শ্বদেশ বিদীর্ণ করে সহাস্য-আস্যে নিষ্ক্রান্ত হব।"

ইতিমধ্যে আমি আমার লাইন অব্ অ্যাক্‌শন্ অর্থাৎ ব্যূহ নির্মাণ করে ফেলেছি।

কাছে এসে আমার সেই ছাতা হ্যাট হাতে নিয়ে প্রায় মাটি ছুঁইয়ে, বাঁ হাত বুকের উপর রেখে, কোমরে দু ভাঁজ হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে অর্থাৎ গভীরতম 'বাও' করে মধ্যযুগীয় কায়দায় বিশুদ্ধতম উচ্চারণে বললুম, 'গুট্‌ন আবেণ্ড, গ্নেডিগে ফ্রাউ' অর্থাৎ আপনার সন্ধ্যা শুভ হোক, সম্মানিতা মহিলা।'

এই 'সম্মানিতা মহিলা' বলাটা কবে উঠে গিয়েছে ভগবান জানেন। আজ যদি আমি কলকাতায় শহরে কোনো মহিলাকে 'ভদ্রে' বলে সম্বোধন করি, কিংবা গৃহিণীকে 'মুগ্ধে' বলে কোনো কথা বোঝাতে যাই তা হলে যেরকম শোনাবে অনেকটা সেই রকমই শোনালো।

তাঁর গলা থেকে কি একটা শব্দ বেরুতে না বেরুতেই আমি শুধালুম, 'আপনি কি দয়া করে বলতে পারেন মেলেম গ্রামটি কোথায়?

অবাক হয়ে বললে, 'সে তো অন্তত ছ মাইল!'

আমি বললুম, 'তাই তো! তবে আমি নিশ্চয়ই পথ ভুল করে বসে আছি। তা সে যাকগে। আমি ম্যাপটা বের করে একটুখানি

দেখে নিই। এই হাইকিঙের কর্মে আজ সকালে মাত্র হাতেখড়ি কিনা।'

আমি ইচ্ছে করেই বাচালের মত হেসে হেসে কথাই কয়ে যেতে লাগলুম; 'থাকি বন্ শহরে। গরমের কলেজের ছুটিতে যে যার গেছে আপন বাড়ি। আমি কি করে যাই সেই দূর-দরাজের ইণ্ডিয়ায়? এই তো ম্যাপটা পেয়েছি। ঐয্যা টর্চটা আনিনি! বললুম তো হাতেখড়ি। তা সে—'

এতক্ষণে রমণী অবাক হয়ে সেই পুরনো—এই নিয়ে চারবারের বার—ইণ্ডার-ইণ্ডিয়ানার গুবলেট পাকালে। সেটার আর পুনরাবৃত্তি করে কোনো লাভ নেই।

আমি বললুম, 'তা হলে আসি, মাদাম (যেন আমার পালাবার কতই না তাড়া)! আপনি শুধু মোটামুটি দিকটা বাৎলে দিন।'

কিন্তু ইতিমধ্যে দাওয়াই ধরেছে। মৃদু কণ্ঠে বললেন, 'চলুন। ঘরের আলোতে ম্যাপটা ভালো করে দেখে নেবেন।'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'হ্যাঁ, মাদাম, তা মাদাম, কিন্তু মাদাম—'

অথচ ওদিক দিব্য খোলা গেট দিয়ে তাঁর পিছন পিছন মারিয়ানার কার্লের মত নির্ভয়ে এগিয়ে চললুম। মনে মনে এক গাল হেসে বললুম, 'ট্রয়ের ঘোড়া ঢুকেছে, হুঁশিয়ার।'

তবু বলতে হবে সাবধানী মেয়ে। রান্নাঘরে না নিয়ে গিয়ে, গেল ড্রইংরুমে।

পাঠক আমাকে বোকা ঠাউরে বলবেন, ঐতেই তো আমাকে সম্মান দেখানো হলো বেশী; কিন্তু আমি তা পূর্বেই নিবেদন করেছি এ দেশের গ্রামাঞ্চলে হৃদ্যতা দেখাতে হলে কিচেন, লৌকিকতা করতে হলে ড্রইংরুম।

আমাদের পূর্ব বাঙলায় যেরকম 'আত্তি' করতে হলে রাত্রিবেলা লুচি, আপন জন হলে ভাত।

হিটলারের পিতা যখন তাঁর মাতাকে বিয়ে করতে চান, তখন বিশেষ কোনো কারণে চার্চের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। দরখাস্তে বিবাহের পক্ষে নানা সদ্‌যুক্তি দেখানোর পর সর্বশেষে বলা হয় 'তদুপরি বধূ অর্থ-সামর্থ্যহীন ; অতএব সে যে এ-রকম উত্তম বিবাহের সুযোগ পুনরায় এ-জীবনে পাবে সে আশা করা যায় না।'[১]

পণ-প্রথা তোলার চেষ্টা করুন আর না-ই করুন এ জিনিসটা সমাজের বিশেষ বিশেষ শ্রেণীতে আমি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই দেখেছি। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ে।

চাষার বাড়ির ড্রইংরুম প্রায় একই প্যাটার্নের। এ বাড়িতে কিন্তু দেখি, শেল্‌ফে বইয়ের সংখ্যা সচরাচর যা হয় তার চেয়ে অনেক বেশী, অপ্রত্যাশিত রকমের বেশী। তদুপরি দেখি, দেয়ালে বেশ কিছু অত্যুত্তম ছবির ভালো ভালো প্রিণ্ট, সুন্দর সুন্দর ফ্রেমে বাঁধা। আমার মুখে বোধ হয় বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছিল। মাদামই বললেন, 'বিয়ের পূর্বে আমি কিছুদিন বন্ শহরে এক প্রকাশকের ওখানে কাজ করেছিলুম।'

অ। সেই কথা। অর্থাৎ এ-দেশে যা আকছারই হয়ে থাকে। কনের বিত্তসামর্থ্য না থাকলে সে চাকরি করে পয়সা কামিয়ে 'যৌতুক' কেনে। 'যৌতুক' কথাটা ঠিক হল না। 'স্ত্রী-ধন' কথাটার সঙ্গে তাল রেখে ওটাকে 'বর-ধন' বলা যেতে পারে।

এ-দেশের নিয়ম কনেকে রান্নাঘরের বাসন-বর্তন, হাঁড়িকুড়ি, মায় সিন্‌ক—রান্নাঘরের তাবৎ সার সরঞ্জাম, যার বর্ণনা পূর্বেই এক অনুচ্ছেদে দিয়েছি—শোবার ঘরের খাট-গদি-বালিশ-চাদর-ওয়াড়-

---

(১) আউগুস্ট কুবিৎসেক্ কর্তৃক 'ইয়াং হিটলার', ১৯৫৪, পৃঃ ২৮। হিটলারের বাল্যজীবন সম্বন্ধে এ রকম উপাদেয় গ্রন্থ আর নেই।

আলমারি, বসবার ঘরের সোফা-চেয়ার ইত্যাদি সবকিছু সঙ্গে নিয়ে আসতে হয়। শহরাঞ্চলে বর শুধু একখানি ফ্ল্যাট ভাড়া করেই খালাস। বিয়ের কয়েকদিন আগে তিনি শুধু ফ্ল্যাটের চাবিটি কনের হাতে গুঁজে দেন। কনে বেচারী সতেরো-আঠারো বছর বয়েস থেকে গা-গতর খাটিয়ে যে পয়সা কামিয়েছে তাই দিয়ে এ-মাসে কিনেছে এটা, ও-মাসে কিনেছে সেটা—বছরখানেক ধরে, দাঁও বুঝে—এখন কয়েকদিন ধরে আস্তে আস্তে সেগুলো সরানো হবে, বরের ফ্ল্যাটে। বিয়ের পর বর কনে কখনো বা সোজা চলে যায় হানিমুনে, আর কখনো বা ফ্ল্যাটে দু'চার দিন কাটিয়ে। কিন্তু একটা কথা খাঁটি; এর পর আর মেয়েকে ঘর-কন্না চালাবার জন্য অন্য-কিছু দিতে হয় না—জামাইষষ্ঠীর তত্ত্ব-ফত্ত্ব এ-দেশে নেই।

আর 'ট্রুসোর' কথাটা পাঠিকারা নিশ্চয়ই এঁচে নিয়েছেন। সেও আরম্ভ হয়ে যায় ঐ ষোল-সতেরো বছর বয়স থেকে। জামা-কাপড় ফ্রক-গাউনের এম্‌ব্রয়ডারি আরম্ভ হয়ে যায় ঐ সময়ের থেকেই—মায়ের সাহায্যে—এবং পরে কোনো পরিবারে চাকুরি নিলে সে বাড়ির গিন্নীমা অবসর সময়ে কখনো বা এমব্রয়ডারির কাজ দেখিয়ে দেন, কখনো বা নিজেই খানিকটা করে দেন। শুনেছি, বাড়ন্ত মেয়েরা টাইট-ফিটের জামা গাউনগুলোর সব-কিছু তৈরি করে রাখে—বিয়ের কয়েকদিন আগে দরজীর দোকানে গিয়ে কিংবা মা-মাসী সাহসিনী হলে তাঁদের সাহায্যে নিজেই কেটে সেলাই করে নেয়।

ব্যাপারটা দীর্ঘদিন ধরে চলে বলে এতে একটা আনন্দও আছে। আমার এক বন্ধু পরীক্ষা পাস করে চলে যাওয়ার সময় বলে গিয়েছিল তার ফিয়াঁসেকে যেন মাঝে মাঝে একটুখানি বেড়াতে নিয়ে যাই। বেচারী নিতান্ত একা পড়ে যাবে বলে, এবং আমার কোনো ফিয়াঁসে এমন কি বান্ধবী পর্যন্ত নেই বলে।

রাস্তায় নেমে আমি হয়তো বললুম, 'বাসন-কোসনের আলমারি হয়েছে, উনুন হয়েছে, এইবারে সিন্‌ক্—না?'

বললে, 'হ্যাঁ, গোটা তিনেক এদিক ওদিক দেখেছি। আমার কিন্তু একটা ভারী পছন্দ হয়েছে। শহরের ঐ প্রান্তে।'

আমি বললুম, 'আহা, চলই না, দেখে আসা যাক্ কি রকম।'

'তুমি না বলেছিলে, রাইনের ওপারে যাবে?'

'কী জ্বালা! রাইন তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

ছোট্ট শহর বন্। ডাইনে ম্যুনস্টার গির্জে রেখে, রেমিগিউস স্ট্রীট ধরে, ফের ডাইনেই য়ুনিভার্সিটি পেরিয়ে ঢুকলুম মার্কেটে প্লেসে। বাঁ দিকে কাফে মনোপোল, ডান দিকে ম্যুনিসিপ্যাল আপিস। মার্গারেট বললে, 'দাঁড়াও। এদিকেই যদি এলে তবে চলো ঐ গলিটার ভিতর। রীডিং ল্যাম্পের সেল হচ্ছে—সস্তায় পাওয়া যাবে—আমার যদিও খুব পছন্দ হয়নি।'

দেখেই আমি বললুম, 'ছ্যাঃ!'

মার্গারেট হেসে বললে, 'আমিও তাই বলছিলুম।'

ক'রে ক'রে, অনেকক্ষণ এটা সেটা দেখে দেখে—সবাই রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দোকানে ঢোকা নদারদ, এখনো পাকাপাকি কেনার কোনো কথাই ওঠে না, মার্গারেটের মা দেখবে, পিসি দেখবে, তবে তো—পৌঁছলুম সেই সিন্কের সামনে। আমি পাকা জউরির মত অনেকক্ষণ ধরে ডাইনে ঘাড় নাড়ালুম, বাঁয়ে ঘাড় নাড়ালুম, তার পর বাঁ হাতের কড়ে আঙুল দিয়ে ডান কানের উপরটা চুলকোতে চুলকোতে বললুম, 'হ্যাঁ, উত্তমই বটে। শেপটি চমৎকার, সাইজটিও বঢ়িয়া—দুজন লোকের বাসন-কোসনই বা ক'খানা, তবে হ্যাঁ, পরিবার বাড়লে—' মার্গারেট কি একটা বলছিল; আমি কান না দিয়ে বললুম, 'তবে কি না বড্ড ধবধবে সাদা। এটিকে পরিষ্কার রাখতে জান বেরিয়ে যাবে। একটুখানি নীল ঘেঁষা হলে কিংবা ক্রেজি চাইনার মত হলে—' মার্গারেট বললে, 'সেই ঘষে ঘষে সাফ যদি করতেই হয় তবে ধবধবে সাদাই ভালো। মেহন্নত করবো, উনি নীলচেই থেকে যাবেন, লোকে ভাববে হাড়-আলসে বলে নীল রঙের কিনেছি—কী দরকার!'

আহা, সে-সব শ্লো টেম্পোর ঢিমে তেতালার দিনগুলো সব গেল কোথায়? এখন সকালে বিয়ে ঠিক, সন্ধ্যের ভিতরই ডেকরেটররা এসে সব-কিছু ছিমছাম ফিটফাট করে দিলে। তবে হ্যাঁ, তখন বাড়ি পাওয়া যেত সহজেই; এখন আর সে সুখটি নেই। কিছুদিন পূর্বেই ইয়োরোপের কোন্ এক দেশে নাকি কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল:

পাত্রী চাই! পাত্রী চাই!! পাত্রী চাই!!! আপন নিজস্ব সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত বাড়ি যার আছে এমন পাত্রী চাই। বাড়ির ফোটোগ্রাফ পাঠান।

* * *

কোথা থেকে কোথা এসে পড়লুম! ট্র্যাম্পকে নিয়ে এই তো বিপদ। সে যে রকম সোজা রাস্তায় নাক-বরাবর চলতে জানে না, তার কাহিনীও ঠিক তেমনই পারলেই সদর রাস্তা ছেড়ে এর খিড়কির দরজা দিয়ে তাকায়, ঝোপের আড়াল থেকে ওর পিছনের পুকুরের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

আমি আমার ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার ভান করলুম। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললুম, 'অনেক ধন্যবাদ, মাদাম! আপনাকে অযথা বিরক্ত করলুম।'

এই বারে 'মাদামে'র অগ্নিপরীক্ষা।······মাদাম পাস! টেরমের ফেল্।

অবশ্য কিছুটা কিন্তু কিন্তু করেই বলেছিল—কিন্তু ব'লেছিল তো ঠিকই—'এখন তো রাত ন'টা। ভিন গাঁয়ে পৌঁছতে—'

আমি বাধা দিয়ে এক গাল হেসে বললুম, 'আপদেই না, মাদাম! আপনাকে সব-কিছু খুলে কই।'

'বসুন না।' মাদাম শুধু পাস না; একেবারে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

'আমি শুনেছি, আপনাদের দেশে গরমের সময়ে দিনগুলো এত লম্বা হয় যে একটা দিনের আলো নাকি পরের দিনের ভোরকে 'গুড্ মর্নিং' বলার সুযোগ পায়। ঠিক মত অন্ধকার নাকি আদপেই হয়

না। এখানে আমি থাকি শহরে। ছ'টা সাতটা বাজতে না বাজতেই সব কড়া কড়া বিজলি বাতি দেয় জ্বালিয়ে। কিচ্ছুটি বোঝবার উপায় নেই, আলো, না অন্ধকার। ফিকে অন্ধকার, তরল অন্ধকার, ঘোরঘুট্টি অন্ধকার—শুনেছি মিড্-সামারে নাকি গ্রামাঞ্চলে এর সব ক'টাই দেখা যায়। আমি হাঁটতে হাঁটতে দিব্য এগুতে থাকবো আর অন্ধকারের গোড়াপত্তন থেকে তার নিকুচি পর্যন্ত রসিয়ে রসিয়ে চেখে চেখে যাবো। এবং—'

'কিন্তু আপনার আহারাদি?'

কে বলে এ রমণী খাণ্ডার?

মারিয়ানার ঠাকুরমাই তাকে বলেছিল, 'দেখ দিকিনি, ও যে হাইকিঙে বেরিয়েছে, সঙ্গে স্যাণ্ডউইচ আছে কি না।' আমার কোনো আপত্তি না শুনে মারিয়ানা আমার আধা-বাসী সাদামাটা স্যাণ্ডউইচগুলো তুলে নিয়ে আমার ব্যাগটা ভরতি করে দিয়েছিল গাদা-গাদা রকম-বেরকমের স্যাণ্ডউইচে। সঙ্গে আবার টুথপেস্ট ট্যুবের মত একটা ট্যুবও দিয়েছিল। ওর ভিতরে নাকি মাস্টার্ড আছে। বলেছিল 'স্যাণ্ডউইচে মাস্টার্ড মাখিয়ে দিলে ওগুলো খুব তাড়াতাড়ি মিইয়ে যায়। যখন খাবে, তখন রাইটা মাখিয়ে নিয়ো।' আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, 'তোমারগুলো কাল সকালে আমি খাব।'

তাই আমার ব্যাগটাকে আদর করতে করতে তাড়াতাড়ি বললুম, 'কি আর বলবো, মাদাম, আমার সঙ্গে যা স্যাণ্ডউইচ আছে, তার জোরে আমি আপনাকে পর্যন্ত রুপালী বোর্ডারওয়ালা সোনালী চিঠি ছাপিয়ে নিমন্ত্রণ করতে পারি। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আমি খাই অনেক দেরিতে। রাত এগারোটার সময়।'

বললে, 'সে তো ঠাণ্ডা। গরম সুপ আছে।'

আমি অনেক-কিছু এক ঝটকায় বুঝে গেলুম। সখা টেরমের প্রতি রাত্রে না হোক রোববার রাত্রে ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে 'পাবে'

(মদের দোকান, ক্লাব এবং আড্ডার সমন্বয়) গুলতানী করে বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রিতে। পৃথিবীর কোনো জায়গাতেই গিন্নী-মারা এ অভ্যাসটি নেকনজরে দেখেন না। তাই সৃষ্টির আদিম যুগ থেকে একটা ভীষণ লড়াই চলেছে খরবেগে। এক দিকে 'পাব'-ওয়ালা, অন্য দিকে গৃহিণীর দল। গ্রামের কোনো কোনো 'পাবে' তাই দেখেছি, পাব-ওয়ালা বেশ পয়সা খরচা করে বড় বড় হরফে দেয়ালে নিম্নোক্ত কবিতাটি, পেণ্ট করে নিয়েছে,

ফ্রাগে নিষট্ ডী উর ভী স্পেট এস সাই
ডাইনে ফ্রাউ শিমফট্ উম ৎসেন
গেনাও ভী উম ড্রাই ॥

ঘড়িটাকে শুধিয়ো না, কটা বেজেছে।
তোমার বউ তোমাকে দশটার সময় সেই বকাই বকবে, যেটা তিনটের সময় বকে ?

মানুষ করেই বা কি ? জর্মনরা কারো বাড়িতে বসে আড্ডা জমানোটা আদপেই পছন্দ করে না। ডিনার লাঞ্চে নিমন্ত্রণ করলে অবশ্য অন্য কথা—কিন্তু সে তো সম্পূর্ণ ভিন্ন বস্তু। এ-দেশেও এক-রকম লোক আছে, যাদের পেতে হলে চায়ের দোকানে যেতে হয়। পরের বাড়িতে যায় না, নিজের বাড়িতেও থাকে না।

এ অবস্থায় মেয়েরা কি করে ?

কাচ্চা-বাচ্চা সামলায়। খামখা তিনবার বাচ্চাটার ফ্রক বদলিয়ে দেয়, চারবার পাউডার মাখায়, হাতের কাজ ক্ষান্ত দিয়ে ঘড়ি ঘড়ি ঢুঁ মেরে যায়—বাচ্চা ঠিকমত ঘুমুচ্ছে কি না।

সেইখানে, যেখানে থাকবার কথা, ভরা গাঙের তরতর স্রোত, যার উপর দিয়ে কলরব করে ধেয়ে চলবে ভরা পাল তুলে টেরমের গিন্নীর যৌবনতরী—হায়, সেখানে বালুচড়া। নৌকাটি যে মোক্ষম আটকা আটকেছে, তার থেকে আর নিষ্কৃতি নেই—কি করে জানিনে কথায় কথায় বেরিয়ে গিয়েছে, বেচারী সন্তানহীনা।

সমস্ত পৃথিবীটা নিষ্ফল সাহারায় পরিণত হোক, কিন্তু একটি রমণীও যেন সন্তানহীনা না হয়, মা হওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়।

তাই কি এ রমণীর হৃদয় থেকে সর্বরস বাষ্প হয়ে নক্ষত্রলোকে চলে গিয়েছে? —কেউ বলে খাণ্ডার, কেউ বলে হিংসিবী? কিন্তু কই, ঠিক জায়গায় সামান্যতম খোঁচা লাগামাত্রই তো তার নৌকা চলুক আর না চলুক, পালে তো হাওয়া লাগল—স্বামীর জন্য তৈরী স্যুপ বাউণ্ডুলের সামনে তুলে ধরতে চায়।

আমি এসেছিলুম মজা করতে, বাজিয়ে দেখতে খাণ্ডার কিনা, এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ।

ঘরের আসবাবপত্র, ছবি, বই—এসব টেরমের-বউ যোগাড় করেছিল যৌতুকের টাকা জমাবার সময়—কেমন যেন আমার কাছে হঠাৎ অত্যন্ত নিরানন্দ, নিঃসঙ্গ, নীরস বলে মনে হতে লাগল। এরই ভিতর একা-একা দিন কাটায় এ রমণী। টেরমের লোক নিশ্চয় খারাপ নয়—যে দু-চারটে কথা বলেছিলুম, তার থেকে আমার মনে অতি দৃঢ় ঐ প্রত্যয় হয়েছিল—এবং এখন আমার মনে হল, দু'জনার ভিতরে ভালোবাসাও আছে যথেষ্ট, কিন্তু একজনকে ভালোবাসা দেওয়া এক জিনিস, আর সঙ্গ দেওয়া অন্য জিনিস। এ-মেয়ে শান্ত গম্ভীর। খুব সম্ভব, স্বামী বাচ্চা নিয়ে নির্জনে থাকতে চায়, আর ওদিকে টেরমের ইয়ার-দোস্তের সঙ্গে বসে পাঁচজনের পাঁচ রকমের সুখ-দুঃখের কথা না শুনলে, না বললে, তার মনে হয় তার জীবনটা যেন সর্বক্ষণ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

এসব বলা বৃথা, টেরমের গিন্নী কি অন্য কিছু দিয়ে জীবন ভরে তুলতে পারে না? কেউ কেউ পারে, কিন্তু অনেকেই পারে না। এ মেয়ে যেন গ্রামোফোন রেকর্ডের কাটা লাইনের ভিতরে পড়ে গিয়েছে সাউণ্ড বক্সটা—আছে ঠায় দাঁড়িয়ে, রেকর্ড ঘুরেই যাচ্ছে, ঘুরেই যাচ্ছে, সে কিন্তু আর এগুতে পারছে না। আমার অনেক সময় মনে হয়, এই একঘেয়ে নীরস জীবনের চেয়ে অনটনের জীবন,

সঙ্কটের জীবন কাম্যতর। সেখানে অন্তত সেই অনটন, সেই সঙ্কটের দিকে সর্বক্ষণ মনঃসংযোগ করতে হয় বলে মনটা কিছু-না-কিছু একটা নিয়ে থাকে। বেদনার শেষ আছে, কিন্তু শূন্যতার তো নেই।

আমার বড় লজ্জা বোধ হল। ঠাট্টাছলে, মস্করা করতে এখানে এসেছিলুম বলে। স্থির করলুম, সব কথা খুলে বলবো, নিদেন এটা বলবো যে, তার স্বামীকে আমি চিনি, সে আমাকে নিমন্ত্রণ করতে চেয়েছিল।

আমি ভয়ে ভয়ে আরম্ভ করলুম, 'আপনার স্বামী—'

আমার কথা আর শেষ করতে হল না। এই শান্ত—এমনকি, গুরুগম্ভীরও বলা যেতে পারে—মেয়ে হঠাৎ হোহো করে অট্টহাস্য হেসে উঠলো। কিন্তু ভারী মধুর। বিশেষ করে ঝকঝকে সাদা দু'পাটি দাঁত আর চোখ দুটি যা জ্বলজ্বল করে উঠলো, সে যেন অন্ধকার রাত্রে আকাশের কোণে বিদ্যুল্লেখা। কতদিন পরে এ-রমণী এভাবে প্রাণ খুলে হাসলে, কে জানে। কত তপ্ত নিদাঘ দিনের পর নামলো এ-বারিধারা। তাই হঠাৎ যেন চতুর্দিকের শুষ্কভূমি হয়ে গেল সবুজ। দেয়ালের ছবিগুলোর গুমড়ো কাচের মুখের উপর দিয়ে যেন খেলে গেল এক পশলা আলোর ঝলমলানি।

'আমার স্বামী—' বার বার হাসে আর বলে 'আমার স্বামী—।' শেষটায় কোনো গতিকে হাসি চেপে বললে, 'আমার স্বামী আপনাকে পেলে হাল্লেলুইয়া রব ছেড়ে আপনাকে ধরে নাচতে আরম্ভ করতো। এ-গ্রামের যে-কোনো একজনকে পেলেই তার ক্রিসমাস। আপনি কত দূর দেশের লোক। আপনাকে পেলেই এখ্খুনি নিয়ে যেত 'পাবে'। আবার হাসতে হাসতে বললে, 'আপনি বুঝি ভয় পেয়েছেন, ও যদি হঠাৎ বাড়ি ফিরে দেখে আমি একটা ট্র্যাম্পকে—অবশ্য আপনি ট্র্যাম্প নন্—যত্ন করে সুপ খাওয়াচ্ছি তা হলে সে চটে গিয়ে তুলকালাম কাণ্ড করবে! হোলি মেরি! যান না আপনি একবার 'পাবে'। ও গিয়েছিল শহরে। এতক্ষণে ফিরেছে নিশ্চয়ই, এবং

বাড়ি না এসে গেছে সোজা 'পাবে'। শহরে কি কি দেখে এল তার গরমাগরম একটা রগরগে বর্ণনা তো দেওয়া চাই। যান না একবার সেখানে। নরক গুলজার।' তারপর আবার হাসি। শেষটায় বললে, 'আমি যদি ওকে বলি যে, সে যখন শহরে কিংবা 'পাবে', তখন এক বিদেশী—তাও সেই সুদূর ইণ্ডিয়া থেকে, ফ্রান্স কিংবা পর্তুগাল থেকে নয়—আমাদের বাড়িতে এসেছিল তা হলে সে দুঃখে ক্ষোভে বোধ হয় দেয়ালে মাথা ঠুকবে। তাই বলছি, যান একবার 'পাবে'। খরচার কথা ভাবছেন? আমার স্বামী যতক্ষণ ওখানে রয়েছে!'

আমি ইচ্ছে করেই বেশ শান্ত কণ্ঠে বললুম, 'আমি তো শুনেছি. আপনি চান না, আপনার স্বামী বেশী লোকের সঙ্গে মেলা-মেশা করুক।'

হঠাৎ তার মুখের হাসি শুকিয়ে গেল। আমার মনে দুঃখ হল। কিন্তু যখন মনস্থির করেছি, সবকথা বলবোই তখন আর উপায় কি? গোড়ার থেকে সব-কিছু বলে গেলুম, অবশ্য তাঁর স্বামীর ভাষাটাকে একটু মোলায়েম করে, এবং লড়াই-ফেরতা চাষা কি বলেছিল তার অভিমতও।

নাঃ! বিধাতা আমার প্রতি সুপ্রসন্ন। টেরমেরিনীর মুখে ফের মৃদু হাস্য দেখা দিল। তা হলে বোধ হয়, একবার গাম্ভীর্যের বাঁধন ভাঙলে সেটাকে আর চট করে মেরামত করা যায় না। হাসিমুখেই বললে, 'সে এক দীর্ঘ কাহিনী। আপনি বরঞ্চ 'পাবে' যান।' আমি বললুম, 'আপনি যদি সঙ্গে চলেন, তবে যেতে রাজী আছি।' স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'আমি? আমি যাবো 'পাবে'?' আমি বললুম, 'দোষটা কি? আপনার স্বামী যখন সেখানে রয়েছেন।' তাড়াতাড়ি বললে, 'না, না। সে হয় না।' তারপর আমাকে যেন খুশী করার জন্য বললে, 'আরেক দিন যাব।'

আমি বললুম, 'সেই ভালো, মাদাম। ফেরার মুখে যখন এ গাঁ দিয়ে যাবো তখন তিনজনাতে এক সঙ্গে যাব।'

রাস্তায় নেমে শেষ কথা বললুম, 'ঐ কথাই রইল।'

(১২)

বিচক্ষণ লোক ঠিক জানে, এই শেষবার, এরপর দোকানী আর ধার দেবে না। হুঁশিয়ার লোক দোকানীর সামান্যতম চোখের পাতার কাঁপন কিংবা তার নিশ্বাসের গতিবেগ থেকে এই তত্ত্বটি জেনে যায়. এবং তারপর আর ও পাড়া মাড়ায় না। নৈসর্গিক পরিবর্তন সম্বন্ধেও সে কিছু কম ওয়াকিফহাল নয়। মাঠ দিয়ে যেতে যেতে দিব্য আপনার সঙ্গে নিবিষ্ট মনে কথা বলে যাচ্ছে, যেন অন্য কোনো দিকে তার কোনো খেয়াল নেই, অথচ আকাশের কোন্ কোণে কখন সামান্য এক রত্তি মেঘ জমেছে, কখন একটুখানি হাওয়া কোন্ দিক থেকে এসে তার টাকের উপর মোলায়েমসে হাত বুলিয়ে গিয়েছে সেটা লক্ষ্য করেছে ঠিকই, এবং হঠাৎ কথা বন্ধ করে বলবে, 'চল দাদা, একটু পা চালিয়ে। ঐ মুদির দোকানে একটুখানি মুড়ি খাবো।' দোকানে ঢোকা মাত্রই কক্কড় করে বাজ আর টিনের ছাতের উপর চচ্চড় করে গামলা-ঢালা বৃষ্টি। তখন আপনার কানেও জল গেল, আপনার হুঁশিয়ার ইয়ার কোন্ মুড়ির সন্ধানে মুদির দোকানে ঢুকেছিলেন।

ট্র্যাম্প মাত্রেরই এ-দুটির কিছু কিছু দরকার। তালেবর ট্র্যাম্পরা তো—কান্টের ভাষায় বলি—মানুষের হৃদয় থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারার গতিবিধি নখাগ্র-দর্পণে ধরে। তারই একজনের সঙ্গে আমার একবার সাক্ষাৎ হয়েছিল; অনুকূল লগ্নে সে-সব কথা হবে।

ওয়াকিফহাল তো নই-ই, দু' ব্যাপারেই আমি বে-খেয়াল। কাজেই কখন যে শান্তাকাশের আস্যদেশে ভ্রূকুটির কটা ফেটে উঠেছে সেটা মোটেই লক্ষ্য করিনি। হঠাৎ ঘোরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল— আশ্চর্য! এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না—এবং সঙ্গে সঙ্গে

কণ্ঠের বরণ যাঁর
শ্যাম-জলধরোপম,
গৌরী-ভুজলতা যাহে
রাজে বিদ্যুল্লতা সম
নীলকণ্ঠ প্রভু সেই
করুন সবে রক্ষণ—

আমাকে 'রক্ষণ' না করে রুদ্রের অট্টহাস্য হেসে বৃষ্টি নামলেন আমার মস্তকে মুষল-ধারে। এরকম হঠাৎ, আচমকা, ঘনধারা বৃষ্টি আমি আমার আপন দেশেও কখনো দেখিনি।

তবে একটা ঠিক—কালো মেঘের উপর সাদা বিদ্যুৎ খেললে কেন সেটা নীলকণ্ঠের নীল-গলার উপর গৌরীর গোরা হাতের জড়িয়ে ধরার মত দেখায় সেটা সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হল। বিস্তর বিদ্যুৎ চমকালো বটে।

আর সে কী অসম্ভব কনকনে সূচীভেদ্য ঠাণ্ডা!

এতদিনে বুঝতে পারলুম, ইউরোপীয় লেখকরা ভারত, মালয়, বর্মায় মৌসুমী বৃষ্টিতে ভিজে কেন লিখেছেন, ওয়োর্ম ট্রপিকাল রেন্‌স্। জ্যৈষ্ঠের খরদাহের পর আষাঢ়ের নবধারা নামলে আমরা শীতল হই, সে-বৃষ্টি হাড়ে কাঁপন ধরিয়ে দেয় না। তাই ইংরেজের কাছে এ বৃষ্টি ওয়োর্ম এবং আনন্দদায়ক। কারণ একে অন্যকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালে সায়েব বলে, আমি তার কাছ থেকে ওয়োর্ম রিসেপশন পেলুম। আর আমরা যদি বলি, আমাকে দেখেই উনি গরম হয়ে উঠলেন তবে অন্য মানে হয়।

যাক্ এসব আত্মচিন্তা। বাঙলাদেশে মানুষ বহুকাল ধরে তর্ক করেছে, মিষ্টি কথা দিয়ে কোনো জিনিস ভেজানো যায় কি না? কিন্তু উল্টোটা কখনো ভাবেনি—অর্থাৎ মিষ্টি কথা, এ-স্থলে আত্মচিন্তা, দিয়ে 'সেলিকাজেলের' মত ভিজে জিনিস শুকনো করা যায় কি না? আবার এ-বৃষ্টি আসছে চতুর্দিক থেকে, নাগাড়ে এবং ধরণী অবলুপ্ত।

অবশ্য দশ মিনিট যেতে না যেতেই আমার ভিজে যাওয়ার ভাবনা লোপ পেল। অল্প ভেজা থেকে মানুষ আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করে কিন্তু ভিজে ঢোল হয়ে যাওয়ার পর তার সে উদ্বেগ কেটে যায়। মড়ার উপর এক মনও মাটি, এক শ' মনও মাটি। কিংবা সেই পুরনো দোঁহা,

অল্প শোকে কাতর।
অধিক শোকে পাথর॥

হোঁচট খেয়ে খেয়ে চলেছি। একটা গাড়ি কিংবা মানুষের সঙ্গেও দেখা হল না। গৌরী ও নীলকণ্ঠও বোধ হয় দ্যু-লোকের পিকনিক সমাপন করে কৈলাসে ফিরে গিয়েছেন। বিদ্যুৎ আর চমকাচ্ছে না। ঘোরঘুট্টি অন্ধকার।

অনেকক্ষণ পরে আমার বাঁ দিকে—দিক বলতে পারবো না—অতি দূরের আকাশে একটা আলোর আভা পেলুম। প্রায় হাতড়ে হাতড়ে সামনে বাঁয়ের মোড় নিলুম। আভাটা কখনো দেখতে পাচ্ছি, কখনো না। যখন আলোটা বেশ কিছু পরিষ্কার হয়েছে তখন সামনের কয়েকটা গাছের আড়াল থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এল একটা জোরদার বাড়ির আলো! বাঁচলুম।

কই বাঁচলুম? বাড়ির সামনের সাইনবোর্ডে আলোতে আলোতে লেখা 'তিন সিংহ'। বলে কি? ঘরে ঢুকে তিনটে সিঙির মুখোমুখি হতে হবে না কি?

নাঃ। অতখানি জর্মন ভাষা আমি জানি। এরা এদের 'বার' হোটেল 'পাব'-এর বিদঘুটে বিদঘুটে নাম দেয়। 'তিন সিংহ', 'সোনালী হাঁস'—আরো কত কী। Blue Fox·

দরজা খুলেই দেখি, আমি একটা খাঁচা কিংবা লিফটের মত বাক্সে দাঁড়িয়ে আছি। আমি আমার ভেজা জামাকাপড় নিয়ে কি করে ঢুকবো সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলুম বলে লক্ষ্য করলুম, পায়ের তলায় জাফরির ফুটোওলা পুরো রবারের শীট। ভয়ে ভয়ে সামনের দরজা

খুলে দেখি বিরাট এক নাচের ঘর প্লাস 'বার্-পাব্'। অথচ একটিমাত্র খদ্দের নেই। এক প্রান্তে 'বার'। পিছনে একটি তরুণী। সাদামাটা কাপড়েই অতি সুন্দর দেখাচ্ছে। আমি মুখ ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছি দেখে বেশ একটু চেঁচিয়ে বললে, 'ভিতরে আসুন না?' আমি আমার জামাকাপড় দেখিয়ে বললুম, 'আমি যে জলভরা বালটির মত।' বললে, 'তা হোক্।' তারপর আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে, একটা জাফরির রবারের পর্দা চলে গিয়েছে ঘরের অন্য প্রান্তের বাথরুম অবধি। আমি ঐটে ধরে ধরে বেবাক ঘর না ভিজিয়ে যখন প্রায় বাথরুমের কাছে পৌঁছেছি তখন মেয়েটি কাউন্টার ঘুরে পার হয়ে আমার কাছে এসে বললে, 'আপনি ভিতরে ঢুকুন। আমি আপনাকে তোয়ালে আর শুকনো কাপড় এনে দিচ্ছি।'

গ্রামাঞ্চলে এরা এসব আকছারই করে থাকে, না আমি বিদেশী বলে? কি জানি? শহরে এ রকম ঢোল আপন বাড়ি ছাড়া অন্যত্র কোথাও ঢুকতে কখনো দেখিনি।

শার্ট, সুয়েটার, প্যান্ট আর মোজা দিয়ে গেল। অবশ্য বাহারে নয়। বাহার! হুঁঃ! আমি তখন গজাসুর বা ব্যাঘ্রচর্ম পরে কৃত্তিবাস হতে রাজী আছি!

চার সাইজের বড় রবারের জুতো টানতে টানতে 'বার'-এর নিকটতম সোফায় এসে হেলান দিয়ে এলিয়ে পড়লুম। মেয়েটি শুধালে, 'আপনি কি খাবেন?' আমি ক্লান্ত কণ্ঠে বললুম, 'যাচ্ছেতাই।'

এবারে যেন কিঞ্চিৎ দরদ-ভরা সুরে বললে, 'গরম ব্র্যাণ্ডি খান। আপনি যা ভিজেছেন তাতে অসুখ-বিসুখ করা বিচিত্র নয়। আমার কথা শুনুন। আমি সবাইকে ড্রিঙ্ক দি। জানি, কখন কি খেতে হয়।'

আমি তখন ট্র্যাম্পিঙের অন্নপ্রাশনের দিনেই নিমতলাগমন ঠেকাতে ব্যস্ত। পূর্বোল্লিখিত গজাসুরের গজ-বসাও খেতে প্রস্তুত। বললুম, 'তাই দিন।'

গরম ব্র্যাণ্ডি টেবিলের উপর রেখে বললে, 'ৎস্যুম্ ভোল জাইন।' এটা এরা সব সময়ই বলে থাকে। অর্থ বোধ হয় অনেকটা 'এটা দ্বারা আপনার মঙ্গল হোক্।'

আমি বললুম, 'ধন্যবাদ। আপনি কিছু একটা নিন।' বললে, 'আমার রয়েছে।'

আমি এক চুমুক খাওয়ায় বেশ কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি 'বার'-এর পিছন থেকে শুধোলো, 'আপনি যদি নিতান্ত একা বসে না থাকতে চান তবে আমি সঙ্গ দিতে পারি।' আমি খাড়া হয়ে উঠে বসে বললুম, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। আস্তেজ্ঞা হোক, বোস্তেজ্ঞা হোক।' মেয়েটি এসে একটি চেয়ার একটুখানি দূরে টেনে নিয়ে এক জানুর উপর আরেক জানু তুলে বসলো।

কী সুন্দর সুডৌল পা দুটি!

(১৩)

হিটলার যখন মস্কোর চৌকাঠে তখন তিনি তাঁর খ্যাতির মধ্যগগনে। ঐ সময় লাঞ্চ-ডিনার খাওয়ার পর তিনি যে-সব বিশ্রম্ভালাপ করতেন সেগুলো তাঁর সেক্রেটারি বরমানের আদেশে লিখে রাখা হয়। তারই একাধিক জায়গায় হিটলার রমণীদের সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা ও মতামত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে, আমরা শহরের রঙ-চঙা সুন্দরীদের দেখে এতই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি যে, গ্রামের সুন্দরীরা আর আমাদের চোখে পড়ে না। অথচ তাঁর মতে, সিনেমাওলাদের সুন্দরীর সন্ধানে বেরোতে হলে যাওয়া উচিত গ্রামাঞ্চলে—সৌন্দর্যের খনি সেখানে।

লেখাটি পড়েছি আমি অনেক পরে, কিন্তু সেই অঝোরে ঝরার রাতে ক্যোটে কির্ষনারকে দেখে আমার মনে এই তত্ত্বটিই আবছা-আবছা উদয় হয়েছিল। তার দেহটি তো স্বাস্থ্যে পরিপূর্ণ ছিলই,

তদুপরি চোখে ছিল একটি অবর্ণনীয় শান্ত মধুর ভাব। চুল ছিল চেস্‌নাট ব্লণ্ড এবং এমনি অদ্ভুত ঝিলিক মারতো যে মনে হত যেন তেল ঝরে পড়ছে, যদিও জানি ইয়োরোপের মেয়েরা চুলে তেল মাখে না।

আমার টেবিলে আসার সময় সে তার অর্ধসমাপ্ত বিয়ারের গেলাস সঙ্গে এনেছিল। ঢাউস হাফ-লিটারের পুরু কাঁচের মগ। ক্যেটের চোখ দুটি ঈষৎ রক্তাভ। সেটা বিয়ার খেয়ে হয়েছে, না, চোখের জল ফেলে হয়েছে বুঝতে পারলুম না। আবার এটাও তো হতে পারে যে কেঁদে কেঁদে যখন সান্ত্বনা পায়নি তখন শোক ভোলার জন্য বিয়ার খেয়েছে। কিন্তু আমিই বা এত সেন্টিমেণ্টাল কেন? পৃথিবীটা কি শুধু কান্নাতেই ভরা?

ইতিমধ্যে প্রাথমিক আলাপচারী হয়ে গিয়েছে।

আমি বার দুই বিয়ার মগের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, ময়রা সন্দেশ খায় না।'

ক্যেটে হেসে বললে, 'এ-দেশেও মোটামুটি তাই। তবে আমি খাই অন্য কারণে। তাও সমস্ত দিন, এবং জালা জালা।'

এদেশে বিয়ার খাওয়াটা নিন্দনীয় নয়—বরঞ্চ সেইটেই স্বাভাবিক —কিন্তু পিপে পিপে খাওয়াটা নিন্দনীয়, আর মাতলামোটা তো রীতিমত অভদ্র, অন্যায় আচরণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের দেশে যে রকম একটু-আধটু তাস খেলা লোকে মেনে নেয় কিন্তু জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে দেওয়া পাপ বলে ধরা হয়।

ক্যেটে কেন জালা জালা খায় সেটা যখন নিজের থেকে বললে না, তখন আমিও আর খোঁচাখুঁচি করলুম না। শুধালুম, 'আমি এখানে আসার সময় আকাশে একটা আলোর আভা দেখতে পেয়েছিলুম। সেটা কিসের?'

'ও, সে তো রাইন নদীর ঘাট আর জাহাজগুলোর।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'আমি কি রাইনের পারে এসে পৌঁছে গিয়েছি?'

হেসে বললে, 'যা বৃষ্টি হচ্ছে তাতে আপনি যে আপন অজানাতে পায়ে হেঁটেই রাইন পেরিয়ে ওপারে চলে যাননি সে-ই তো আশ্চর্য! আমাদের 'পাব্' থেকে রাইন তো অতি কাছে। আসলে আমাদের খদ্দেরও অধিকাংশ রাইনের মাঝি-মাল্লারা। সন্ধ্যার সময় নোঙ্গর ফেলে এখানে এসে বিয়ার খায়, নাচানাচি করে এবং মাঝে মাঝে মাতলামোও। সেলার কিনা! আজ জোর বৃষ্টি নেমেছে বলে 'পাব' একেবারে ফাঁকা। আমার আজ বড্ড ক্ষতি হল।'

'আপনার ক্ষতি? আমি তো ভেবেছিলুম, আপনি এখানে কাজ করেন।'

ক্ষণতরে শ্রীমতীর মুখ একটু গম্ভীর হল। মুনিবকে চাকর বললে তাঁর যে ভাব-পরিবর্তন হওয়ার কথা। তারপর ফের একটু হাসলে। বোধ হয় ভাবল, বিদেশী আর বুঝবেই বা কি? বললে, 'না। এটা আমার 'পাব'। অর্থাৎ মায়ের 'পাব'। আমরা দুই বোন। ছোট বোন ইস্কুলে যায় আর 'পাব' চালাবার মত গায়ের জোর মা'র নেই। তাই আমি এই জোয়ালে বাঁধা। অবশ্য আমি কাজ করতে ভালোবাসি। কিন্তু সকাল আটটা ন'টা থেকে রাত একটা অবধি কাজ করা চাট্টিখানি কথা নয়। ছোট বোনটা ইস্কুল থেকে ফিরে এসে মাঝে মাঝে আমাকে জোর করে ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেয়। অবশ্য একটা ঠিকে আছে। কিন্তু সে বেচারীর আবার শিগগির বাচ্চা হবে।'

ক্যেটে যেভাবে সব কথা নিঃসঙ্কোচে খোলাখুলি বলে যাচ্ছিল তাতে আমি ভরসা পেয়ে হেসে বললুম, 'তা আপনি একটা বিয়ে করলেই পারেন, এত বড় ব্যবসা, তায় আপনি সুন্দরী—'

'চুপ করো—' হঠাৎ ক্যেটে 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে চলে এল। বললে, 'চুপ করো। আমি গাঁয়ে থাকি বলে কি গাঁইয়া? আমি কি জানিনে ইণ্ডিয়ান নর্তকীরা কী অদ্ভুত সুন্দরী হয়? বর্ণটি সুন্দর শ্যাম, মিশমিশে কুচকুচে কালো চুল, লম্বা লম্বা জোড়া চোখ, চমৎকার বাস্ট আর হিপ—'

আমি গলা খাঁকারি দিয়ে বললুম, 'তুমি অত শত জানলে কোত্থেকে ?'

বললে, 'এই সব মাঝি-মাল্লারা এখানে বিয়ার খেতে আসে তাদের অনেকেই ভাটি রাইনে হল্যাণ্ড অবধি যায়। সেখানে সমুদ্রের জাহাজে কাজ নিয়ে কেউ কেউ তামাম দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। তাদেরই দু-একজন মাঝে মাঝে আমাকে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ছবির পোস্টকার্ড পাঠায়। বিশেষ করে যারা আমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে তারা ইণ্ডিয়া, ঈজিপ্ট থেকে খাবসুরত মেয়েদের ছবি পাঠিয়ে জানাতে চায়, 'তুমি তো আমাকে পাত্তা দিলে না ; এখন দেখ, আমি কি পেয়েছি'।'

আমি রক্তের গন্ধ পেয়ে বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, তুমি যে বললে, যারা তোমার সঙ্গে প্রেম করতে গিয়ে খানিকটে হতাশ হয়েছে—এ কথাটার প্রকৃত অর্থ আমাকে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়ে বলবে কি ?'

ক্যেটে বললে, 'সুন্দরী। বেশ বলেছো চাঁদ। কিন্তু সে কথা থাক। রাত একটা বেজেছে। পোলিৎসাই স্টুণ্ডে—পুলিস-আওয়ার্স—অর্থাৎ 'পাব' বন্ধ করতে হবে। এই ঝড়-বৃষ্টিতে এখন তুমি যাবে কোথায় ? উপরে চলো—'

আমি বাঙলাদেশের ছেলে। অন্য কারণে যা হোক তা হোক, কিন্তু বৃষ্টির ভয়ে আমি কারো বাড়িতে করুণার অতিথি হব—সেটা আমার জাত্যাভিমানে জব্বর লাগে। অবশ্য এই পোড়ার দেশে বারান্দা, রক, ভিলিকিনি (ব্যাল্‌কনি) নেই বলে শুকনো নদীর পোলের তলা ছাড়া অন্য কোথাও বৃষ্টির সময় গা বাঁচানো যায় না। বললুম, 'দেখো ফ্রলাইন ক্যেটে—'

কেট্যের অল্প নেশা হয়েছে কি না জানিনে—শুনেছি, অল্প নেশাতে নাকি মানুষের সাহস বেড়ে যায়—কিংবা সে টেরমের-গিন্নীর মত তথাকথিতা খাণ্ডারিনী কিংবা সত্যই প্রেমদায়িনী জানিনে। আমার দিকে কটকট করে তাকিয়ে বললে, 'চুপ !'

তারপর উঠে গিয়ে সব ক'টা জানলার কাঠের রেলিঙ পর্দা নামালে—এতক্ষণ শুধু শার্সিগুলোই বন্ধ ছিল—মেন দরজা আর সেই লিফটপানা খাঁচার ডবল তালার ডবল চাবি ঘোরালে, বারের পিছনে গিয়ে দু' মিনিটে ক্যাশ মেলালে, সুইচ বোর্ডের কাছে গিয়ে পটপট করে সে ঘরের চোদ্দটা আলো নেবালে, উপরে যাবার আলো জ্বালিয়ে দিয়ে আমাকে বললে, 'চলো।'

উপরে গিয়ে একটা কামরার দরজা খুলে আলো জ্বালালে। সত্যি সুন্দর ঘর। চমৎকার আসবাবপত্র। এক কোণে বাহারে কটেজ পিয়ানো। দেয়ালে নানা দেশের তীর ধনুক ঝোলানো। এক প্রান্তে অতি সূক্ষ্ম ডাচ লেসের কাজওলা বেড-কভার দিয়ে ঢাকা বিরাট রাজসিক কালো আবলুশ কাঠের পালঙ্ক।

বললে, 'বসো। আমি এখন দুটো গিলবো। এই ঘরেই নিয়ে আসছি। রোজ রাত্রে আমাকে একা খেতে হয়, বড় কষ্ট লাগে। তোমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়ই। তবে দাঁড়াও, এই সিগারেটটা খাও।' ব'লে সেণ্টার টেবিলের উপর থেকে একটি সিগারেট নিয়ে ধরালে। আমার হাতে দিয়ে বললে, 'খাও।' এ রমণী সম্পূর্ণ লৌকিকতা-বর্জিতা।

দশ মিনিট পরে এল বিরাট এক ট্রে হাতে করে। তাতে দু' প্লেট সূপ, দু' প্লেট সার্ডিন-সসিজ-অলিভ, গুচ্ছের রুটি-মাখন। টেবিলে সাজিয়ে, দু'খানা চেয়ার মুখোমুখি বসিয়ে বললে, 'আরম্ভ করো।' আমি মারিয়ানার ঠাকুরমার মত আদেশ করলুম, 'কেট্যে, ফাঙে মাল আন্—আরম্ভ করো অর্থাৎ প্রার্থনা করো।' কেট্যের হাত থেকে ঠং করে চামচ কাঁটা পড়ে গেল। ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকালে।

শ্রীমতী ক্যেটেকে লজ্জা দেবার জন্য যে আমি উপাসনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলুম তা নয়, আসলে আমি এ বাবদে চার্লস

ল্যামের শিষ্য। তিনি বলেছেন, খাবার পূর্বের এই প্রার্থনা কেমন যেন বেখাপ্পা। বরঞ্চ ভোরবেলায় শান্ত মধুর পরিবেশে বেড়াতে বেরোবার পূর্বে, কিংবা চাঁদিনী রাতে হেথা-হোথা চলতে চলতে আপন-ভোলা হয়ে যাওয়ার প্রাক্কালে, কিংবা বন্ধুসমাগমের পূর্বমুহূর্তের প্রতীক্ষা-কালে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার প্রয়োজন। শুধু তাই? মিলটন পঠন আরম্ভ করার সময় বিশেষ প্রার্থনা করা উচিত, শেক্সপীয়রের জন্য অন্য উপাসনা এবং 'ফেয়ারি কুইন' পড়ার পূর্বে অন্য এক বিশেষ উপাসনার প্রয়োজন। ভোজনকর্মের চেয়ে এসব জিনিসের মূল্য আমাদের জীবনে অনেক বেশী। প্রার্থনা যদি করতে হয় তবে এগুলোর জন্য আলাদা আলাদা প্রার্থনা তৈরি করে রাখার প্রয়োজন।

ল্যামকে আমি শ্রদ্ধা করি অন্য কারণে। এই কার্যারম্ভের উপাসনা সম্বন্ধে বিবৃতি দেবার সময় তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'হায়! শাক-সবজির জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি—ওসব আর খেতে ভালো লাগে না, কিন্তু এখনো যখন এস্‌পেরেগাস সামনে আসে তখন আমার মন মধুর আত্মচিন্তায় নিমগন হয়।' আপ্তবাক্য, আপ্তবাক্য, এ একটা আপ্তবাক্য!

আমার অনুরাগী পাঠকদের বলি, আমার লেখা যে আগের চেয়েও ক্রমাগত খারাপের দিকে যাচ্ছে তার প্রধান কারণ, বহুকাল ধরে এসপেরেগাসের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ নেই। তাজাটার কথা হচ্ছে না, তিনি মাথায় থাকুন, টিনেরটার কথাই বলছি। সরকার আমদানি বন্ধ করে দিয়েছেন। সেঁকো বিষ না কি এখনো আসে।

খুব অল্প লোকই মুখের লাবণ্য জখম না করে চিবোনো কর্মটি করতে পারে। আমি একটি অপরূপ সুন্দরী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মহিলাকে চিনতুম। চিবোবার সময় তাঁর দুই চোয়ালের উপরকার ছোট ছোট মাংসপেশীগুলো এমনই ছোট ছোট দড়ির মত পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতো যে বোধ করি তিনিও সেটা জানতেন, তাই যতদূর সম্ভব মাথা নিচু করে একদম প্লেটের কাছে ঝুঁকে পড়ে মাংস চিবোতেন। কেট্যের

বেলা দেখলুম, উল্টোটা। খাবার সময় তার মুখের হাসি-হাসি ভাবটা যেন আরো বেড়ে গেল। অবশ্য সে খেল অল্পই। বিয়ার পান করল প্রচুর। উপরে আসবার সময় ঢাউস এক জাগ বিয়ার সঙ্গে এনেছিল।

আমি বললুম, 'অত বিয়ার খাও কেন? দিনের শেষে না হয় এক আধ গেলাস খেলে। ঐ বিয়ার খেয়ে খেয়ে খিদেটি তো একেবারে গেছে। আমার দেশে অনেকেই চা খেয়ে খেয়ে এ রকম পিত্তি চটায়।'

আশ্চর্য হয়ে শুধালো, 'চা খেয়ে খেয়ে! একজন মানুষ দিনে ক' কাপ চা খেতে পারে?'

আমি বললুম, 'আমার দেশের লোকও ঠিক এই রকম অবাক মেনে শুধোবে, "একজন মানুষ দিনে ক' গেলাস বিয়ার খেতে পারে"।'

বিরক্তির সুরে বললে, 'থাক, ওসব কথা। তুমি আর পাঁচজনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে ঐ একই জিগির তুলো না। সমস্ত দিন ভূতের মত খাটি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে! ঐ বিয়ারই আমাকে দাঁড় কবিয়ে রেখেছে। না হলে হুমড়ি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যেতুম।'

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললুম, 'কিন্তু এর তো একটা সরল সমাধানও আছে। তোমাদের 'পাবে' বিস্তর আমদানি, তুমি দেখতে ভালো, বিয়ে করে একটা ভালো লোক এনে তাকে কাজে ঢুকিয়ে দাও না? তোমাদের দেশে তো শুনেছি, এ ব্যবস্থাটা অনেকেরই মনঃপূত।'

ক্যেটের ঐ চড়ুই পাখির খাওয়া ততক্ষণে শেষ হয়ে গিয়েছে। চেয়ারটা টেবিলের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে, আরেকখানা চেয়ারের উপরে দু' পা লম্বা করে দিয়ে ভস্‌ভস্ করে সিগারেট টানছিল। হেসে বললে, 'সে এক্সপেরিমেণ্ট হয়ে গিয়েছে।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'এই অল্প বয়সে তোমার আবার বিয়ে হল কি করে?'

'দূর, পাগলা। আমি না। মা করেছিল এক্সপেরিমেণ্টটা। সে

তার বাপের একমাত্র মেয়ে। তাই বাবাকে বিয়ে করে এনে স'পে দিয়েছিল 'পাব'টা তার হাতে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর ?'

চিন্তা করে বললে, 'সমস্তটা বলা একটু শক্ত। শুনেছি, বাবা কাজ-কারবার ভালোই করতো। এ ঘরের মত আর সব ঘরেও যে-সব ভালো ভালো আসবাবপত্র আছে সেগুলো ঐ সময়ই কেনা—বাবা লোকটি শৌখিন। তারপর আমার আর আমার ছোট বোনের জন্ম হল। তারপর বাবার বয়েস যখন চল্লিশ—বাবা মা'র একই বয়েস—তখন সে মজে গেল এক চিংড়ি মেয়ের প্রেমে, বয়েস এই উনিশ, বিশ। তারপর কি হয়েছিল জানিনে, আমি কিছু কিছু দেখেছি, তবে তখনো বোঝবার মত জ্ঞান-গম্যি হয়নি। শেষটায় একদিন নাকি হঠাৎ মা নিচে এসে 'বারে'র পিছনে দাঁড়াল, 'পাবে'র হিসেব-পত্র নিজেই দেখতে আরম্ভ করলো। তখন বাবা নাকি বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।'

আমি শুধালুম 'ডিভোর্স হয়েছিল ?'

বললে, 'না। মা চায়নি, বাবাও চায়নি। কেন চায়নি, জানিনে।'

আমি শুধালুম, 'তারপর কি হল ?'

ক্যেটে বললে, 'ঠিক ঠিক জানিনে। তবে শুনেছি, বাবাতে আর ঐ মেয়েতে ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কার নেশা আগে কেটেছিল বলতে পারবো না। তারপর হয়তো বাবা মা'তে ফে'র বনিবনা হতে পারতো, কিন্তু হয়নি। বোধ হয় মা-ই চায়নি, অবশ্য আমি সঠিক বলতে পারবো না, কারণ মা আমার নিদারুণ আত্মাভিমানিনী—এসব যা বললুম, এর কিছুটা আমার চোখে দেখা, আর কিছুটা পাঁচজনের কাছ থেকে শোনা—মা একদিনের তরে একটি কথাও বলেনি।'

আমি শুধালুম, 'তোমার বাবা—?'

বললে, 'বুঝেছি। মাইল তিনেক দূরে ঐ ক্ল্যাঙ.স্ ডর্ফে থাকে।

অবস্থা ভালো নয়, মন্দও নয়। আমার সঙ্গে মাসে ছ'মাসে রাস্তায় দেখা হলে, হ্যাট তুলে আগের থেকেই নমস্কার করে—যেন আমি তার পরিচিতা কতই না সম্মানিতা মহিলা—কাছে এসে কুশলাদিও শুধোয়। বাবার আদব-কায়দা টিপ্‌টপ্‌। মায়ের সঙ্গে দেখা হলেও তাই। একবার আমি মায়ের সঙ্গে ছিলুম। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দুজনাতে কথাবার্তাও হল, তারপর যে যার পথ ধরলো।' এক মগ পুরো বিয়ার শূন্য করে বললে, 'তোমার বোধহয় ঘুম পেয়েছে?'

আমি তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললুম, 'না না, মোটেই না।'

আসলে আমার তখন জ্বর-জ্বর ভাব আরম্ভ হয়ে গিয়েছে আর সে সময় সব রক্ত মাথায় উঠে গিয়ে ঘুম দেয় চটিয়ে।

ক্যেটে উঠে বললো, 'জল ধরেছে। এবারে জানলাটা খুলে দি। দেখবে বৃষ্টিশেষের কী অদ্ভুত সুন্দর ভেজা পাইন-বনের গন্ধ আসছে।'

আমি বললুম, 'এই বিয়ার আর সিগারেটের গন্ধে তোমার তো নাক-মুখ ভরতি, এর ভিতরও সেই অতি সামান্য পাইনের খুশবাই পাও?' ক্যেটে জানলা খুলে দিয়ে, দুই কনুই কাঠের উপর রেখে নিঃশব্দে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম, যেন আমাদের দেশের কোনো সুন্দরী নারী-মূর্তি পিছন থেকে দেখছি। 'আমাদের দেশের নারীমূর্তি' ইচ্ছে করেই বললুম, কারণ ইয়োরোপীয় ভাস্কররা তাদের নারীমূর্তির পিছনের দিকটা বড় অযত্নে খোদাই করে। 'নিতম্বিনী'র ইংরিজী প্রতিশব্দ নেই।

ফিরে এসে বললে, 'কিছু মনে করো না, তোমাকে জাগিয়ে রাখছি বলে। তা আমি কি করবো, বলো। কাজ শেষ করে খেতে খেতে দেড়টা বেজে যায় তখন আমি কার সঙ্গে সোসাইটি করতে যাব? আমার সঙ্গে রসালাপ করার জন্য কেই বা তখন জেগে বসে?'

আমি বললুম, 'সে রকম প্রাণের সখা থাকলে সমস্ত রাত জানলার নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রহর গোনে। পড়োনি বাইবেল, তরুণী শোক করছে, তার দয়িত সমস্ত রাত হিমে দাঁড়িয়ে মাথার চুল ভিজিয়ে

ফেলেছে বলে। অতখানি না হোক ; একটা সাদামাটা ইয়াং ম্যানই জোগাড় করো না কেন?'

বুকের কালো জামায় সিগারেটের ছাই পড়েছিল। সেইটে ঠোনা দিয়ে সরাতে সরাতে বললে, 'আমার আছে। না, না, দাঁড়াও, ছিল।' কি জানি, ছিল না আছে, কি করে বলবো।'

আমি অবাক হয়ে শুধালুম, 'সে কি? এ আবার কি রকম কথা?'

বললে, 'প্রথম যেদিন তাকে ভালোবেসেছিলুম সেদিনকার কথায় স্মরণে আজও আমার মনপ্রাণ গভীর শান্তিতে ভরে যায়। আজও যদি তাই থাকতো, তবে এতক্ষণে ছুটে যেতুম না তার বাড়িতে? তাকে ধরে নিয়ে এসে তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতে? এই রাত তিনটেয়ও।'

(১৪)

ছেলেবেলায় শরচ্চাটুজ্যের আত্মজীবনী-মূলক ভ্রমণ-কাহিনীতে পড়েছিলুম, একদা গভীর রাতে হৃদয়-তাপের ভাপে ভরা একখানা চিঠি লিখে সেই গভীর রাতেই সেখানা পোস্ট করতে যান, কারণ মনে মনে বিলক্ষণ জানতেন, ভোরের আলো ফুটে ওঠার পর সাদা চোখে তিনি ও চিঠি ডাকে ফেলতে পারবেন না। শরচ্চাটুয্যে কোনোপ্রকারের নেশা না করে শুধু নিশীথের ভূতে পেয়েই বে-এক্তেয়ার হয়েছিলেন, আর এস্থলে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণে 'বিয়ার এ-মেয়ের মাথায় বেশ কিছুটা চেপেছে—কাজের জিম্মাদারিতে মগ্ন সচেতন মন ওটাকে ক্যাশ না মেলানো অবধি আমল দেয়নি—এবং জ্বরের তাড়সানিতে আমিও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নই ; এখন মেয়েটি কি বলতে যে কি বলে ফেলবে আর পরে নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হবে সেই ভেবে আমি একটু শঙ্কিত হলুম।

হঠাৎ চেয়ারটা কাছে টেনে এনে আমার দিকে ঝুঁকে বললে,

'তুমি ভাবছো, আমি আমার হৃদয়টাকে জামার আস্তিনে বয়ে বয়ে বেড়াই—না? আর যে কেউ একজনকে পেলেই তার কাঁধে মাথা রেখে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তার কোটের পিছন দিকটা ভিজিয়ে দিই—না?'

আমি অনিচ্ছায় বললুম, 'আর বললেই বা কি? আমরা প্রায় একবয়েসী, তায় আমি বিদেশী, কাল চলে যাবো আপন পথে—'

'কি বললে? কাল চলে যাবে? কি করে যাবে শুনি? আমি কি লক্ষ্য করিনি যে তোমার জ্বর চড়ছে? এখন তোমাকে শুতে দেওয়াই আমার উচিত। কিন্তু তাতে কোনো লাভ নেই। জ্বর তার চরমে না ওঠা পর্যন্ত এখন তুমি শুধুটা এপাশ-ওপাশ করবে, আর মাথা বনবন করে ঘুরবে। তাই কথাবার্তাই বলি। জ্বরের পর অবসাদ যখন আসবে তখন উঠবো।'

আমি এতক্ষণ একটা সুযোগ খুঁজছিলুম আমার এখানে থাকা-খাওয়ার দক্ষিণার কথাটা তুলতে। মোকা পেয়ে বললুম, 'দেখো ফ্রলাইন ক্যেটে—'

'ফ্রলাইন বলতে হবে না।'

আমি বললুম, 'সুন্দরী ক্যেটে, কাটেরিনা অর্থাৎ ক্যাৎরীন, আমি বেরিয়েছি হাইকিঙে। তুমি আমার কাছ থেকে যত কমই নাও না কেন, 'ইন্,' হোটেল 'ক্লাইপেতে' থাকবার মত রেস্ত আমার পকেটে নেই। কালই আমাকে যেতে হবে।'

ক্যেটে আপন মনে একটু হাসলে। তারপর বললে, 'তুমি বিদেশী, তদুপরি গ্রামাঞ্চলে কখনো বেরোওনি। না হলে বুঝতে এটা হোটেল নয়, এখানে রাত্রিবাসের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ ঘরটা আমাদের আপন আত্মীয়স্বজনের জন্য গেস্ট-রুম, এরকম আরো দু'তিনটে আছে। প্রায় সংবৎসরই ফাঁকা পড়ে থাকে। কিন্তু সেটা আসল কথা নয়। আসল কথা হচ্ছে, তুমি ভাবছো আমরা 'পাব' চালাই বলে আমাদের আর কোনো লৌকিকতা, সামাজিকতা নেই—দয়া-মায়া,

দোস্তি-মহব্বতের কথা না হয় বাদই দিলুম। ভালোই হল। এবার থেকে যখন আমার গড্-ফাদার এ ঘরটায় শোবে, তখন সকালবেলা ব্রেকফাস্টের সঙ্গে তাঁকে একটা বিল দেব!'

আমি আর ঘাঁটালুম না। আমি অপরিচিত, অনাত্মীয় এসব কথা রাত তিনটের সময় সুন্দরী তরুণীর সামনে—তাও নির্জন ঘরে—তুলে কোনো লাভ নেই। আমার শুধু আবছা-আবছা মনে পড়লো, আফ্রিকা না কোথায়, মার্কো পোলো গাছতলায় বসে ভিজছেন আর একটি নিগ্রো তরুণী গম না ভুট্টা কি যেন পিষতে পিষতে মা'কে গান গেয়ে গেয়ে বলছে, 'মা, ঐ বিদেশীকে বাড়ি ডেকে এনে আশ্রয় দি।' সত্যেন দত্ত গানটির অনুবাদ করেছেন। এবং এ-কথাটাও এ-প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত, খাস নিগ্রোরা সাদা চামড়ার লোককে বড় 'তাচ্ছিল্যের' দৃষ্টিতে দেখে—আমাদের মত সাদা-পাগলা নয়।

নিগ্রো তরুণীর মায়ের কথায় আমাদের কথা মোড় ঘোরাবার সুযোগ পেলুম। বললুম, 'হোটেল যদি না হয়, তবে এরকম অপরিচিতকে ঘরে আনাতে তোমার মা কি ভাববে?'

পাছে বাড়ির লোক ডিস্টার্বড্ হয় তাই রুমাল দিয়ে মুখ চেপে ক্যেটে তার খল-খলানি হাসি থামাবার চেষ্টা করলে, কিন্তু হাসি আর থামতেই চায় না। আমি বেকুবের মত তাকিয়ে রইলুম।

অনেকক্ষণ পরে গুমরানো হাসি চেপে-ছেড়ে চেপে-ছেড়ে বললে, 'তোমার মত সরল লোক আমি সত্যই কখনো দেখিনি। তোমার কল্পনাশক্তিও একেবারেই নেই। আচ্ছা ভাবো তো, রাত বারোটার সময় তিনটে আধা-মাতাল মাল্লা যদি আমার 'পাবে' ঢুকে বিয়ার চায়, তখন কি আমি তাদের তাড়িয়ে দিই? 'সেলার' মানে বাপের সুপুত্তুর নয়। আমিও দেখতে মন্দ না। 'পাব'ও নির্জন। ওরা 'বারে' দাঁড়িয়ে গাল-গল্প এমন কি ফষ্টি-নষ্টির কথা বলবেই বলবে। তখন কি মা এসে আমার চরিত্ররক্ষা করে?'

আমি আমতা আমতা করে বললুম, 'তা বটে, তা বটেই তো।'

কিন্তু বল তো, ওরা যদি বিয়ার খেয়ে পয়সা না দিয়ে চলে যেতে চায় তখন তুমি কি করো?'

হেসে বললে, 'দেখবে?' তারপর উঠে গিয়ে ঘরের দরজা একটু-খানি ফাঁক করে আস্তে আস্তে মাত্র একবার শিস দিলে। অমনি কাঠের সিঁড়িতে কিসের যেন শব্দ শুনতে পেলুম। আর সঙ্গে সঙ্গে দরজা ধাক্কা দিয়ে ঘরে ঢুকলো ভীষণদর্শন বিকটের চেয়েও বিকট ইয়া লাশ এক আলসেশিয়ান। আমার দিকে যেভাবে তাকালে তাতে আমি লাফ দিয়ে জুতোসুদ্ধ উঠে দাঁড়িয়েছি খাটের উপর। ভয়ে আমার মুখ দিয়ে কথা ফুটছে না যে বলবো, ওকে দয়া করে বের করো। ক্যেটের তবু দয়া হল। কুকুরটাকে আদর করতে করতে বললে, 'না, ব্রুনো, ইনি আমাদের আত্মীয়। বুঝলি?' এবারে আরো বিপদ। ব্রুনো ন্যাজ নাড়তে নাড়তে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন আমার 'প্যার' নেবার জন্য। আমি হাত জোড় করে বললুম, 'রক্ষে করো, নিষ্কৃতি দাও।'

ক্যেটে বললে, 'কিচ্ছু না। শুধু ব্রুনোকে বলতে হয়, ঐ তিনটে লোককে ঠেকা তো। ব্যস্! সে তখন দরজায় দাঁড়িয়ে তিনটে বেহেড সেলারকে ঠেকাতে পারে। অবশ্য এরকম ঘটনা অতিশয় কালে-কস্মিনে ঘটে। বাপের সুপুত্তুররা তখন সুড়সুড় করে পয়সা দিয়ে পালাবার পথ পায় না। অবশ্য রাইন নদীর প্রায় সব সেলারই পুরুষানুক্রমে এ 'পাব' চেনে। নিতান্ত ডাচম্যান কিংবা ঐ ধরনের বিদেশী হলে পরে আলাদা কথা—তাও তখন 'পাবে' অন্য খদ্দের থাকলে কেউ ওসব করতে যায় না।'

তারপর বললে, 'তুমি এখন একটু ঘুমুবার চেষ্টা করো। আমি তোমাকে একটা নাইট-শার্ট দিচ্ছি।' ঘরের আলমারিতেই ছিল। বললে, 'আমি এখখুনি আসছি।' আমি আর লৌকিকতা না করে কোট-পাতলুন ছেড়ে সেই শেমিজ-পারা নাইট শার্ট পরে লেপের ভিতর গা ঢাকা দিলুম।

হে মা মেরি! এ কি? ক্যেটে আরেক জাগ্ বিয়ার নিয়ে এসেছে!

আমি করুণ কণ্ঠে বললুম, 'আর কত খাবে?'

বিরক্তির সুরে বললে, 'তুমিও ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি?'

আমি বললুম, 'না, বাপু, আমি আর কিছু বলবো না। একদিন, না হয় দুদিনের চিড়িয়া, আমার কোথায় বা সুযোগ, কীই বা শক্তি। কিন্তু এবারে তুমি 'ওর সঙ্গে ভিড়লে নাকি' বললে। সেই ও-টি কে?'

'অটো। যাকে ভালোবাসি, না বাসিনে বুঝতে পারছিনে। তাই বলেছিলুম, সে আছে কি নেই জানিনে।'

আমি বললুম, 'তুমি বড় হেঁয়ালিতে হেঁয়ালিতে কথা বলো।'

'আদপেই না। আসলে তুমি বিদেশী বলে আমাদের আচার-ব্যবহার সামাজিকতা-লৌকিকতা জানো না। তাই তোমার অনেক জিনিস বুঝতে অসুবিধে হয়, যেগুলো আমাদের দশ বছরের বাচ্চার কাছেও জলের মত তরল। যেমন তুমি হয়তো মনে করেছ আমি 'বার'-এর পিছনে দাঁড়িয়ে বিয়ার বিক্রি করি বলে আমি 'বার-মেড্'। এবং 'বার-মেড'রা যে সচরাচর খদ্দেরকে একাধিক প্রকারে তুষ্ট করতে চায়—প্রধানত অর্থের বিনিময়ে—সেটাও কিছু গোপন কথা নয়। বিশেষত শহরে। গ্রামে ঠিক ততখানি নয়। আমি যদি এখানে কাজের সাহায্যের জন্য ঠিকে নি, তবে সে আমাদের চেনা-শোনারই ভিতরে বলে ততখানি বে-এক্তেয়ার হতে সাহস পাবে না। আর আমি, আমার মা-বোন, দাদামশাই আমরা 'পাব'-এর মালিক। আমরা যদি মুদি, দরজী বা গারাজের মালিক হতুম তা হলে আমাদের সমাজ আমার কাছ থেকে যতখানি সংযম আশা করতো এখনো তাই করে। অবশ্য বাড়িতে ব্যাটাছেলে থাকলে সে-ই 'বার'-এর কাজ করতো, ভিড়ের সময় মা বোনেরা একটু-আধটু সাহায্য করতো। মুদি কিংবা কসাইকে যেমন তার বউ-বেটি সাহায্য করে থাকে।' তারপর

হঠাৎ এক ঝলক হেসে নিয়ে বললে, 'তুমি ভাবছো, আমি স্নব,—না ? জাতের দেমাক করছি। আমি 'বার-মেডের' মত ফ্যালনা নই—রীতিমত খানদানী মনিষ্যি, না ?'

(১৫)

আমি চুপ। যে-মেয়ে মাতাল সেলারদের সামলায় আমি তার সঙ্গে পারবো কেন ?

ক্যেটে বললো. 'তবে শোনো,—

আচ্ছা বলো তো, তোমার কখনো এমনধারা হয়েছে, যে-জিনিস দেখে দেখে সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলে সে হঠাৎ একদিন দেখা দিল অপরূপ নবরূপ নিয়ে ? এই যে দিক্‌ধেড়েঙ্গে অটো-টা, চুল ছাঁটা যেন পিনকুশনের মাথাটা, হাত দু'খানা যেমন বেঢপ বেঁটে—থাকগে, বর্ণনা দিয়ে কি হবে—একে দেখে আসছি যবে থেকে জ্ঞান হয়েছে, ইস্কুল গিয়েছি ফিরেছি একসঙ্গে, কখনো মনে হয়নি পাড়ার আর পাঁচটা বাঁদর আর এ বাঁদরে কোনো তফাত আছে, অথচ হঠাৎ একদিন তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এ কাকে দেখছি ? সে সুন্দর কি না, কুশ্রী কি না, কিছুই মনে হল না, শুধু মনটা যেন মধুতে ভরে উঠলো আর মনে হল, এ আমার অটো, একে আরো আমার করতে হবে।

তুমি বিশ্বাস করবে না, ঠিক সেই মুহূর্তেই সেও আমার দিকে এমনভাবে তাকালে যে আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পারলুম, সেও ঠিক ঐ কথাটিই ভেবেছে।

আর এমন এক নতুনভাবে তাকালো যে আমার লজ্জা পেল। আমার মনে হল, পুল-ওভারটার উপর কোটটা থাকলে ভাল হত।

আচ্ছা, বলো তো, এ কি একটা রহস্য নয় ! যেমন মনে করো, তুমি আমার একখানা বই দেখে মুগ্ধ হয়ে বললে, 'চমৎকার বই !'

আমি কি তখন তোমাকে সেটি এগিয়ে দেব না, যাতে করে তুমি আরো ভালো করে দেখতে পারো ?'

চুপ করে উত্তরের প্রতীক্ষা করছে বলে বললুম, 'আমি কি করে বলবো ? আমি তো ব্যাটাছেলে।'

বললে, 'অন্য দিন ইস্কুল থেকে ফিরে বাড়ির কাজে লেগে যাই, আজ বারবার মনে হতে লাগল, যাই একবার অটোকে দেখে আসি। যাওয়া অত্যন্ত সোজা। কোনো অছিলারও প্রয়োজন নেই। তার দু দিন আগেই তো এক বিকেলের ভিতর মা আমায় অটোদের বাড়িতে পাঠিয়েছে তিন তিনবার—এটা আনতে, সেটা দিতে। তা ছাড়া ইস্কুলের লেখাপড়া নিয়ে যাওয়া-আসা তো আছেই। কিন্তু তবু কেন, জানো, যেতে পারলুম না। প্রতিবারে পা বাড়িয়েই লজ্জা পেল। খুব ভালো করেই জানি, মা কিছু জিজ্ঞেস করবে না, তবু মনে হল, মা বুঝি শুধোবে, 'এই! কোথা যাচ্ছিস ?' আর জিজ্ঞেস করলেই বা কি ? কতবার বেরবার সময় নিজের থেকেই তো বলেছি, 'মা, আমি ঝপ করে এই অটোদের বাড়ি একটুখানি হয়ে আসছি।' মা হয়তো শুনতেই পেত না।

তবু যেতে পারলুম না। আর সর্বক্ষণ মনে হল, মা যেন কেমন এক অদ্ভুত নূতন ধরনে আমার দিকে তাকাচ্ছে।

অন্য দিন বালিশে মাথা দিতে না দিতে আমার ঘুম বেঘোর। আজ প্রহরের পর প্রহর গির্জে-ঘড়ির ঘণ্টা শুনে যেতে লাগলুম রাত বারোটা পর্যন্ত। আর মনে হল সুস্থ মানুষ বিনিদ্রদের কথা চিন্তা করে ঘড়ির ঘণ্টা বানায় নি। সন্ধ্যাটা ছ'টা ঘণ্টা দিয়ে শুরু না করে যদি একটা ঘণ্টা দিয়ে শুরু করতো তবে রাত বারোটায় তাকে শুনতে হত মাত্র ছ'টা ঘণ্টা। এখন পৃথিবীতে যা ব্যবস্থা তাতে যাদের চোখে ঘুম নেই তাদের সেই ঠ্যাং-ঠ্যাং করে বারোটার ঘণ্টা না শোনা অবধি নিষ্কৃতি নেই।

তারপর আরম্ভ হল জোর ঝড়-বৃষ্টি। ঝড়ের শোঁ-শোঁ আওয়াজ

আর খড়খড়ি জানলার ঝড়ঝড়ানি আমার শুয়ে শুয়ে শুনতে বড় ভালো লাগে, কিন্তু আজ হল ভয়, কাল যদি একরকম ঝড় থাকে তবে মা তো আমাকে ইস্কুল যেতে দেবে না। অটোকে দেখতে পাবো না। পরখ করে নিতে পারবো না, সে আবার তার পুরনো চেহারায় ফিরে গিয়েছে, না আজ যে-রকম দেখতে পেলুম সেই রকমই আছে।

সব মনে আছে, সব মনে আছে, প্রত্যেকটি কথা আমার মনে আছে।'

ক্যেটে বোধ হয় আমার মুখে কোনো অবিশ্বাসের চিহ্ন দেখতে পেয়েছিল তাই এ-কথা বললো। আমি ভাবছিলুম, বেশী বিয়ার খেলে মানুষের স্মৃতিশক্তি তো দুর্বল হয়ে যায়, এর বেলা উল্টোটা হল কি করে? হবেও বা। পায়ে কাঁটা ফুটলে বড্ড লাগে, কিন্তু পাকা ফোড়াতে সেই কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েই তো মানুষ আরাম পায়। বললুম, 'তুমি বলে যাও। প্রেম বড় অদ্ভুত জিনিস।'

ক্যেটে অনেকক্ষণ ধরে বিয়ারে চুমুক দেয় নি, সিগারেটও ধরায় নি। প্রেমে তো নেশা আছে বটেই, প্রেমের স্মরণেও নেশা—অন্য নেশার প্রয়োজন হয় না?

ক্যেটে বললে, 'আশ্চর্য, এবং তুমিও বিশ্বাস করবে না, আমি তখনো বুঝতে পারি নি, কবিরা একেই নাম দিয়েছেন প্রেম। প্রেমের যা বর্ণনা কবিরা দিয়েছেন তাতে আছে, মানুষের সর্বসত্তা নাকি তখন বিরাটতর চৈতন্যলোকে নিমজ্জিত হয় এবং পরমুহূর্তেই সে নাকি নভোমণ্ডলে উড্ডীয়মান হতে হতে দ্যুলোক সুরলোক হয়ে হয়ে ব্রহ্মাণ্ডাতীত লোকে লীন হয়ে যায়; আর আমি ভাবছি, কাল যদি ঝড় হয় তবে আমি ইস্কুল যাব কী করে! দুটো যে একই জিনিস জানবো কি করে?

পরদিন দেখি, আকাশ বাতাস সুপ্রসন্ন। আসন্ন বর্ষণেরও কোনো আভাস নেই।

অন্য দিন মায়ের তাড়া খেতে খেতে হন্ত-দন্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে

বাড়ি থেকে বেরতুম, ইস্কুল যাবার জন্যে, ছোট বোন বিরক্ত হয়ে আগেই বেরিয়ে যেত ; আজ আমি একঘণ্টা আগে থেকেই তৈরি। অন্য দিন জুতোতে কালি বুরুশ লাগাবার ফুরসত কোথায় ? আজ ফিটফাট। আমি জামা-কাপড় সম্বন্ধে চিরকালই একটু উদাসীন—অন্য মেয়েদের মত নই—আজ ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে মনে হল এ যেন সার্কাসের সঙের ওয়ার্ডরোব খুলেছি।'

আমি বললুম, 'তোমাকে সাদা-মাটা কাপড়েই এত সুন্দর দেখায় যে বাহারে জামা-কাপড় পরলে যে আরো শ্রীবৃদ্ধি হবে তা আমার মনে হয় না। এক লিটার বিয়ারের মগে এক লিটারই ধরে। সস্তা বিয়ার দিয়ে না ভরে দামী শ্যাম্পেন দিয়ে ভরলেও তাই।'

ক্যেটে বললে, 'থ্যাঙ্কস্।' সুন্দরী বলাতে ইতিমধ্যে দুবার তাড়া খেয়েছি। এবারে দেখি, সে মোলায়েম হয়ে গিয়েছে।

বললে, 'অটোও এখন বলে আমাকে সাদা-মাটাতেই ভালো দেখায়।' একটু করুণ হাসি হাসলে।

ক্যেটে যে 'এখন' কথাটাতে বেশ জোর দিয়েছে সেটা আমায় এড়িয়ে যায় নি। তাই শুধালুম, 'অটো 'এখন' বলে, কিন্তু আগে কি অন্য কথা বলতো ?'

'সেই 'তখন' আর 'এখনের' কথাই তো হচ্ছে। সেটাই প্রায় শেষ কথা। একটু সবুর করো। না, তাড়াতাড়ি শেষ করে দেব ?'

আমি বললুম, 'দোহাই তোমার, সেটি ক'রো না। পরের দিন সকালবেলা কি হল, তাই বলো।'

'এক ঘণ্টা আগের থেকে তৈরি অথচ বেরবার সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, আমার পা যেন আর নড়তে চায় না। এদিকে বোন খুশী হয়েছিল, আজ আমার সঙ্গ পাবে বলে। সে বারবার বলে, "চলো, চলো," আর আমি তখন বুঝতে পেরেছি, কি ভুলটাই না করেছি। বোন সঙ্গে থাকবে—ওদিকে অটোকে একা পেলেই ভালো হত না ?

অত সাত তাড়াতাড়ি তৈরি না হলে বোন বেরিয়ে গেলে অটোতে আমাতে, সুদ্ধু আমরা দুজনাতে একসঙ্গে যেতে পারতুম। অবশ্য এমনটাও আগে হয়েছে যে আমার দেরি দেখে বোন বেরিয়ে গিয়েছে, এবং তারপর আরো দেরি হওয়াতে অটোও আমার জন্য অপেক্ষা করে নি। কিন্তু তখন তো আমি অটোর জন্য থোড়াই পরোয়া করতুম!

শেষটায় বোনের সঙ্গেই বেরুতে হল। ঘরে বসে থাকবার তো আর কোনো অছিলা নেই। ওদিকে আবার ভয়, বেশী দেরি দেখে অটো যদি একা চলে যায়।

দূর থেকে দেখি, অটো রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

এবং আশ্চর্য! পরেছে রবিবারে গির্জে যাবার তার ব্লু সার্জের পোশাকী স্যুট! এটা এতই অস্বাভাবিক যে, বোন পর্যন্ত চেঁচিয়ে শুধোলে, 'এ কি অটো, রববারের স্যুট কেন?'

'অটোর রববারের স্যুট পরা নিয়ে সেদিন কী হাসাহাসি। অটোটাও আকাট। কাউকে বলে ইস্কুল ছুটির সঙ্গে সঙ্গে সোজা মামা বাড়ি যাবে, কাউকে বলে পাদ্রী সায়েবের কাছে যাবে। আরে বাপু, যা বলবি একবার ভেবে-চিন্তে বলে নে না।

আমি কিন্তু হাসিনি। অটো রাজবেশে সেজেছিল, তার রাজ-রানীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে—আর আমি রাজরানী সেজেছিলুম, আমার রাজার সঙ্গে দেখা হবে বলে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, এটা ভারী সুন্দর বলেছ।'

ক্যেটে বললে, 'শীতকালে যখন দিনের পর দিন অনবরত বরফ পড়ে, রাইনেও জাহাজ আঁধা-বোটের চলাচল কমে যায়, খদ্দের প্রায় থাকেই না, তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন কাটে 'পাবের' কাউণ্টারের পিছনে বসে বসে। তখন মন যে কত আকাশ-পাতাল হাতড়ায়, কত অসম্ভব অসম্ভব স্বপ্ন দেখে, অটোকে বলার জন্য সুন্দর সুন্দর নূতন নূতন তুলনা ছলনা খোঁজে, সেটা বলতে গেলে দশ

মিনিটের ভিতরই শেষ হয়ে যাবে, অথচ আমি ভেবেছি, তুই আড়াই তিন বছর ধরে।'

আমি বললুম,

'কেটেছে একেলা বিরহের বেলা
আকাশ কুসুম চয়নে
সব পথে এসে মিলে গেল শেষে
তোমার দু'খানি নয়নে॥'

ক্যেটে পড়াশুনোয় বোধ হয় এক কালে ভালোই ছিল, অন্তত লিরিকে যে তার স্পর্শকাতরতা আছে সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর এ-জিনিসটা তো লেখাপড়া শেখার উপর খুব একটা নির্ভর করে না। রাগ-রাগিণী-বোধ, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সাড়া দেওয়া এসব তো ইস্কুল শিখিয়ে দিতে পারে না, যার গোড়ার থেকে কিছু আছে তারই খানিকটে মেজেঘষে দিতে পারে মাত্র।

সব চেয়ে তার ভালো লাগল ঐ আকাশ-কুসুম-চয়ন ব্যাপারটা।

আমি বললুম, 'জানো, ঐ সমাসটা আমার মাতৃভাষায় এমনই চালু যে ওটা দিয়েও নূতন করে রসসৃষ্টি করা যায়, এ রকম আকাশ-কুসুম-চয়ন মহৎ কবিই করতে পারেন। এই যেরকম সকলের কাছে সাদামাটা অটো হঠাৎ একদিন তোমার কাছে নবরূপে এসে ধরা দিল।

তারপর?'

'ইস্কুল ছাড়ি আমরা দুজনাতে এক সঙ্গেই। আমি পাবে ঢুকলুম। অটো রেমাগেনে এপ্রেন্টিসিতে।

সময় পেলেই 'পাবে' ঢুঁ মেরে আমাকে দেখে যেত। আর শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি ছিল আমাদের ছুটি—মা তখনো 'পাবের' কাজ সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় নি। সে সময় পায়ে হেঁটে, বাইসিক্লে, ট্রেনে বাসে আমরা এদেশটা ইঞ্চি ইঞ্চি করে চষেছি। শেষটায় অটো

কিনলো একটা ক্যাম্বিসের পোর্টেবল্, কলাপ্সিবল্ নৌকো। তাতে চড়েঁ উজানে লিন্‌ৎস থেকে ভাটিতে কলোন পর্যন্ত কত বারই না আসা-যাওয়া করেছি। শুধু আমরা ছুজনা, আর কেউ না। গরমের ছুপুরে ননেন্‌বের্ট দ্বীপে—ঐ তো রাইন দিয়ে একটু ভাটার দিকে—গাছতলায় শুয়ে শুয়ে, পোকার উৎপাতে মুখ রুমাল দিয়ে ঢেকে, জ্যোৎস্না রাতে নৌকো স্রোতের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বরফের ঝড়ে আটকা পড়ে গ্রামের ঘরোয়া 'পাব' বা 'ইনে' কাটিয়েছি রাত। ছুজনাতে নিয়েছি ছুটি ছোট কামরা। শেষ রাতে ঘুম ভাঙলে মাঝখানের দেয়ালে টোকা দিয়ে অটোকে জাগিয়েছি, কিংবা সে আমাকে জাগিয়েছে। জেলের কয়েদীরা যে রকম দেয়ালে টোকা দিয়ে সাঙ্কেতিক কথা কয়, আমরাও সেই রকম একটা কোড্ আবিষ্কার করেছিলুম। আর সমস্তক্ষণ মনে মনে হাসতুম, সে অনায়াসে আমার ঘরে আসতে পারে, আমি তার ঘরে যেতে পারি—তবু বড় ভালো লাগত এই লুকোচুরি।

ইস্কুলে থাকতে অটো কালে-কস্মিনে একটু-আধটু বিয়ার খেত—সে কিছু ধর্তব্যের মধ্যে নয়। চাকরি পেয়ে সে আস্তে আস্তে মাত্রা বাড়ালো। আমিও সঙ্গে সঙ্গে খেতে লাগলুম। তারপর এক দিন তার মাত্রা এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছল যার তুলনায় আমার আজকের বিয়ার খাওয়া নিতান্ত 'জলযোগই' বলা যেতে পারে। অর্থাৎ শনির সন্ধ্যা থেকে সোমের সকাল অবধি সর্বদাই ঢুলুঢুলু নয়ন।

আমি মন্তব্য করিনি, বাধাও দিই নি। যতখানি পারি তাকে সঙ্গ দিতুম।

তারপর একদিন হল এক অদ্ভুত কাণ্ড। পড়ল কোন্ এক টেম্পারেন্স না কিসের যেন পাদ্রীর পাল্লায়। তাদের নাকি সব রকম মাদক দ্রব্য বর্জন করা ধর্মেরই অঙ্গ! আমরা ক্যাথলিক। মদ খাই—বাড়াবাড়ি না করলেই হল। ফ্রান্‌ৎসিস্‌কানর, বেনেডিক্-

টিনার এসব ভালো ভালো লিক্যোর ত আবিষ্কার করেছে পাদ্রী সায়েবরাই। আমাদের গাঁয়ের পাদ্রী সায়েবের 'সেলারে' যে মাল আছে তা আমার 'পাবের' চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

অটো হুম্ করে মদ ছেড়ে দিল। আমি খেলে আমার দিকে আড়-নয়নে তাকায়। এ আবার কী!

মদ সিগরেট কোনো-কিছু একটা হঠাৎ ছেড়ে দিলে মানুষ খটখিটে হয়ে যায়। অটো আমাকে ভালোবাসতো বলে সেটা যত-দূর সম্ভব চাপবার চেষ্টা করতো। আমি টের পেতুম।

জানিনে, পুরনো অভ্যাসবশত, না কর্তব্যজ্ঞানে সে তখনো আমার সঙ্গে শনি রবি বাইরে যায়, কিন্তু কেমন যেন আর জমতে চায় না। একদিন তো বলেই ফেললে, আমার মুখে বিয়ারের গন্ধ!

শোনো কথা! দুদিন আগেও দু'দণ্ড চলতো না তোমার যে-বিয়ার না খেয়ে, সেই বিয়ারে তুমি পাও এখন গন্ধ!

তখন—এখন না—তখন ইচ্ছে করলে আমি বোধহয় বিয়ার ছাড়তে পারতুম, কিন্তু আমার মনে হল, এ তো বড় এক অদ্ভুত ন্যাকরা। আমাকে তুমিই খেতে শেখালে বিয়ার, আর এখন তুমি হঠাৎ বনে গেলে বাপের সুপুত্তুর। এখন বিয়ারের গন্ধে তোমার বাইবেল অশুদ্ধ হয়!'

আমি বললুম,

"জাতে ছিল কুমোরের ঝি,
সরা দেখে বলে 'এটা কি'?"

ক্যেটেকে প্রবাদটা বোঝাতে বেশীক্ষণ লাগেনি।

ক্যেটে বললে, 'ভুল করলুম না ঠিক করলুম জানিনে—আমি ভাবলুম, এ রকম ন্যাকামোকে আমি যদি এখন লাই দিই, তবে ভবিষ্যতে কত-কিছুই না হতে পারে। একদিন সে'ম্যেডিস্ট কলোনিতে মেম্বার হতে চেয়েছিল, আমি বাধা দিয়েছিলুম—কেমন যেন ও জিনিসটা আমার বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়—পরে সে বলেছিল,

আমি বাধা দিয়ে ভালোই করেছিলুম। এখন যে তাই হবে না, কে জানে।

ইতিমধ্যে এল আরেক গেরো।

বলা-নেই, কওয়া-নেই হঠাৎ একদিন এসে বলে, সে পাদ্রী হবে, সে নাকি ভগবানের ডাক শুনতে পেয়েছে। আমি তো গলাভর্তি বিয়ারে হাসির চোটে বিষম খেয়ে উঠেছিলুম। শেষটায় ঠাট্টা করে শুধিয়েছিলুম, "পৃথিবীতে কত শত অটো আছে। তুমি কি করে জানলে, আকাশ-বাণী তোমার জন্যই হয়েছে।"

রাগে গরগর করতে করতে অটো চলে গেল।

অর্থাৎ তা হলে আমাদের আর বিয়ে হতে পারে না।

সেই থেকে, এই তিন মাস ধরে চলেছে টানা-পোড়েন। পরপর দুই শনি যখন এটা ওটা অছিলা করে আমার সঙ্গে এক্স্‌কার্শনে বেরলো না, তখন আমিও আর চাপ দিলুম না। এখন মাঝে মাঝে রাত দশটা এগারোটায় 'পাবে' এসে এক কোণে বসে, আর বিশ্বাস করবে না, লেমনেড—হ্যাঁ হ্যাঁ, লেমনেড খায়! আমি বিয়ার হাতে তার পাশে গিয়ে বসি।

ধর্ম আমি মানি। খৃষ্টে আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু ধর্মের এ কী উৎপাত আমার উপর! আমি 'পাব'-ওয়ালীর মেয়ে। আমার ধর্ম বিয়ারে ফাঁকি না দেওয়া, যে বানচাল হবার উপক্রম করছে তাকে আর মদ না বেচে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা, মা বোনের দেখ-ভাল করা—আমি নান্ হতে যাব কোন দুঃখে।

তবু জানো, এখনো তার পদধ্বনির প্রতীক্ষা করি।'

ক্যেটের গলায় কি রকম কি যেন একটা জমে গেছে। 'তুমি ঘুমুও' বলে আলো নিবিয়ে দিয়ে ছুট্ করে চলে গেল।

(১৬)

পড়ল পড়ল বড় ভয়
পড়ে গেলেই সব সয়।

ভোরের দিকে ভয় হয়েছিল, বৃষ্টিতে ভেজার ফলে যদি আরো জ্বর চড়ে। চড়লোও। তখন সর্ব দুর্ভাবনা কেটে গেল। এবার যা হবার হবে। আমার কিছু করবার নেই।

সকালে ঘুম ভাঙতেই কিন্তু সর্বপ্রথম লক্ষ্য করেছিলুম, খাটের পাশের চেয়ারে আমার সব জামা-কাপড় পরিপাটি ইস্ত্রি করে সাজানো ড্রাইক্লিনিঙেরও পরশ আছে বোঝা গেল। ধন্যি মেয়ে? কখনই বা শুতে গেল, আর কখনই বা সময় পেল এ-সব করবার।

কিন্তু আমার টেম্‌পারেচার দেখে সে যায় ভিরমি। আমি অতি কষ্টে তাকে বোঝালুম, এ-টেম্‌পারেচার জর্মানিতে অজানা, কারণ এটা খুব সম্ভব আমার বাল্য-সখা ম্যালেরিয়ার পুনরাগমন।

এবারে ক্যেটে সত্যই একদম ফ্যাকাশে হয়ে গেল। 'ম্যা—লে—রি—য়া—? ওতে শুনি পূবের দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক মরে।'

আমি ক্যেটের হাত আমার বুকের উপর রেখে বললুম, 'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি মরবো না। তদুপরি, আমাদের এতে কিছু করবার নেই। বন্, কলোন্ কোথাও কুইনিন পাওয়া যায় না। বন-এ আমার এক ভারতীয় বন্ধুর ম্যালেরিয়া হয়েছিল; তখন হল্যাণ্ড থেকে কুইনিন আনাতে হয়েছিল, কারণ ডাচদের কাজ-কারবার আছে জ্বরে-ভর্তি ইণ্ডোনেসিয়ার সঙ্গে।'

ক্যেটে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'তাহলে হলাণ্ডে লোক পাঠাই।'

আমার দেখি নিষ্কৃতি নেই। বললুম, 'শোনো, ক্যেটে, আমার

ডার্লিং, আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আজ না হোক, কাল সকালেই আমার জ্বর নেবে যাবে। তখন তুমি যাবে সত্যসত্যই ভিরমি। কারণ টেম্‌পারেচার অতখানি নামেও না এদেশে কখনো—৩৬ সেন্টিগ্রেড। যদি না নামে তবে কথা দিচ্ছি, তুমি হলাণ্ডে লোক পাঠাতে পারো।'

'তাহলে ওঠো, ব্রেক-ফাস্ট খাও।'

এই জর্মনদের নিয়ে মহা বিপদ। প্রথমত, এদের অসুখ-বিসুখ হয় কম। পেটের অসুখ তো প্রায় সম্পূর্ণ অজানা—যেটা কি না প্রত্যেক বাঙালীর বার্থ-রাইট—। আর যদি বা অসুখ করলো, তখন তারা খায় আরো গোগ্রাসে। ডায়েটিং বলে কোনো প্রক্রিয়া ওদেশে নেই, উপোস করার কল্পনা ওদের স্বপ্নেও আসে না। ওদের দৃঢ়তম বিশ্বাস, অসুখের সময় আরো ঠেসে খেতে হয় যাতে করে রোগা গায়ে গত্তি লাগে।

একেই কোনো মেয়ে ছলছল নয়নে তাকালে আমি অস্বস্তি বোধ করি, তদুপরি এ মেয়ে অপরিচিতা, বিদেশিনী। এবং সব চেয়ে আশ্চর্য লাগলো, যে মেয়ে রায়বাঘিনীর মত মাতাল 'সেলার'-দের ভেড়ার বাচ্চার মত গণনা করে, তার এই এত সুকোমল দিকটা এল কোত্থেকে? তখন মনে পড়ল, কে যেন বলেছিল, 'ফাঁসুড়ের ছেলের পায়ে কাঁটা ফুটলে সে কি বিচলিত হয় না?'

ক্যেটেকে বললুম, তুমি দয়া করে তোমার 'পাব্‌' সামলাওগে। আর শোনো, যাবার পূর্বে আমাকে একটি চুমো খাও তো।'

এবারে ক্যেটের মুখে হাসি ফুটলো। আমার দুই গালে দুই বম্‌-শেল ফাটাবার মত শব্দ করে দুটি চুমো খেয়ে যেন নাচতে নাচতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রুচিবাগীশ পাঠকদের বলে রাখা ভালো, এদেশে গালে চুমো খাওয়াটা স্নেহ, হৃদ্যতার প্রতীক। ঠোঁটের ব্যাপার প্রেম-ট্রেম নিয়ে। যস্মিন্‌ দেশাচার। ক্যেটে নিশ্চিন্ত হয়ে কাজে গেল—আমি বিদেশী

নই, আমি ওদেরই একজন। এই যে-রকম কোনো সায়েব যদি আমাদের বাড়িতে খেতে খেতে হঠাৎ বলে ওঠে, 'ঘুটো কাঁচা লঙ্কা দাও তো, ঠাকুর'—তা হলে আমরা যেরকম নিশ্চিন্তি হই।

*　　　*　　　*　　　*

জ্বর কমেছে। পাবে এসে বসেছি। জামাকাপড় ইস্ত্রি করা ছিল বলে ভদ্রলোকের মতই দেখাচ্ছিল। ক্যেটে 'পাব্-কীপারের' মত কেতা-দুরুস্ত কায়দায় আমাকে শুধোলে, 'আপনার আনন্দ কিসে?' সঙ্গে আবার মৃদু হাস্য—'আপন-প্রিয়' বান্ধবীর মত।

আমি বললুম, 'বুইয়োঁ,—বুইয়োঁ ঘনচর্বির শুরুয়া। ওতে আর কিছু থাকে না। ক্যেটে আরো পুরো-পাকা নিশ্চিন্ত হল—আমি খাঁটি জর্মন হয়ে গিয়েছি। আশ্চর্য, সর্বত্রই মানুষের এই ইচ্ছা—বিদেশীকে ভালো লাগে, কিন্তু তার আচার-ব্যবহার যেন দিশীর মত হয়।

বুইয়োঁ দিতে দিতে বললে, 'অটোকে খবর দিয়েছি।'

খানিকক্ষণ পরেই অটো এল।

স্বীকার করছি, প্রথম দর্শনেই ওকে আমার ভালো লাগেনি। জর্মনে যাকে বলে 'উন-আপেটীটলিষ্'—অর্থাৎ 'আন-এপিটাইজিং।' পাঠক চট করে বলবেন, তা তো বটেই! এখন তুমি ক্যেটেতে মজেছ। সপত্নকে আনএপিটাইজিং মনে হবে বইকি।' আমি সাফাই গাইব না, কিন্তু তবু বলি, ঐটুকু ছোকরার মুখে 'ধর্ম ধর্ম' ভাব আমার বেখাপ্পা বেমানান, এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে সিফ ভণ্ডামি বলে মনে হয়। অটো ফ্রন্টাল এটাক করলে। পাদ্রীরা যা আকছারই করে থাকে। খুব সম্ভব, আমিই তার পয়লা শিকার। অন্য জর্মন যেখানে ব্যক্তিগত প্রশ্ন শুধোয় না, সেখানে পাদ্রীদের চক্ষুলজ্জা অল্পই। পরে অবশ্য অনেকেই পোড় খেয়ে শেখে। শুধালে, 'আপনি খৃষ্টান নন।'

বললুম, 'আমি খৃষ্টান নই, কিন্তু খৃষ্টে বিশ্বাস করি।'

সাত হাত পানিমেঁ। শুধালে, 'সে কি করে হয় ?'

আমি বললুম, 'কেন হবে না ? খৃষ্টান বিশ্বাস করে, প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা। সেই একমাত্র ত্রাণকর্তাকে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করলে মানুষ অনন্তকাল নরকের আগুনে জ্বলবে। আমি বিশ্বাস করি, প্রভু বুদ্ধ, হজরৎ মহম্মদে বিশ্বাস করেও ত্রাণ পাওয়া যায়। এমন কি কাউকে বিশ্বাস না করে আপন চেষ্টাতেও ত্রাণ পাওয়া যায়।'

গিলতে তার সময় লাগলো। বললে, 'প্রভু যীশুই একমাত্র ত্রাণকর্তা।'

আমি চুপ করে রইলুম। এটা একটা বিশ্বাসের কথা। আমার আপত্তি করার কি আছে।

কিন্তু এর পর যা আরম্ভ করলো সেটা পীড়াদায়ক। সর্ব ধর্মের মিশনারিই একটুখানি অসহিষ্ণু হয়। তাদের লেখা বইয়ে পরধর্মের প্রচুর নিন্দা থাকে। মিস মেয়োর বইয়ের মত। অতি সামান্য অংশ সত্য, বেশীর ভাগ বিকৃত সত্য, কেরিকেচার। গোড়ার দিকে আমি এ-সব জানতুম না। আমি বন্-এ যে পাড়াতে থাকি তারই গির্জাতে প্রতি রববারে যেতুম বলে গির্জার পাদ্রী আমাকে একখানা ধর্মগ্রন্থ দেন। তাতে পরধর্ম নিন্দা এতই বেশী যে মনে হয় মিস মেয়ো এ-বইখানাও লিখেছেন। অবশ্য এ-কথাও সত্য মানুষের ভদ্রতা জ্ঞান যত বাড়ছে এ-সব লেখা ততই কমে আসছে। একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি; ষাট সত্তর বছর আগে আমাদের দেশের খবরের কাগজে, মাসিকে তর্কাতর্কির সময় যে সৌজন্য দেখানো হত আজ আমরা তার চেয়ে অনেক বেশী দেখাই। এবং এ-কথাও বলে রাখা ভালো যে এ-সংসারে হাজার হাজার মিশনারি আছেন, যাঁরা কখনো পরনিন্দা করেন না। শত শত মিশনারি পরধর্মের উত্তম উত্তম গ্রন্থ আপন মাতৃভাষায় অনুবাদ করে আপন ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন, দুই ধর্মকে একে অন্যের কাছে টেনে এনেছেন।

কিন্তু এই গ্রামের ছেলে অটো এসব জানবে কোথা থেকে ? সে

কখনো নিগ্রোদের নিন্দা করে, কখনো পলিনেশিয়াবাসীর, কখনো বা হিন্দু-মুসলমানের। এ সবই তার কাছে বরাবর।

আমি এক জায়গায় বাধা দিয়ে বললুম, 'হের অটো। অন্যের পিতার নিন্দা না করে কি আপন পিতার সুখ্যাতি গাওয়া যায় না?'

বেশ গরম সুরে বললে, 'আমি অসত্যের নিন্দা করছি।'

আমি বিনীত কণ্ঠে বললুম, 'প্রভু যীশু বলেছেন, ভালোবাসা দিয়ে পাপীতাপীর চিত্ত জয় করবে।'

ক্যেটে লম্বা এক ঢোক বিয়ার গিলে, গেলাসটা ঠক করে টেবিলে রেখে বললে, 'হক্‌কথা।'

(১৭)

'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম'—কিন্তু যখন সংগ্রামটা স্বার্থে স্বার্থে না হয়ে আদর্শে আদর্শে হয় তখন সেটা হয় আরো দীর্ঘস্থায়ী এবং প্রাণঘাতী। কারণ খাঁটি মানুষ অনায়াসে স্বার্থ ত্যাগ করতে রাজী হয় কিন্তু আদর্শ বর্জন করতে রাজী হয় না। capitalist vs communist

অটোকে যদিও প্রথম দর্শনে আমার ভালো লাগেনি, তবু তর্ক করতে করতে স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, সে খাঁটি। সে স্থির করেছে, সর্বস্ব ত্যাগ করে ধর্মপ্রচার করবে। সেটা যে ক্যেটের স্বার্থের সঙ্গে সংঘাতে এসেছে তা নয়—ক্যেটেও খাঁটি মেয়ে, স্বার্থত্যাগ করতে প্রস্তুত—ক্যেটে দেখছে, তার মার বয়েস হয়েছে, তার ছোট বোনকে ভালো যৌতুক দিয়ে বিয়ে দিতে হবে, পরিবারের মঙ্গল কামনা তার আদর্শ। দুই আদর্শ-সংঘাত! এ সংগ্রামে সন্ধি নেই, কম্প্রমাইস হতেই পারে না।

অটোকে বোঝানো অসম্ভব, খৃষ্টধর্মের প্রতি তার যে রকম অবিচল

নিষ্ঠা, দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক তেমনি বৌদ্ধ শ্রমণ রয়েছেন, মুসলমান মিশনারি আছেন—আপন আপন ধর্মের প্রতি এঁদের নিষ্ঠা, এঁদের বিশ্বাস কিছুমাত্র কম নয়। অটোর কেমন যেন একটা আবছা আবছা বিশ্বাস, এরা সব কেমন যেন একটা মোহাচ্ছন্ন অবস্থায়, একটা মায়ার ঘোরে আছে—খৃষ্টের বাণী তাদের সামনে একবার ভালো করে তুলে ধরতে পারলেই ওরা তৎক্ষণাৎ সত্য ধর্মে আশ্রয় নেবে।

ততক্ষণে আমি বিলক্ষণ বুঝে গিয়েছি, অটোর সঙ্গে তর্কাতর্কি বা আলোচনা করা নিষ্ফল। সে তার পথ ভালো করেই ঠিক করে নিয়েছে। এবং সেটা যখন খৃষ্টের পথ, তবে চলুক না সে সেই পথে।

আমি বললুম, 'হ্যার অটো। আমার একটি নিবেদন শুনুন। আমি ছেলেবেলায় গিয়েছি পাদ্রী ইস্কুলে, আমার প্রতিবেশীরা ছিল সব হিন্দু। ভিন্ন ধর্মের খুব কাছে আপনি কখনো আসেননি—কাজেই আমার মনের ভাব আপনি বুঝতে পারবেন না, আপনারটাও আমি বুঝতে পারবো না। আমার শুধু একটি অনুরোধ—যেখানেই ধর্মপ্রচার করতে যান না কেন, প্রথম বেশ কিছুদিন সে দেশবাসীর শাস্ত্র, আচার ব্যবহার, সামাজিক প্যাটার্ন ভালো করে দেখে নেবেন, শিখে নেবেন, তারপর যা করবার হয় করবেন।'

অটোর চোখ-মুখের ভাব থেকে অনুমান করতে পারলুম না, আমার পরামর্শটা তার মনে গিঁথেছে কি না। এতক্ষণ আমি তক্কে তক্কে ছিলুম, কি করে এ-আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে অন্যদিকে চলে যাওয়া যায়। তাই শুধালুম, 'আপনি কোন্ দেশে ধর্ম প্রচার করতে যাবেন?'

অটো বললে, 'এখনো ঠিক করিনি।'

আমি তৎক্ষণাৎ আলোচনার মোড় নেবার সুযোগ পেয়ে গেলুম—বললুম, 'ভারতবর্ষ, ইরান, আরব এ সবের কোনো একটা দেশে যাবেন। অর্থাৎ যেখানকার লোকের রঙ আমার মত বাদামী। এরাই ভগবানের সর্বোত্তম সৃষ্টি।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কেন ?' ক্যেটে বলল, 'আমরা জর্মনরা চামড়ার বাদামী রঙ পছন্দ করি বলে ?' অটো কেমন যেন একটু ঈর্ষার নয়নে আমার দিকে তাকালে। বাঁচালে ! ক্যেটের প্রতি তার সর্ব দুর্বলতা তা হলে এখনো যায়নি।

আমি বললুম, 'বুঝিয়ে বলি। সৃষ্টিকর্তা যখন মানুষ গড়তে প্রথম বসলেন, তখন এ বাবদে তাঁর বিলকুল কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। প্রথম সেট্ বানানোর পর সেটা 'বেক' করার জন্য ঢোকালেন "বেকিং বক্সে"। যতখানি সময় বেক্ করার প্রয়োজন তার আগেই বাক্স খোলার ফলে সেগুলো বেরল 'আণ্ডার-বেক্‌ট্,' সাদা সাদা। অর্থাৎ তোমরা, ইয়োরোপের লোক। পরের বার করলেন ফের ভুল। এবারে রাখলেন অনেক বেশী সময়। ফলে বেরল পুড়ে-যাওয়া কালো কালো। এরা নিগ্রো। ততক্ষণে তিনি টাইমিংটি ঠিক বুঝে গেছেন। এবারে বেরুল উত্তম 'বেক্'-করা সুন্দর ব্রাউন-ব্রেড। অর্থাৎ আমরা, ইরানী, আরব জাত।'

ক্যেটে হাসতে হাসতে তখন পুনরায় আরম্ভ করলো ভারতীয় নর্তকী-সৌন্দর্য-কীর্তন। এবারে অটোর হিংসা করার কিছু নেই—কারণ প্রশংসাটা হচ্ছে মেয়েদের। কিন্তু মানব সৃষ্টিরহস্যের গল্পটা শুনে সে প্রাণভরে হাসলে না। নিছক ভদ্রতা রক্ষা করার জন্য কেমন যেন শুকনো শুকনো।

আমি বললুম, 'আর প্রভু খৃষ্টও তো ছিলেন বাদামী। তাঁর আমলের কিছু কিছু ইহুদী এখনো প্যালেস্টাইনে আছে। তাদের বর্ণসঙ্কর দোষ নেই। এখনো ঠিক সেই সুন্দর বাদামী রঙ, মিশমিশে কালো-নীল চুল। ইণ্ডিয়া যাবার পথে প্যালেস্টাইনে দেখে নেবেন।'

ক্যেটে অভিমানভরা সুরে বললে, 'তুমি দেখি অটোকে দেশছাড়া করার জন্য সাত-তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লেগেছো !'

আমি সপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর দিলুম, 'কেন, তুমি কি ওর সঙ্গে যাচ্ছো না ?'

অটো বললে, 'ওর অভাব কি? সৌন্দর্যদানে তো ভগবান ওর প্রতি কার্পণ্য করেন নি।'

ক্যেটে রোষ-কষায়িত লোচনে অটোর দিকে তাকালো। মন্তব্যটা আমারও মনে বিরক্তির সঞ্চার করলো। এতক্ষণ ধর্ম নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল বলে ওকে কোনোপ্রকারের আঘাত না দেবার জন্য টাপে-টোপে কথা বলছিলুম, এখন আর সে পরোয়া নেই। বাঁকা হাসিটাকে প্রায় চক্রাকারে পরিবর্তিত করে বললুম, 'আপনি বুঝি ধরে নিয়েছেন, প্রত্যেক পরিবর্তনই প্রগতি, এবং পরিবর্তনটা করা হবে ঝটপট! আজ আছ মুসলমান, কাল হয়ে যাও খৃষ্টান; আজ ভালোবাসো অটোকে, কাল ভালোবেসে ফেলো ডাভিড্ কিংবা ফ্রীডরিষকে! যেমন এখন খাচ্ছো বিয়ার, পরের গেলাস ভরে নাও লেমনেড দিয়ে! না?'

অটোর আঁতে খানিকটা লেগেছে। তাই শুষ্ক কণ্ঠে বললে, 'মিথ্যা প্রতিমা (ফল্‌স্ আইডল্‌স্) যতদূর সম্ভব শীঘ্র বর্জন করে সত্যধর্মে আশ্রয় নেওয়া উচিত।'

আমি রীতিমত রাগত কণ্ঠে বললুম, 'মিথ্যা প্রতিমা! নরনারীর প্রেম মিথ্যা, আর কোথায় কোন্ আফ্রিকার জঙ্গলে পড়ে আছে নিগ্রো তার মাম্বো জাম্বো নিয়ে—হয়তো সুখেই আছে, শান্তিতেই আছে—তাকে তার 'অজ্ঞতা', 'কুসংস্কার', 'পাপ' সম্বন্ধে সচেতন করাই সব চেয়ে বড় সত্য!

শুনুন হ্যার অটো। আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই, যে লোক ঐশীবাণীর স্পন্দন তার হৃদ্‌পিণ্ডে অনুভব করেছে তাব 'কিছু বাকি থাকে না'—আমাদের দেশের গ্রাম্য সাধক পর্যন্ত গেয়েছে, 'যে জন ডুবলো সখী তার কি আছে বাকি গো?'

কিন্তু ধর্মের দোহাই, নরনারীর প্রেম অবহেলার জিনিস নয়। আপনি রাগ করবেন না, আমি জিজ্ঞেস করি, আজ যে আপনি প্রভু যীশুকে ভালোবাসতে শিখেছেন, তার গোড়াপত্তন কি ক্যেটের প্রতি আপনার প্রথম প্রেমের উপর নয়?

টায় টায় মিলবে না, তবু একটি উদাহরণ দি। আমার একজন আত্মীয় উনিশ বিশ বৎসর অবধি তার মাকে বড্ড অবহেলা এমন কি তাচ্ছিল্য করতো। তারপর তার বিয়ে হল, বাচ্চা হল। তখন সে জীবনে প্রথম বুঝতে পারলো বাচ্চার প্রতি মা'র ভালোবাসা কি বস্তু। তখন সে ভালোবাসতে শিখল আপন মাকে।

বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে আপনাদের ধর্মের অনেকখানি মিল আছে। সংসারাশ্রম ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করাই সে ধর্মের অনুশাসন। অথচ জানেন, সে ধর্মেও মায়ের আসন অতি উচ্চ। বুদ্ধদেব যখন তাঁর প্রধান প্রধান শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা করতেন তখন তাঁর একমাত্র কিশোর পুত্র রাহুল অত্যন্ত বিমর্ষ বদনে এককোণে বসে থাকতো—সে তো শ্রমণ নয়, তার তো কোনো আসন নেই সেখানে। আপন পিতা বুদ্ধদেব পর্যন্ত শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়ন, সারিপুত্তের সঙ্গে যে রকম সানন্দে কথা বলেন, তার সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেন না। তখন রাহুল স্থির করলেন, সন্ন্যাস নেবেন বলে। সে-কথা শুনতে পেয়ে রাহুল-জননী যশোধারা নিরাশকণ্ঠে বলেছিলেন, 'আর্যপুত্র আমাকে বর্জন করেছেন, আমি তাঁকে পেলুম না। তিনি সিংহাসন গ্রহণ করলেন না, আমিও পট্ট-মহিষী হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হলুম। এখন বুঝি তিনি আমার শেষ-আশ্রয়ের স্থল যুবরাজ রাহুলকেও আমার কোল থেকে কেড়ে নিতে চান?" একথা শুনতে পেয়ে বুদ্ধদেব অনুশাসন করেন, "মাতার অনুমতি ভিন্ন কেউ শ্রমণ হতে পারবে না।" আড়াই হাজার বছর হয়ে গেছে—এখনও সে অনুশাসন বলবৎ। আমার আশ্চর্য বোধ হয়, হ্যার অটো! মাতা হয়তো নিরক্ষরা, কুসংস্কারাচ্ছন্না। কিন্তু তারই উপর নির্ভর করছে, পুত্রের আদর্শবাদ, সদ্ধর্ম গ্রহণ, সব কিছু। সেই মূর্খা মাতা অনুমতি না দিলে সে সবচেয়ে মহৎ কর্ম প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারবে না—আজ আপনি যে রকম করতে পারছেন। আর এ তো আবার প্রেম।

"ভগবান কোথায়?"—নাস্তিক জিজ্ঞেস করেছিল সাধুকে,

আমার যতদূর মনে পড়ছে খৃষ্টান সাধুকেই। কৃচ্ছ্র-সাধনাসক্ত, দীর্ঘ তপস্যারত, চিরকুমার সাধু বলেছিলেন, "তরুণ-তরুণীর চুম্বনের মাঝখানে থাকেন ভগবান।"

(১৮)

আমি বললুম, 'শ্রীমতী ক্যেটে, কাল ভোরে আমি বেরবো।'

ইতিমধ্যে তিনটি দিন কেটে গিয়েছে। ফিল্ম-স্টারের আদরে কদরে। শরীর একটু সুস্থ বোধ হলেই নিচের পাবে এসে বসেছি, ক্যেটের কাউন্টারের নিকটতম সোফায়। তারও বোধহয় মনে রঙ ধরেছে। কিংবা তার কপাল ভালো,—কি করে যেন 'বারের' একটা ঠিকে জুটে গিয়েছে বলে অধিকাংশ সময় তার বিয়ারের মগ সহ আমার সামনে বসে। আর যখন মৌজে ওঠে তখন সোফায় এসে আমার গা ঘেঁষে। অটোও প্রতি রাত্রে এসেছে। আমাদের ভিতর যতখানি ভাব জমেছে ক্যেটে সেটা অটোর কাছ থেকে লুকোবার চেষ্টা করেনি। অটোর হাব-ভাব দেখে অনুমান করলুম, সে পড়েছে ধন্দে। অস্কার ওয়াইল্ড্ বলেছেন, 'আমাদের প্রত্যেকের কাছে এমন একাধিক জিনিস আছে যেগুলো আমরা স্বচ্ছন্দে পথের ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিতুম, যদি না জানতুম, অন্যলোকে সেগুলো তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে নেবে। অটো ভাবছে সে ক্যেটেকে কবুল জবাব দেওয়া মাত্রই আমি তাকে লুফে নিয়ে বটন-হোলে বসরাই গোলাপের মত গুঁজে নেব।

একবার শুধু অটোকে বলেছিলুম, 'আপনাদের কবি গ্যোটে অতুলনীয়। সুদূর ভারতের আমরা যে হীদেন, আমরাও তাঁকে সম্মান করি। তিনি বলেছেন,

'দূরে দূরে তুমি কেন খুঁজে মরো
হেরো প্রেম সে তো হাতের কাছে,
শিখে নাও শুধু তারে ধরিবারে
সে তো নিশিদিন হেথায় আছে।'

'Willst du immer weiter schweifen ?
Sich, das Gute liegt so nah.
Lerne nur das Glueck ergreifen,
Denn das Glueck ist immer da.'

অটো এর উত্তরে কিছু না বলে শুধু অন্য কথা পেড়ে আমাকে বলেছিল, 'আপনি এখানে আরো কিছুদিন থাকুন। আস্তে আস্তে সব কথাই বুঝতে পারবেন।'

এ আরেক প্রহেলিকা !

ক্যেটে চালাক মেয়ে। আমার উড়ুক্কু ভাব বুঝতে পেরে আমাকে কিছুতেই বিদায় নেবার প্রস্তাব পাড়তে দেয় না। কী করে যে বুঝে যায়, কথার গতি ঐদিকে মোড় নিচ্ছে আর অমনি হুম্ করে ভারতবর্ষের ফকীরদের কাহিনী শুনতে চায়, আমার মা বছরে ক'বার তার বাপের বাড়ি যায়—অতিশয় ধূর্ত মেয়ে, কি করে যে বুঝে গেছে আমি আমার মায়ের গল্প বলতে সব সময়ই ভালোবাসি, আমিও একবার মূর্খের মত বলেছিলুম, মায়ের গল্প সব গল্পের মা—মা চলে গেলে বাড়ি চালায় কে, আরো কত কী ?

আর আমিও তো অতটা নিমক-হারাম নই যে এতখানি স্নেহ-ভালোবাসা পাওয়ার পর হঠাৎ বলে বসবো, 'আমি চললুম।' যেন পচা ডিমের ভাঙা খোসাটা জানলা দিয়ে ফেলে দেবার মত ওদের বাড়ি বর্জন করি !

শেষটায় মরিয়া হয়েই প্রস্তাবটা পাড়লুম।

ক্যেটে বললে, 'কেন ? এখানে আরো কয়েকটা দিন থাকতে আপত্তি কি ? তুমি যে ঘরটায় আছো সেটা সাড়ে এগারো মাস ফাঁকা থাকে, খদ্দেরদের জন্য এখানে প্রতিদিন রান্না হয় অন্তত তিরিশটা লাঞ্চ-ডিনার। একটা লোকে বেশী খেল কি কম খেল তাতে কি যায় আসে ?'

আমি বললুম, 'আমি আর তিনদিন থাকলেই তোমার প্রেমে পড়ে যাব।'

আমি ভেবেছিলুম, ক্যেটে বলবে, 'তাতে ক্ষেতিটা কি?' সে কিন্তু বললে অন্য কথা। এবং অত্যন্ত গম্ভীর স্বরে। বললে, 'কোনো ভয় নেই তোমার। তোমার স্বভাব প্রেমের লক্ষণে দীন (যেন, হুবহু রবীন্দ্রনাথের ভাষা)। মানুষ হঠাৎ একদিন প্রেমিক হয় না। যে প্রেমিক, সে প্রেমিক হয়েই জন্মায়। কিংবা যেমন কেউ বাঁকা নাক নিয়ে। যাদের কপালে প্রেমের দুর্ভোগ আছে তাদের জন্ম থেকেই আছে। তোমার সে ভয় নেই।'

আমি চুপ করে রইলুম।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'অটো যত দূরে চলে যাচ্ছে আমার জীবনটা ততই ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। এই যে তোমার প্রিয় কবি হাইনরিষ হাইনে তাঁরই একটি কবিতা আছে—

গোলাপ, কমল, কপোত, প্রভাত রবি—
ভালবাসিতাম কত যে এসব আগে,
সে সব গিয়েছে, এখন কেবল তুমি,
তোমারি মূর্তি পরাণে কেবল জাগে!
নিখিল প্রেমের নির্ঝর—তুমি, সে সবি—
তুমিই গোলাপ, কমল, কপোত, রবি।[১]

কবি একদিন তাঁর প্রিয়াতেই গোলাপ, কমল, কপোত সবই পেয়ে গেলেন। কিন্তু তারপর আরেকদিন যখন তাঁর প্রিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে গেল তখন কি তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার গোলাপ কমলকে ভালোবেসে সে অভাব পূর্ণ করতে পারলেন? আমার হয়েছে তাই। এ তো আর চটিজুতো নয়, যে, যখন খুশী পরলে যখন খুশী ছুঁড়ে ফেলে দিলে। এ যেন নির্জন দ্বীপে পৌঁছে নৌকাটাকে পুড়িয়ে দেওয়া।

---

১ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অনুবাদ।

তারপর একদিন যখন ভূমিকম্পে দ্বীপটি সমুদ্রে বিলীন হয়ে গেল তখন তুমি যাবে কোথা ?'

এর উত্তর আমার ঘটে নেই। তাই অন্য পন্থা ধরে বললুম, 'তোমার বয়েস আর কতটুকু ? এত শিগগির নিরাশ হয়ে গেলে চলবে কেন ?'

ইতিমধ্যে অটো এসে পড়াতে আমাদের এ আলোচনা বন্ধ হল। অটোকে অশেষ ধন্যবাদ। তাকে বললুমও, 'অটো, আপনি অনেক লোকের বহু উপকার করবেন।'

অটো বুঝতে না পেরে বললে, 'কি রকম ?'

আমি বললুম, 'পরে বলবো। আমি কাল চললুম।'

অটো কিছু বলার পূর্বেই ক্যেটে আমাকে বললে, 'কিন্তু তুমি তো এখনো আমার গান শোনোনি।'

অটো বললে, 'ও সত্যি খুব ভালো গাইতে পারে।'

আমি বললুম, 'ক্যেটে, ডার্লিং, একটি গাও না।'

'পাবে'র এক প্রান্তে গ্র্যাণ্ড পিয়ানো। প্রায়ই দেখেছি, সেলারদের একজন কিংবা ক্যেটে স্বয়ং সেটা বাজায়, আর বাকিরা নাচে। ক্যেটে স্টুলে বসে মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করে বাজাতে আরম্ভ করে। তার পরেই গান,

তুমি তো আমার
আমি তো তোমার
এই কথা জেনো,
দ্বিধা নাহি আর।
হিয়ার ভিতরে
তালা চাবি দিয়ে
রাখিনু তোমারে
থাকো মোরে নিয়ে
হারায়ে গিয়েছে
চাবিটি তালার

নিষ্কৃতি তব
নাই নাই আর।[১]

গান শেষ হলে ক্যেটে দৃপ্তপদে ফিরে এসে অটোর মুখোমুখি হয়ে তাকে শুধালে, 'অটো, এ গানটা তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে না?'

(১৯)

'বলা বাহুল্য' যে কতখানি বলা বাহুল্য এই প্রথম টের পেলুম। ক্যেটের কাছ থেকে বিদায় নেওয়াটা উভয়ের পক্ষেই বেদনাদায়ক হয়েছিল সেটা বলা বাহুল্য, না বলাও বাহুল্য।

ধোপার কালি দিয়ে সে আমার শার্টটার ঘাড়ের ভিতরের দিকে তাদের বাড়ির ফোন নম্বর ভালো করে লিখে দিয়ে বলল, 'দরকার হলে আমাকে ফোন করো।'

আমি শুধালুম, 'আর দরকার না হলে?' এটা ইডিয়টের প্রশ্ন। কিন্তু আমি তখন আর কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলুম না। ক্যেটে কোনো উত্তর দিলে না। ইতিমধ্যে ক্যেটের মা বোন এসে পড়াতে আমি যেন বেঁচে গেলুম।

ক্যেটের মা আমার গলায় একটি ক্রুশ বিদ্ধ যীশুর ক্ষুদ্র মূর্তি ঝুলিয়ে দিলেন। চমৎকার সূক্ষ্ম, সুন্দর কাজ করা। এখনো আছে।

---

১. Du bist min, ich bin din :
des solt du gewis sin.
du bist beslozzen
in minem herzen :
verlorn its daz sluezelin :
du muost immer drinne sin.
(দ্বাদশ শতাব্দীর লোকসঙ্গীত)

*　　*　　*　　*

প্রথমটায় রাইনের পাড়ে পাড়ে সদর রাস্তা দিয়েই এগিয়ে চললুম।

এদেশের লোক বিদেশীর প্রতি সত্যই অত্যধিক সদয়। পিছন থেকে যে সব গাড়ি আসছে তাদের ড্রাইভার সোওয়ার আমার ক্ষুদ্রাকৃতি, চামড়ার রঙ আর বিশেষ করে চলার ধরন দেখে বুঝে যায় আমি বিদেশী আর অনেকেই—কেউ হাত নেড়ে, কেউ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করে লিফট চাই কিনা। আমি মৃদু হাসির ধন্যবাদ জানিয়ে হাত নেড়ে ওদের এগোতে বলি।

মনে মনে বলি, এও তো উৎপাত। আচ্ছা, এবারে তা হলে গাঁয়ের রাস্তা পাওয়া মাত্রই মোড় নেব। এমন সময় একখানা ঝাঁ চকচকে মোটর আমার পাশে এসে দাঁড়াল। ওনার ড্রাইভার। দরজা খুলে দিয়ে আমার দিকে তাকালে। আমি যতই আপত্তি জানাই সে ততই একগুঁয়েমির ভাব দেখায়। শেষটায় ভাবলুম, 'ভালোই, ক্যেটের থেকে যত তাড়াতাড়ি দূরে চলে যাওয়া যায় ততই ভালো।' গাড়িতে বসে বললুম, 'ধন্যবাদ।' ভদ্রলোক বললেন, 'মোটেই না। এই হল বুদ্ধিমানের কাজ।' তারপরে শুধোলে, 'ইণ্ডার?'

এই প্রথম একটা বিচক্ষণ লোক পেলুম যে প্রথম দর্শনেই ধরে ফেলেছে, আমি কোন্ দেশের লোক। এস্কিমো বা মঙ্গলগ্রহবাসী কি না, শুধালো না।

বললে, 'কোথা যাবে?'—ভদ্রতার খুব বেশী ধার ধারে না।

'ইণ্ডিয়া।'

আদপেই বিচলিত না হয়ে বললে, 'তাহলে তো অনেকখানি পেট্রল নিতে হবে। ঠিক আছে। সামনের স্টেশনেই নিয়ে নেব। তা আপনি বন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন—না?'

শার্লক হোম্‌সের জর্মন মামা ছিল নাকি? পরিষ্কার ভাষায় সেটা শুধালুমও।

হেসে বললে, 'না। শুনুন। আচ্ছা, আপনি লেফারকুজেন ফার্বেন ইনডুস্ট্রির নাম শুনেছেন? তুনিয়ার সবচেয়ে বড় না হোক—তুসরা কিংবা তেসরা, রঙ আর ওষুধ বানায়?'

আমি অজ্ঞতা স্বীকার করলুম।

বললে, 'আমি সেখানে কাজ করি। এখন হয়েছে কি, আমরা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই বহুত কিছু বেচি। ইণ্ডিয়াও আমাদের বড় মার্কেট। একটা ওষুধের বিজ্ঞাপন ছাপতে গিয়ে দেখি তাতে ইণ্ডিয়ার যা খরচা পড়বে তার চেয়ে অনেক কম খরচায় হবে এখানে। ইণ্ডিয়া থেকে ছবি ক্যাপশন আনিয়ে এখানে জোড়াতালি লাগিয়ে ছাপতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল, এ জোড়াতালি লাগানোতে যদি উল্টো-পাল্টা হয়ে গিয়ে থাকে তবেই তো সর্বনাশ। ছাপা হবে তিন লক্ষখানা—তত্নপরি মেলা রঙ-বেরঙের ছবি। খরচাটা কিছু কম হবে না—যদিও ঐ যা বললুম, ইণ্ডিয়ার চেয়ে অনেক কম। তাই ভাবলুম, ওটা কোনো ইণ্ডিয়ানকে দেখিয়ে চেক আপ করে নি। আমাদের লেফারকুজেন শহরে কোনো ভারতীয় নেই। কাছেই কলোন বিশ্ববিদ্যালয়। গেলুম সেখানে। তারা তাদের নথিপত্র ঘেঁটে বললে, ভারতীয় ছাত্র তাদের নেই, তবে পাশের বন্ শহরে থাকলে থাকতেও পারে—সেখানে নাকি বিদেশীদের ঝামেলা। কি আর করি, গেলুম সেখানে। সেখানেও গরমের ছুটির বাজার। সবাই নাকে কানে ক্লোরোফর্ম—আমাদের কোম্পানিরই হবে—ঢেলে ঘুমুচ্ছে। অনেক কস্ত করে একজন ইণ্ডারের নাম বাড়ির ঠিকানা বের করা গেল। তার বাড়ি গিয়ে খবর নিতে জানা গেল সে মহাত্মাও বেরিয়েছেন হাইকিঙে! লাও! বোঝো ঠ্যালা। এসেছিল তো বাবা তিন হাজার না পাঁচ হাজার মাইল দূরের থেকে! তাতেও মন ভরলো না। এবার বেরিয়েছেন পায়ে হেঁটে আরো এগিয়ে যেতে! আমার আরো কাজ ছিল মানহাইমে। ভাবলুম, রাস্তায় যেতে যেতে নজর রাখবো ইণ্ডারপানা কেউ চোখে পড়ে কি না। তারপর এই আপনি।'

আমি বললুম, 'আমি ইণ্ডার নিশ্চয়ই, কিন্তু তাতে আপনার সমস্যার সমাধান হবে কি না বলা কঠিন। ইণ্ডিয়াতে খানা তেরো চোদ্দ ভাষা। তার সব কটা তো আর আমি জানিনে।'

বললে, 'সর্বনাশ! তা হলে উপায়? সেই জোড়াতালির মাল ইণ্ডিয়া পাঠাব, সেটা ফিরে আসবে, তবে ছাপা হবে, ওতে করে যে মেলা দেরি হয়ে যাবে।'

আমি শুধালুম, 'ইণ্ডিয়ার কোন্ জায়গাতে সেটা তৈরি করা হয়েছে মনে পড়ছে কি?'

বললে, 'বিলক্ষণ! কালকুট্টা।'

আমি বললুম, 'তাহলে বোধহয় আপনার মুশকিল আসান হয়ে যাবে। অবশ্য জোর করে কিছু বলা যায় না। কারণ কলকাতার শহরেও সাড়ে বত্রিশ রকম ভাষায় কাগজপত্র ছাপা হয়।'

বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠেই বললে, 'আর শুনুন। আমরা কোনো কাজই ফ্রী করাইনে। আপনি বললেও না।'

আমি বললুম, 'আপনি কিছুমাত্র দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাদের মহাকবি হাইনরিষ হাইনের আমি অন্ধ ভক্ত। তাঁর সর্বক্ষণই লেগে থাকতো টাকার অভাব। পেলেই খরচা করতেন দেদার এবং বে-এক্কেয়ার। তিনি বলেছেন, "কে বলে আমি টাকার মূল্য বুঝিনে? যখনই ফুরিয়ে গিয়েছে, তখনই বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছি।" আমার বেলাও তাই। আপনি নির্ভয়ে আপনার মাল বের করুন।'

জর্মন বললে, 'ঐ তো ডবল সর্বনাশ। আমি সেটা সঙ্গে আনিনি। মোটরে তেল-মেলের ব্যাপার, জিনিসটা জখম হয়ে যেতে পারে সেই ভয়ে। তার জন্য কোনো চিন্তা নেই। সামনের কোব্‌লেন্‌ৎস্‌ শহরে সবচেয়ে দামী হোটেলের ম্যানেজার আমার বন্ধু, অতিশয় পণ্ডিত এবং সজ্জন। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। তার সঙ্গে দু' দণ্ড রসালাপ করে সত্যই আপনি আনন্দ পাবেন। আপনার হোটেল খরচা অতি অবশ্য আমাদের কোম্পানিই দেবে।

আমিও প্রতিবার মানহাইম যাবার সময় সেখানে দু' রাত্তির কাটিয়ে যাই। আপনাকে তার কাছে বসিয়ে আমি লেফারকুজেন যাবো আর আসবো।'

মোটর থামলো।

বাপস! রাজসিক হোটেল। ম্যানেজারটির চেহারাও যেন রাজপুত্তুর।

আরামসে বসেছি। হোটেল খরচা দিতে হবে না। পকেটে একশ মার্ক।

ম্যানেজারের সঙ্গে গালগল্প করলুম। রাত এগারোটায় সেই জর্মন ফিরে এল। কাজকর্ম হল। আরো একশ টাকা পেলুম।

কিন্তু বাধ সাধল পাশের ঐ টেলিফোনটা। বার বার লোভ হচ্ছিল ক্যেটেকে একটা ফোন করি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত